বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

[তৃতীয় খণ্ড]

সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

বইপত্র ৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীবিকাশ ঘোষ
বইপত্র
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
কুইক বাইণ্ডার্স
৩৮।১এ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

Vivekananda Rachana Samgraha
The Works of Swami Vivekananda
Volume IV

নিবেদন

প্রতি মাসে একটি খণ্ড প্রকাশের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু শেষ অবধি তা কতটা রক্ষা করা যাবে—এখনই বলতে অপারগ। গ্রাহকরা প্রকাশের এক মাসের মধ্যে যদি প্রতি খণ্ড সংগ্রহ করেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশনা সম্পূর্ণ হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা অথবা চিঠিপত্র প্রভৃতির সামান্য অংশ বাংলা ভাষায় রচিত। ইতিপূর্বে প্রকাশিত স্বামীজীর রচনা সমূহের বঙ্গানুবাদের ওপর নির্ভর না করে নতুন করে সব অনুবাদ করা হচ্ছে এই রচনা সংগ্রহের জন্য। এইখণ্ডে অনুবাদ কর্মে সহায়তা করেছেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, প্রফুল্ল রায় চৌধুরী, ডঃ সোমেন মুখোপাধ্যায়, মলয় দাশগুপ্ত, অমিতাভ সেনগুপ্ত, অমিত সর্বাধিকারী ও শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী। এঁদের কঠিন পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলেই এত অল্প সময়ে এই খণ্ড প্রকাশনা সম্ভব হল। ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সব কাজের মধ্যে এই খণ্ড সম্পাদনায় যে সাহায্য করেছেন—তা ভোলার নয়।

বিদ্যুৎ-বিপর্যয় প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে আবার নতুন করে। এই অবস্থার মধ্যেও বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশের জন্য খণ্ডটি ক্ষীণকায় হল। আমাদের বিশ্বাস, চতুর্থ খণ্ড বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে।

এই বিরক্তিকর পরিস্থিতিতেও ছাপাখানার কর্মীরা যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। তবু মুদ্রণ ত্রুটি কিছু রয়ে গেল—এজন্য আমরাই ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীত
বিকাশ ঘোষ
প্রকাশক-পক্ষে

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



স্বামী বিবেকানন্দ
চিকাগোয়—অক্টোবর, ১৮৯৩

চিঠিপত্র

[১]

(মিস মেরী হ্যালেকে লেখা)

১৭২১ টার্ক, ২১ স্ট্রীট
লস এঞ্জেলস
১৭ জুন, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

আমি অপেক্ষাকৃত ভালো আছি, একথা ঠিক; কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সেরে উঠিনি। যে যন্ত্রণা ভোগ করে তার মন বিবর্ণ হবেই। গ্যাস ট্যাস বা অন্য কিছু নয়।

কোনো ধর্মপালনে কালীপূজা আবশ্যিক নয়। ধর্মের যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষা আমরা লাভ করি উপনিষদ থেকে। কালীপূজা আমার নিজের একটা বিশেষ খেয়াল। এ বিষয়ে তোমাকে আমি কখনো কিছু বলি নি; ভারতে আমি কালীপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করেছি—এমন কোনো কথাও তো শোনোনি। বিশ্ব-মানবতার পক্ষে যা কল্যাণকর আমি তা-ই প্রচার করি। এমন কোনো বিশেষ অদ্ভুত পদ্ধতি যদি থাকে যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে আমার উপরই প্রযুক্ত হয় তবে তা আমি গোপন রাখি, ব্যস ঐখানেই তার ইতি। কালীপূজা কী সে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলব না, কাউকে তা শেখাই নি।

হিন্দুরা বোসদের পরিত্যাগ করেছে ভেবে থাকলে তুমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইংরেজ শাসকরা তাকে কোণঠাসা করে ফেলতে চায়। ভারতীয় জাতির মধ্যে ঐ রকম উন্নতি তারা অবশ্যই পছন্দ করে না। ওরা তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, তাই তিনি অন্যত্র চলে যেতে চান।

"ইংরিজিয়ানানবীশ" (অ্যাংলিসাইজড) বলতে বোঝায় সেই সব লোকদের যারা তাদের আচরণে ব্যবহারে দেখিয়ে দেয় যে তারা আমাদের ন্যায় পুরানো ধরনের হিন্দুদের নিয়ে লজ্জাবোধ করে। আমি আমার জাতি জন্ম ধর্ম নিয়ে আদৌ লজ্জাবোধ করি না। ঐ ধরনের লোকদের যে হিন্দুরা পছন্দ করে না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমাদের ধর্মে অনুষ্ঠানাদি এবং প্রতীকের কোনো স্থান নেই; আমাদের ধর্ম মোটের ওপর উপনিষদের তত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত। অনেকে মনে করেন আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মকে উপলব্ধি করার সাহায্য হয়। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ধর্ম সেই জিনিস যা গ্রন্থ বা শিক্ষক অথবা প্রবর্তক কিংবা ত্রাতার উপর নির্ভর করে না, যা এই জীবনে অথবা অন্য কোনো জীবনে আমাদের পর-নির্ভর হতে দেয় না। সেই হিসাবে উপনিষদের অদ্বৈতবাদই হল একমাত্র ধর্ম। কিন্তু তবু ত্রাতা, গ্রন্থ, প্রবর্তক, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিরও একটি ভূমিকা আছে। অনেকে ওসব থেকে সাহায্য পেতে পারেন, যেমন কালীপূজা আমার মঠবহির্ভূত কাজে আমাকে সাহায্য করে। তারাও ওরকম করতে পারেন, কোনো বাধা নেই।

গুরুর আইডিয়া অবশ্য স্বতন্ত্র। তা হল শক্তির—আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক। প্রত্যেক জাতিই আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। প্রত্যেকেই অন্যদের কাছ থেকে সতত আইডিয়া পেয়ে থাকে, কিন্তু তা কাজে লাগায় আপন বিশিষ্টতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, অর্থাৎ আপন জাতীয় ধারা অনুযায়ী। এই সব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ভেঙে-চুরে দেবার সময় এখনো আসে নি। যে কোনো উৎস থেকে পাওয়া শিক্ষা প্রতি দেশের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে; সেজন্য শুধু তার জাতীয়তা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য অভিব্যক্তির অন্যতম হতে হবে।

ত্যাগই প্রতিটি জাতির আদর্শ; অন্য জাতিরা শুধু জানতে পারে না প্রকৃতি তাদের অজ্ঞাতে কী কাজ করিয়ে নিচ্ছে। যুগের পর যুগ ধরে একটি উদ্দেশ্যই নিশ্চিত প্রবাহমান। তার সমাপ্তি হতে পারে যেদিন এই পৃথিবী এবং সূর্য ধ্বংস হয়ে যাবে! আর বিশ্ব তো বাস্তবিক প্রগতির পথেই চলেছে! মহাজগতের অসীমতায় এমন আর কেউ নেই যারা আমাদের সঙ্গে আদান প্রদানের উপযুক্ত রূপ উন্নত হয়ে উঠেছে! বাজে কথা! তাদের জন্মলাভ ঘটেছে, একই রকম ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটাচ্ছে, আর একই রকম মৃত্যুবরণ করছে। উদ্দেশ্য বর্ধন করা! আহা রে শিশুরা! তোমরা খোকা-খুকুরা, স্বপ্নের জগতেই বাস করছ!

হ্যাঁ, এবার আমার প্রসঙ্গ। হ্যারিয়েটকে তোমার বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করাতেই হবে সে যেন প্রতি মাসে আমাকে কয়েক ডলার করে দিতে থাকে; আর জনকয়েক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও সেই রকম ব্যবস্থাই করব। যদি সফল হই তবে সরে পড়ব ভারতে। প্ল্যাটফরম ওয়ার্কে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বেঁচে থাকার জন্য ওরকম কাজ আর পোষায় না। ওতে আর আনন্দ পাই না। অবসর নিয়ে একটু যদি বিদ্যাচর্চা করতে পারি তাহলে কিছু লিখব।

শীঘ্রই আমি চিকাগোয় আসছি, কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছুব আশা করি। বলতে পার, মিসেস অ্যাডামস কি ক্লাস বসাতে পারবেন? আমি যাতে আমার ফিরে আসবার রাহা খরচটা তুলে নিতে পারি?

অন্যান্য জায়গায়ও অবশ্য চেষ্টা দেখব। মেরী জানো, আমার মধ্যে এমন তীব্র আশাবাদ এসেছে যে পাখা থাকলে এখনি উড়ে হিমালয়ে চলে যেতাম।

(মেরী, আমি এই পৃথিবীর সেবায়ই সারা জীবন কাটালাম, অথচ আজ এক পাউণ্ড মাংস না কেটে নিয়ে আমাকে এক খণ্ড রুটিও এ পৃথিবী দিতে চায় না।)

দিনে এক টুকরো রুটি পাবার সংস্থান হলেই আমি পূর্ণ অবসর নেব; কিন্তু তা অসম্ভব—এ তো সেই উদ্দেশ্য বর্ধন, আমি যত বেশী বুড়ো হচ্ছি তা অশুভ অন্তর্জগতকে তত উন্মোচিত করে দিচ্ছে!

চির ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

যদি কোনো লোক কখনো বস্তুর অহমিকার সন্ধান পেয়ে থাকে তবে সে আমি। এই তো দুনিয়া—বীভৎস, জান্তব শব। যে ভাবে এর সাহায্য করবে সে মূঢ়! কিন্তু ভালো বা মন্দ কাজ করেই আমাদের দাসত্বের দায় শোধ করতে হবে। আশা করি আমি এই দায় শোধ করেছি। ভগবান আমাকে পরপারে নিয়ে চলুন! আমেন! ভারত সম্পর্কে কিংবা যে কোনো দেশ সম্পর্কে সব চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করেছি। আমি এখন স্বার্থপর, নিজেকেই রক্ষা করতে চাই।

"যিনি ব্রহ্মার নিকট বেদের অর্থ প্রকাশ করেছেন, যিনি প্রতি হৃদয়ে ব্যক্ত, তাঁতেই আমি শরণ নেই ; আশা—বন্ধন হতে মুক্তি।"

বি

[২]

(মিস মেরী হ্যালেকে লেখা)

বেদান্ত সোসাইটি
১৪৬ ই. ৫৫নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২৩ জুন, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

তোমার সুন্দর পত্রখানির জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আমি বেশ ভালো আছি, সুখে আছি এবং আগের মতই আছি। উত্থানের পূর্বে তরঙ্গ আসবেই। আমার ক্ষেত্রেও তাই। তুমি প্রার্থনা করবে জেনে খুশী হলাম। একটি মেথডিস্ট ক্যাম্প সভা কর না কেন? আমার বিশ্বাস তাতে দ্রুত ফল হবে।

আমি সমস্ত আবেগ এবং ভাবপ্রবণতা পরিহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। এর পর যদি আর আমাকে ভাবপ্রবণ দেখতে পাও তবে আমাকে তখই ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিয়ো। আমি অদ্বৈতবাদী ; আমাদের লক্ষ্য জ্ঞানার্জন—সেখানে কোনো অনুভূতি, কোনো ভালবাসার স্থান নেই, কারণ এই সবই বস্তু, কুসংস্কার এবং বন্ধনের বাহন। আমি শুধু অস্তিত্ব এবং জ্ঞান।

গ্রীনএকারে ভালো বিশ্রাম পাবে, তাতে আমার কোনো সংশয় নেই। সেখানে তোমাদের আনন্দে কাটুক এই কামনা করি। আমার জন্য মুহূর্তের তরেও ভাবিত হয়ো না। "মা"-ই আমার দেখাশুনা করছেন। তিনি আমাকে ভাবাবেগের নরক থেকে দ্রুত উদ্ধার করছেন এবং নির্ভেজাল যুক্তির আলোকে নিয়ে আসছেন। তোমার চির সুখ কামনা করি।

তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

মার্গট ২৬ তারিখে যাত্রা করবে। দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তার অনুসরণ করব হয়ত। আমার ওপর আর কারও ক্ষমতা খাটবে না, কারণ আমিই আত্মা। আমার কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। এ সবই মা-র কাজ। আমার কোনো ভূমিকাই নেই।

বি

গত কয়েকদিন ডিসপেপসিয়ার আক্রমণ তীব্র হয়েছে সে কারণে তোমার পত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

বি

অনাসক্তি ছিলই সর্বদা। এক মিনিটে এসেছে। শীঘ্রই এমন একটি অবস্থায় উপনীত হব যেখানে কোনো ভাবপ্রবণতা, কোনো অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

বি

[৩]

(মিস মেরী হালেকে লেখা)

১০২ ই ৫৮ স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১১ জুলাই, ১৯০০

আমার প্রিয় ভক্ত বোন,

তোমার চিঠি পেয়ে এবং গ্রীনএকারে যাচ্ছ শুনে খুশী হয়েছি। আশা করি তুমি খুব লাভবান হবে। লম্বা চুল কেটে ফেলেছি বলে প্রত্যেকে আমায় নিন্দা করেছে। তাতে আমি খুব দুঃখিত। কাজটা করতে আমায় বাধ্য করেছ তুমি।

ডেট্রয়েটে গিয়েছিলাম, কাল ফিরে এসেছি। যথাশীঘ্র সম্ভব ফ্রান্সে যাবার চেষ্টা করছি, সেখান থেকে ভারতে ফিরব। এখানে তেমন কোনো সংবাদ নেই; কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি নিয়মিত আহার্য গ্রহণ করছি এবং ঘুমুচ্ছি—ব্যস এই মাত্র।

চির বিশ্বস্ত ও স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

আমার কোনো চিঠিপত্র এসে থাকলে, মেয়েদের লিখো যেন সেগুলো চিকাগোয় পাঠিয়ে দেয়।

বি

[৪]

(স্বামী তুরীয়ানন্দকে লেখা)

১০২ ই. ৫৮নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১৮ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

তোমার চিঠি রিডাইরেক্ট হয়ে আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি ডেট্রয়েটে মাত্র তিন দিন ছিলাম। এখন নিউ ইয়র্কে প্রচণ্ড গরম। গত সপ্তাহে ভারত থেকে তোমার কোনো চিঠিপত্র আসেনি। ভগিনী নিবেদিতার কোনো খবর এখনো পাই নি।

আমাদের এখানে সব এক প্রকার চলছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। মিস মূলার অগস্ট মাসে আসতে পারবেন না। আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করব না। আগামী ট্রেনটাই ধরব। আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। মিস বুককে আমার ভালোবাসা জানিয়ো।

ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

সপ্তাহখানেক আগে কালী চলে গেছে পাহাড়ে। সেপ্টেম্বর মাসের আগে সে ফিরতে পারবে না। আমি একলা রয়েছি, ধোয়া মোছা করছি। কাজটা আমার ভালো লাগে। আমার বন্ধুদের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে? তাদের আমার ভালোবাসা জানিয়ো।

বি

[৫]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

১০২ ই. ৫৮ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২০ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

তুমি এই চিঠি পাবার আগেই আমি সম্ভবত ইউরোপে পৌঁছে যাব; স্টীমার পাবার ওপর নির্ভর করছে লণ্ডনে যাব না প্যারিসে।

এখানে আমার কাজকর্ম সব গুছিয়ে নিয়েছি। কাজের ভার দেওয়া হয়েছে মিস ওয়ালডোর হাতে, মিঃ হুইট মার্শের পরামর্শ অনুযায়ী।

পথ খরচটা আমার যোগাড় করতে হবে, তারপরই যাত্রা। বাকী সব মা জানেন।

আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীটি এখনো আত্মপ্রকাশ করেন নি, লিখেছেন অগস্ট মাসের কোনো সময়ে আসবেন ; একজন হিন্দু চোখে দেখবার তার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ; আর মাদার ইণ্ডিয়াকে দেখবার জন্য তার অন্তরে আগুন জলছে।

আমি লিখেছি তার সঙ্গে আমার লণ্ডনে দেখা হতে পারে। আবার বলি, মা-ই জানেন। মিসেস হান্টিংটন মার্গটকে তার ভালোবাসা জানিয়েছেন ; যদি সে তার বৈজ্ঞানিক একজিবিট নিয়ে খুব ব্যস্ত না থাকে তবে তার জবাব পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করেন।

ভারতের "পবিত্র গো মাতা"কে, তোমাকে, লেগেটদের, মিস (কী যেন নাম)-কে, আমেরিকার রবার প্ল্যান্টকে ভালোবাসা জানাচ্ছি।

চির ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

১০২ ই. ৫৮ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২৪ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

সূর্য=জ্ঞান। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জল=কর্ম। পদ্ম=প্রেম। সর্প=যোগ। হংস= আত্মা। নীতি বাক্যটি=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন। ইহা হৃদ-সরোবর। [ইহা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকটির ব্যাখ্যা কল্পে লিখিত] এটি তোমার কেমন লাগে। হংস যেন এই সবকিছু দিয়ে তোমাকে পূর্ণ করে।

আগামী বৃহস্পতিবার ফরাসী জাহাজ "লা শ্যাম্পেন" যোগে আমার যাত্রা করার কথা আছে। বইগুলি আছে ওয়ালডো এবং হুইট মার্শের হাতে। প্রায় ছাপতে দেবার জন্য তৈরী।

আমি ভালো আছি, ক্রমেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে—আগামী সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত চাঙ্গা থাকব।

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের বিবেকানন্দ

[৭]

(স্বামী তুরীয়ানন্দকে লেখা)

১০২ ই. ৫৮ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২৫ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

মিসেস হ্যানসবরোর এক পত্রে জানতে পারলাম, তুমি তাদের ওখানে গিয়েছিলে। তোমাকে তাঁদের খুব পছন্দ; আমার বিশ্বাস তুমিও বুঝতে পেরেছ যে তাঁদের বন্ধুত্ব কত অকৃত্রিম, পবিত্র ও স্বার্থলেশশূন্য।

আগামীকাল আমি প্যারিস যাত্রা করব। ঘটনার গতি সেইদিকেই। কালী এখানে নেই। আমি চলে যাচ্ছি বলে সে একটু ভাবিত। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।

অতঃপর আমায় পত্র দেবে মিঃ লেগেটের ঠিকানায়—৬ প্লাস দে এতাৎ, উনি, প্যারিস।

মিসেস ওয়াইকফ, হ্যানসবরো এবং হেলেনকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। ক্লাবগুলিকে একটু আবার জাগিয়ে তোল; মিসেস হ্যানসবরোকে বোলো যেন সময় মত চাঁদা তুলে টাকাটা ভারতে পাঠিয়ে দেন। সারদা জানিয়েছে, তাদের বেশ টানাটানি চলছে। মিস বুককে আমার সহৃদয় শ্রদ্ধা জানাবে। অজস্র ভালোবাসা তোমাকে।

সতত ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৮]

(মিঃ জন ফক্সকে লেখা)

বুলেভার হ্যানস সোয়ান
প্যারিস
১৪ অগস্ট, ১৯০০

জন ফক্স, এস্কোয়ার
৬ ডাঃ উলফ স্ট্রীট
ভরচেস্টার, মাস, ইউ. এস. এ.

অনুগ্রহ করে মহিনকে [স্বামীজীর ছোট ভাই মহেন্দ্র নাথ দত্ত।] লিখে জানাবেন, সে যা কিছুই করুক না কেন আমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না। বর্তমানে সে যা করছে তা নিশ্চয় ওকালতি ইত্যাদির চেয়ে অনেক ভালো। আমি সাহস এবং

তেজস্বিতা পছন্দ করি; আমার জাতের পক্ষে আজ ঐ রকম বীর্যবত্তার বিশেষ প্রয়োজন। তবে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে, অধিক দিন আর বাঁচবারও আশা রাখি না; এই অবস্থায় মা এবং পরিবারের আর সকলের ভার নেবার জন্য যেন মহিন প্রস্তুত হতে থাকে। আমি যে কোনো মুহূর্তে চোখ বুজতে পারি। এখন মহিনকে নিয়ে খুব গর্ব বোধ করছি।

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৯]

ফরাসী অনুবাদ থেকে

৬ প্লাস দে এতাৎ উনি প্যারিস
অক্টোবর, ১৯০০

প্রিয় মহাশয়া,

আমি এখানে খুব সুখী এবং তৃপ্ত আছি। বহু বহু বছর পরে আমার সময়টা এখন বেশ ভালো যাচ্ছে। এখানে মিঃ বোয়েসের সঙ্গে দিন কাটানো খুবই সন্তোষজনক হয়ে উঠেছে—বই পড়া, প্রশান্ত পরিবেশ, এবং যা কিছু আমার বিঘ্ন ঘটাতে পারে তেমন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব এখানে নেই।

কিন্তু জানিনা কোন ভাগ্য এখন আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

আমার চিঠিটা খুব কৌতুকজনক, তাই নয়? কিন্তু (ফরাসী ভাষায়) এই আমার প্রথম প্রয়াস।

আপনার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১০]

ফরাসী অনুবাদ থেকে

(ভগিনী ক্রিষ্টিনকে লেখা)

৬ প্লাস দে এতাৎ উনি, প্যারিস
১৪ অক্টোবর, ১৯০০

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার ওপর ভগবানের আশীর্বাদ আসুক, প্রিয় ক্রিষ্টিন, এই আমার সতত প্রার্থনা!

তোমার চিঠিখানা অতি সুন্দর, প্রশান্তিতে পূর্ণ; আমাকে নতুন শক্তি দিয়েছে, যে শক্তি আমি এখন প্রায় হারিয়ে ফেলছি।

আমি সুখী, হ্যাঁ সত্যিই সুখী ; কিন্তু মেঘ এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাঝে মাঝে তা ফিরে ফিরে আসে ; তবে তা আগেকার মতো অমন মন-মরা ভাব নিয়ে আসে না।

আমি এখানে আছি একজন প্রখ্যাত ফরাসী লেখকের সঙ্গে, তাঁর নাম জুলে বোইস। আমি তাঁর অতিথি। তিনি তাঁর কলম দিয়ে জীবিকার সংস্থান করে থাকেন বলেই ধনী নন ; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক মহৎ ধারণা সম্পর্কে মিল আছে, অতএব পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা সুখে আছি।

কয়েক বৎসর আগে আমাকে তিনি আবিষ্কার করেন, ইতিপূর্বেই আমার কয়েকটি পুস্তিকা তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আমরা যা অনুসন্ধান করে চলেছি অন্তিমে তা আমাদের লাভ হবেই, তাই নয় কি ?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাকে মাদাম কালভে, মিস ম্যাকলয়েড এবং মিঃ জুলে বোইসের সহযাত্রী হতে হবে। বিখ্যাত গায়িকা মাদাম কালভেরই অতিথি হব আমি। আমরা যাব কনস্টান্টিনেপলে, নিকট প্রাচ্যে, গ্রীসে এবং মিসরে। ফেরবার পথে ভিনিস দেখে আসব।

প্রত্যাবর্তনের পরে হয়ত প্যারিসে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে পারি। ইংরেজিতে বক্তৃতা হবে, দোভাষী তা অনুবাদ করে দেবেন। এই বয়সে নতুন একটি ভাষা আয়ত্ত করার সময়ও আমার নেই, সামর্থ্যও নেই। আমি একটি বুড়ো মানুষ। তাই নয় কি ?

মিসেস ফ্‌ংকে অসুস্থ। আমার ধারণা তিনি খুব কঠোর পরিশ্রম করেন। ইতিপূর্বেই তিনি স্নায়ুর ব্যাধিতে কষ্ট পেয়েছেন। আশা করি তিনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন।

আমেরিকায় যত টাকা রোজগার করেছিলাম তার সবটাই ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি মুক্ত, পূর্বের মতো সেই ভিক্ষু সন্ন্যাসী। মঠের অধ্যক্ষ পদ থেকেও আমি ইস্তফা দিয়েছি। ভগবানের কৃপায় আমি মুক্ত! ওরকম দায়িত্ব বহনের দায় আর আমার নেই। খুবই নার্ভাস এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি।

"বৃক্ষ শাখায় যারা ঘুমিয়েছিল, প্রভাতের আগমনে সেই বিহঙ্গকুল নিদ্রাভঙ্গে সঙ্গীতমুখর হয়ে যেমন ঊর্ধ্বে ঘন নীল আকাশে পাখা মেলে দেয়, আমার জীবনেরও সমাপ্তি আসে সেই ভাবে।"

আমি অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছি, কিছু মহৎ সাফল্যও অর্জন করেছি। কিন্তু যখন সাফল্য লাভ হয়েছে সেই তুলনায় বাধাবিঘ্ন এবং কষ্ট যন্ত্রণাগুলি নিতান্তই তুচ্ছ। আমি আমার লক্ষ্য লাভ করেছি। জীবন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলাম যে মুক্তার অনুসন্ধানে তা আমি পেয়েছি। পুরস্কার আমার লাভ হয়েছে। আমি সন্তুষ্ট।

আমার তাই বোধ হয়, আমার জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে : বোধ হচ্ছে মা আমাকে এখন ধীরে এবং শান্তভাবে চালাবেন। বাধাবিঘ্নে ভরা পথে আর প্রয়াস নয়, এখন পাখির পালকে তৈরী কোমল শয্যা। তুমি কি তা বোঝ ? বিশ্বাস কর, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত।

এখন পর্যন্ত আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় শিখেছি, একাগ্রভাবে যা কিছুর সন্ধান করেছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা-ই পাওয়া গেছে। কখনো কখনো তার জন্য বহু যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না! পুরস্কার লাভের কোমল আনন্দে সব কিছু ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু হায়! এখন তুমি যা পাচ্ছ সে পুরস্কার নয়, সে একটা অতিরিক্ত উৎপীড়ন।

আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি দেখছি মেঘ কেটে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অপসৃত হয়ে যাচ্ছে আমার কর্মফলের অশুভ মেঘরাশি। আর আমার শুভ কর্মফলের সূর্য উদয় হচ্ছে—সহস্র দ্যুতির সৌন্দর্যে ও পরাক্রমে। তোমার ক্ষেত্রে এইটিই হবে বন্ধু। এই ভাষায় আমার যে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান তাতে আমার প্রকৃত আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কোন ভাষাতেই বা তা সম্ভব?

সুতরাং ক্ষান্ত হচ্ছি; তোমার উপরই ছেড়ে দিচ্ছি—আমার চিন্তাকে তোমার অন্তঃকরণ দিয়ে মোলায়েম প্রীতিপ্রদ ও উজ্জ্বল ভাষায় মণ্ডিত করে নিয়ো। বিদায় জানাচ্ছি, শুভ রাত্রি!

তোমার ভক্ত বন্ধু
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ, আমরা প্যারিস ছেড়ে ভিয়েনায় যাত্রা করব ২৭ অক্টোবর। আগামী সপ্তাহ নাগাদ মিঃ লেগেট যাত্রা করবেন আমেরিকায়। ডাকঘরকে বলে দেব আমাদের চিঠিপত্র যেন আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বি

[১১]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

পোর্ট টিউফিক
২৬ নভেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

জাহাজ আসতে দেরী হয়েছে; তাই আমি অপেক্ষা করছি। ভগবানের কৃপায় আজ সকালে জাহাজ পোর্ট সৈয়দের নিকট খালে ঢুকেছে। তার মানে, সব ঠিক ঠিক চললে আজ সন্ধ্যায় তা যথাস্থানে পৌঁছবে।

অবশ্য এ দুদিন যেন নির্জন কারাবাসে কেটেছে, আমি কোনো প্রকারে ধৈর্য ধারণ করে আছি।

কিন্তু লোকে বলে অদল বদল করার মূল্য তিনগুণ বেশী। মিঃ গ্যাজের এজেন্টরা আমায় সবটাই ভুল নির্দেশ দিয়েছিল। প্রথমতঃ আমাকে কিছু যে একটা বলে দেবে এমন একজনও কেউ এখানে ছিল না, স্বাগত জানানো তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়তঃ আমায় কেউ বলে দেয়নি যে, অপর স্টীমারের জন্য আমায় এজেন্টের অফিসে গিয়ে গ্যাজের টিকেটখানা পাল্টে নিতে হবে—আর তাও তো সেই সুয়েজে, এখানে নয়। সুতরাং স্টীমার দেরীতে আসায় এক হিসাবে বরং ভালোই হয়েছে। এই সুযোগে দেখা করলাম স্টীমারের এজেণ্টের সঙ্গে, তিনি আমাকে জ্যাজের 'পাস' খানা বদলে পাকা টিকেট নিয়ে নিতে বললেন।

আজ রাতে কোনো এক সময়ে স্টীমারে চাপব আশা করি। ভালো আছি, সুখে আছি আর মজাটা খুব উপভোগ করছি।

মাদামোয়াজেল কেমন আছেন? বোইস কোথায়? মাদাম কালভেকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাবে। তিনি খুব ভালো লোক।

আশা করি তোমার সফর উপভোগ্য হবে।

সতত স্নেহবদ্ধ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১২]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ
১৫ ডিসেম্বর, ১৯০০

মাগো,

তিন দিন আগে এখানে পৌঁছেছি। আমার আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল—প্রত্যেকেই খুব অবাক হয়ে গেছে। আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে কাজ কর্ম বেশ ভালোই চলেছে, আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালো। শুধু মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। আঘাতটা প্রচণ্ড, এখন হিমালয় এলাকায় কাজের ভবিষ্যৎ যে কী হবে আমি জানি না। মিসেস সেভিয়ার এখনো সেখানেই আছেন, রোজই আশা করছি, তাঁর চিঠি আসবে।

আপনি কেমন আছেন? কোথায় আছেন? আশা করছি এখানে আমার সব ব্যাপারাদির একটা সুরাহা শীঘ্রই হয়ে যাবে, তার জন্য আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

আমার জ্ঞাতি ভগ্নীকে যে টাকা আপনি পাঠিয়ে থাকেন এখন থেকে তা সরাসরি আমাকে পাঠাবেন, বিল যেহেতু আমার নামেই। টাকা ভাঙিয়ে আমি তাকে তা পাঠিয়ে দেব। আমার মারফৎ টাকাটা তার কাছে যায় সেটিই ভালো ব্যবস্থা।

সারদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ পূর্বাপেক্ষা অনেক ভালো আছে; এবছর এখানেও ম্যালেরিয়াও প্রায় নেই বললেই চলে। নদীর তটে এই ফালি জমিটা অবশ্য সর্বদাই ম্যালেরিয়া মুক্ত। বিশুদ্ধ জলের পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থাটা হলেই এখানকার সব কিছু সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

বিবেকানন্দ

[১৩]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখ)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট
স্যানফ্র্যান্সিসকো
১০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

নিউ ইয়র্কে একটা কলহ চলছে বুঝতে পারছি। অ—র একখানা চিঠি পেয়েছি, সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাবে বলে জানিয়েছে। তার ধারণা হয়েছে, মিসেস বুল এবং তুমি আমার কাছে তার বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখেছ। উত্তরে আমি তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেছি, আর জানিয়েছি যে মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলয়েড তার সম্পর্কে আমার কাছে সব ভালো ভালো কথাই লিখেছেন।

জো জো, তুমি তো জান এই সব হাঙ্গামা হুজুত বিষয়ে আমার পদ্ধতি কী; এই সব ব্যাপারে একেবারে মাথা দিতে নেই! "মা" এই সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা করেন। আমার কাজ সমাপ্ত করেছি। আমি এখন অবসর নিয়েছি, জো। "মা" এখন নিজেই তাঁর কাজ করবেন। বাস্।

এবার বলি, তোমার যেমন পরামর্শ, সেই মত আমার এখানকার রোজগারের সব টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজই পাঠাতে পারতাম, কিন্তু অপেক্ষা করছি এক হাজার পুরাবার জন্য। এই সপ্তাহের শেষ দিকে ফ্রিস্কোতে এক হাজার হয়ে যাবে আশা রাখি। নিউ ইয়র্কের নামে একখানা ড্রাফট কিনে তা পাঠিয়ে দেব, কিংবা ব্যাঙ্ককেই বলব যথোচিত ব্যবস্থা করতে।

মঠ হতে এবং হিমালয় কেন্দ্র হতে প্রচুর চিঠিপত্র এসেছে। আজ সকালে স্বরূপানন্দর একখানা চিঠি এল। গতকাল এসেছে মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে।

মিসেস হ্যানসবরোকে ফটোগুলির কথা বলেছি।

মিঃ লেগেটকে আমার নাম করে বেদান্ত সোসাইটি ব্যাপারে যথোচিত সমাধান করতে বলবে। আমি এইটুকু বুঝেছি যে, প্রত্যেক দেশে তার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করেই আমাদের চলতে হবে। অতএব আমি তোমার অবস্থায় থাকলে সমস্ত সদস্য ও সমর্থকের একটি সভা ডেকে জিজ্ঞাসা করতাম তাঁরা কী করতে চান। তাঁরা সংঘ গড়তে চান কিনা, চাইলে কী ধরনের সংস্থা চান, ইত্যাদি। কিন্তু এ ব্যাপারে মালিক তুমি, তোমার পদ্ধতিতেই চল। আমি হাত গুটিয়েছি। শুধু যদি মনে কর আমার উপস্থিতি দ্বারা কোনো সাহায্য হতে পারে তাহলে দিন পনরর মধ্যে আমি হাজির হতে পারি।

আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। তবে স্যানফ্র্যান্সিসকোর বাইরে স্টকটন নামে একটি ছোট শহর আছে, ওখানে থেকে দিন কয়েক কাজ করতে চাই। অতঃপর যাব পূর্বাঞ্চলে। ভাবছি এখন বিশ্রাম নেব, অবশ্য এই নগরীতে আমি একটানা প্রতি

সপ্তাহে গড়ে ১০০ ডলার করে রোজগার করতে পারি। কিন্তু লাইট ব্রিগেডের চার্জ এবার নির্দেশিত করতে চাইছি নিউ ইয়র্কের ওপর।

অজস্র ভালোবাসা
তোমাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

সংঘ গড়ার ব্যাপারে কর্মীদের সকলেরই যদি বিরাগ থাকে তাহলে ওতে কোনো ফল হবে মনে কর কি? তুমিই ভালো জান। তোমার যা ভালো মনে হয় তাই কোরো। চিকাগো থেকে মার্গটের একখানা চিঠি পেয়েছি। সে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে; আমি জবাব দেব।

বি

[১৪]

(একজন আমেরিকান বন্ধুকে লেখা)

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া
১২ এপ্রিল, ১৯০০

মা পুনর্বার প্রসন্ন হয়ে উঠছেন। অবস্থা অনুকূল হয়ে আসছে। তা অবশ্য হতেই হবে।

কর্ম সর্বদা অশুভকে সঙ্গে নিয়েই আসে। আমি সঞ্চিত অশুভ রাশির দায় পরিশোধ করেছি স্বাস্থ্য খুইয়ে। আমি তাতে আনন্দিত; তার ফলে আমার মন হালকা হয়েছে। আমার জীবনে এখন একটি কোমলতা, একটি প্রশান্তি এসেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। একই সঙ্গে কী করে আসক্ত এবং অনাসক্ত হতে হয় এখন তাই শিখছি, আর মনে ও চিন্তায় নিজের ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম হচ্ছে।...

মায়ের কাজ মা-ই করছেন। তার জন্য এখন আর তেমন মাথা ঘামাই না। আমার মতো পতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে হাজারে হাজারে মরছে। কিন্তু মায়ের কাজ তবু চলছে অবিশ্রান্ত। জয় মা!...মায়ের ইচ্ছা-স্রোতে একাকী গা ভাসিয়ে চলা—এই তো আমার সমগ্র জীবন। যে মুহূর্তে এই নিয়ম ভাঙতে গেছি তখনই ঘা খেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!...

আমি সুখী, আমার নিজের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, অন্তরের সন্ন্যাস আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সমুজ্জ্বল। আপন আত্মীয়বর্গের প্রতি আমার ভালোবাসা প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে, আর বৃদ্ধি পাচ্ছে মায়ের প্রতি ভালোবাসা। দক্ষিণেশ্বরের অশ্বত্থপাদমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে অনিদ্রায় দীর্ঘ রাত্রি যাপন করতাম তারই স্মৃতি জাগরূক হচ্ছে। কর্মের কথা? কর্ম কী? কারই বা কর্ম? কর্ম করব কার জন্য?

আমি মুক্ত। আমি মা-র সন্তান। মা-ই সকল কর্ম করেন, সবই মা-র লীলা। আমি কেন পরিকল্পনা করব? কী পরিকল্পনাই বা করব? মা-র যেমন অভিরুচি তেমনি ভাবেই যা-কিছু আসবার এসেছে, যা যাবার তা চলে গেছে—আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা করেনি। মা-ই যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র।

[১৫]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া
২০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

আজ তোমার চিঠি পেলাম। গতকাল তোমাকে একটি চিঠি লিখেছি, তুমি ইংল্যাণ্ডে আছ মনে করে তা সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

মিসেস বেটসকে তোমার মেসেজ দিয়েছি। অ—র সঙ্গে এই যে বিবাদটা দেখা দিয়েছে তার জন্য আমি খুব দুঃখিত। তুমি তার যে চিঠি পাঠিয়েছ তাও পেলাম। "স্বামী আমাকে লিখেছেন, 'বেদান্তর প্রতি মিঃ লেগেটের আগ্রহ নেই, কাজেই তিনি আর সাহায্য করবেন না। তুমি তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াও' "—একথা অ—ঠিকই লিখেছে। লস এঞ্জেলস থেকে নিউ ইয়র্ক সম্পর্কে আমি এরকম লিখি তুমি এবং মিসেস লেগেট তো তাই চেয়েছিলে; সে যখন জিজ্ঞেস করে পাঠাল টাকাকড়ি সম্পর্কে কী করবে তখনই তাকে ওরকম লেখা হয়েছিল।

সব কিছুই তার স্বাভাবিক গিত নেবে। কিন্তু বোধ হয় তোমার এবং মিসেস বুলের মনে এই রকম একট ধারণা আছে যে আমার একটা কিছু করা উচিত। কিন্তু প্রথমতঃ সমস্যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কী নিয়ে ঝামেলা দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে তোমরা কেউ কিছু লেখ না, আমি তো আর অন্যের মনের কথা পড়ে ফেলতে পারি না। তুমি শুধু একটা মামুলী কথা জানিয়েছিলে যে, অ— সব কিছুই নিজের কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এইটুকু থেকে আমি কী বুঝব? সমস্যা এবং অসুবিধাগুলি কী? কী নিয়ে মতপার্থক্য? প্রলয়ের দিন ঠিক কখন আসবে তা যেমন জানি না, তেমনি এই সব ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি! তথাপি তোমার এবং মিসেস বুলের পত্রে দেখছি বিরক্তির ভাব! আমরা না চাইলেও এই সব ব্যাপারে কখনো কখনো জটিলতা দেখা দেয়। অতএব আপনা আপনি তার মীমাংসা হতে দাও।

উইল এক্সেকিউট করে মিসেস বুলের অভিপ্রায় অনুসারে তা মিঃ লেগেটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমার চলছে এক প্রকার, কখনো ভালো থাকি, আবার কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ি।

নিজের বিবেকের দিকে তাকিয়ে এমন কথা বলতে পারি না যে মিসেস মিল্টনের দ্বারা আমার বিন্দুমাত্র উপকার হয়েছে। তিনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমার ভালোবাসা জানাই। আশা করি তিনি অন্যদের উপকার করতে পারবেন।

এই কথাটি মিসেস বুলকে লিখেছিলাম; তার জবাবে চার পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সারমন' পেয়েছি: আমার কি ভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, বাধিত হওয়া উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সবই ঐ অ—জনিত ব্যাপারের জের নিশ্চয়! স্টার্ডি ও মিসেস জনসন বিরক্ত হয়েছেন মার্গটের কাজে; তার জন্য আমাকে দায়ী করেন ওঁরা। এখন অ— মিসেস বুলকে বিরক্ত করছে, আর তার দায়ও অবশ্যই আমাকে বইতে হবে। এই তো জীবন!

তুমি এবং মিসেস লেগেট চেয়েছিলে আমি যেন তাকে স্বাধীন ও মুক্ত হতে লিখি, এবং একথাও জানাই যে মিঃ লেগেট ওদের সাহায্য করবেন না। তাই লিখলাম— এখন কী করতে পারি? জন ও জ্যাক যদি তোমাকে না মান্য করে তবে তার জন্য কি আমাকে ফাঁসী যেতে হবে? এই বেদান্ত সোসাইটির আমি কি জানি? আমি তার পত্তন করেছিলাম? ওতে কি আমার কোনো হাত ছিল? তার ওপর কেউ একবার ঘুণাক্ষরে আমাকে অনুগ্রহ করে বলবে না ব্যাপারটা কী! বেশ মজা, দুনিয়াটা সত্যি খুব মজার জায়গা।

মিসেস লেগেট দ্রুত সেরে উঠছেন জেনে খুশী হলাম। তাঁর সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমি প্রার্থনা করি। সোমবার চিকাগো যাত্রা করছি। এক দয়ালু মহিলা আমাকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত একখানা 'পাস' দিয়েছেন, সেটি তিনমাস ব্যবহার-যোগ্য থাকবে। মা আমার দেখাশুনা করবেন। সারা জীবন ভর আমাকে রক্ষা করে এসে এখন তিনি আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেবেন না।

চিরকৃতজ্ঞ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১৬]

(মিস মেরী হালেকে লেখা) ২৩ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

আমার আজই যাত্রা করা উচিত ছিল; কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটে গেছে; যাবার আগে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল রেড উড গাছের তলায় শিবিরে কিছুকাল কাটাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। অতএব তিন চার দিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখছি। তাছাড়া, অবিরাম কাজ করার পর বুক ভরে একবার ভগবানের মুক্ত বাতাস টেনে নেওয়া আমার দরকার; এর পরেই তো আবার চারদিনের যাতায়াতের হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে।

মার্গট তার চিঠিতে বিশেষ ভাবে বলছে আমার কথা রাখতেই হবে : পনের দিনের মধ্যে এসে আণ্ট মেরীকে দেখে যেতে হবে। তা কথা রাখা হবে—তবে পনের নয়, কুড়ি দিনের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে চিকাগোর ইদানীং তুষার ঝড় এড়াতে পারব, এবং খানিকটা শক্তি সঞ্চয়ও করে নিতে পারব।

মার্গট দেখছি আণ্ট মেরীর খুব ভক্ত; দেখা যাচ্ছে আমি ছাড়া অন্য লোকেরও ভাইপো ভাগনে, সম্পর্কিত ভাই বোন, মাসীমা কাকীমা আছে।

আগামীকাল বনের দিকে যাত্রা করছি। উফ্! চিকাগোয় ঢুকবার আগে ওজোনে ফুসফুস ভর্তি করে নিতে চাই। ইতিমধ্যে চিকাগোয় আমার নামে ডাকের চিঠিপত্র এলে রেখে দিয়ো, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, কিন্তু ওসব আবার এখানে পাঠিয়ো না।

কাজকর্ম সেরে ফেলেছি। এখন রেল ভ্রমণের আগে বন্ধুবান্ধবদের উপরোধে কয়েকদিনের—তিন কি চার দিনের—বিশ্রাম।

এখান থেকে নিউ ইয়র্কে যাবার একটি 'পাস' পেয়েছি তিনমাসের জন্য; 'স্লিপিং কার' ছাড়া আর কোনো খরচ নেই। সুতরাং দেখছ তো, ফ্রি, একেবারে ফ্রি!

তোমাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১৭]

(মিস মেরী হালেকে লেখা) ৩০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

হঠাৎ জ্বর এবং অন্যান্য অসুখে পড়ে যাওয়ার দরুন এখনো আমার চিকাগোয় যাত্রা করা হয়ে ওঠেনি। ভ্রমণ করার মতো যথেষ্ট সমর্থ হয়ে উঠলেই যাত্রা করব।

সেদিন মার্গটের একখানা চিঠি পেলাম। তাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো, তুমিও আমার ভালোবাসা জেনো। হ্যারিয়েট এখন কোথায়? চিকাগোতেই আছে কি? আর ম্যাকিণ্ডলি বোনেরা? তাদের সবাইকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো।

বিবেকানন্দ

[১৮]

(ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা) ২ মে, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমার খুব অসুখ হয়েছিল—মাসের পর মাস কঠোর পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ ঘটে। যাহোক, এতে বোঝা গেছে, আমার কিডনিতে বা হার্টে

কোনো রোগ নেই, অধিক পরিশ্রমে শুধু স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আজ তাই কিছুদিনের জন্য গাঁয়ে যাচ্ছি, শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকব সেখানে; আশা কার কয়েক দিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে শুধু প্লেগের খবর ইত্যাদিতে ভরা কোনো ভারতীয় পত্র আমি পড়তে চাই না। আমার সব চিঠিপত্র মেরীর কাছে যাচ্ছে; আমার ফিরে আসা পর্যন্ত ও সব মেরীর কাছে অথবা মেরী চলে গেলে তোমার কাছে থাকুক।

এবার আমি সব চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চাই। মা-র জয় হোক!

মিসেস সি. পি. হান্টিংটন এসেছিলেন; অতিশয় বিরাট ধনী মহিলা, উনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তোমাকে সাহায্য করতে চান। ১ জুনের মধ্যে তিনি নিউ ইয়র্কে আসবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যেয়ো না। আমি যদি তার আগে না আসতে পারি তবে তাঁর নামে তোমায় একখানা পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেব।

মেরীকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। এখান থেকে দিন কয়েকের মধ্যেই চলে যাব।

সতত শুভানুধ্যায়ী
তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

সঙ্গের চিঠিখানা দিলাম বিচারপতি অ্যাডামসের পত্নী মিসেস এম. সি. অ্যাডামসের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবে। এর ফলে অনেক ভালো হতে পারে। তিনি বেশ সুপরিচিতা, তাঁর ঠিকানা খুঁজে বার করে নিয়ো।

বি

[১৭]

(ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা) স্যানফ্রান্সিসকো
২৮ মে, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক। বিন্দুমাত্র আশা হারিয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু! শ্রী ওয়া গুরু! তোমার ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত। আমাদের হলুদ পোশাক হল যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সাজ আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণই আমাদের লক্ষ্য, সাফল্য বা সার্থকতা নয়। শ্রীওয়া গুরু!...

অশুভ ভবিতব্যটা পরতে পরতে ঘন কালো দিয়ে ঢাকা। কিন্তু আমি তো প্রভু, আমার হস্ত উত্তোলন কর, আর দেখ, ও সব অপসৃত হয়ে গেছে! এই সব কিছু বাজে কথা। আর ভয়ের কথা? আমি ভয়েরই ভয়, সন্ত্রাসের আতঙ্ক, আমি নির্ভয়,

আমি অদ্বিতীয়, আমিই ভাগ্যের নিয়ামক, বাস্তব ঘটনাকে আমিই নিশ্চিহ্ন করি। শ্রীওয়া গুরু! বৎসে স্থির অকম্পিত হও, সোনায় বা অন্য কিছুতে বিকিয়ে যেয়ো না; জয় আমাদের হবেই!

বিবেকানন্দ

[২০]

ইউ. এস. এ.
২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিংগা,

…অনবরত এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছি—লেকচার দেওয়া, ক্লাস নেওয়া প্রভৃতি চলছেই।

যে বইখানা লিখবার কথা আছে এখনো তার জন্য একটি লাইনও লিখতে পারি নি। সম্ভবত পরে তাতে হাত দেওয়া যাবে! এখানে উদারনৈতিকদের মধ্যে কয়েকজন বন্ধু লাভ করা গেছে, রক্ষণশীলদের মধ্যেও জনা কয়েক পাওয়া গেছে। শীঘ্রই ভারতে প্রত্যাবর্তন করব আশা করি; এখানে যথেষ্ট হয়েছে; বিশেষতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে আমি নার্ভাস হয়ে পড়ছি। অত্যধিক বক্তৃতা এবং অবিরত ছোটাছুটির দরুনই এই নার্ভাসনেস। এই অতিব্যস্ত অর্থহীন, টাকা রোজগারের জীবনে আমার কোনো আগ্রহ নেই। অতএব বুঝতে পারছ, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। অবশ্য এখানে একটি জনসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে যাদের মধ্যে আমি বিশেষ জনপ্রিয়, যারা সর্বসময়ের জন্য আমাকে এখানে চায়। কিন্তু আমার মনে হয়, লোকহিতকর জীবন নিয়ে সংবাদপত্রের রটনা আর দমবাজি যথেষ্ট হয়েছে। ওসবের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই।…

আমাদের পরিকল্পনার জন্য টাকা পাওয়ার কোনো আশা এখানে নেই। আশা করায়ও কোনো লাভ নেই। যে কোনো দেশেরই বেশী লোক শুধু সহানুভূতির খাতিরে উপকার করার জন্য এগিয়ে আসে না। খ্রীষ্টীয় ধর্মের দেশে সামান্য সংখ্যক লোক যে সত্যি টাকা দেয় তা প্রধানত দেয় নরকের ভয়ে এবং পুরুতবৃত্তির দৌলতে। ব্যাপারটা আমাদের সেই বাংলা প্রবাদের মতো, "গরু মেরে তার চামড়ায় জুতো বানিয়ে ব্রাহ্মণকে দান করা"। এখানে ব্যাপারটা ঠিক তাই, অন্যত্রও; তাছাড়া, আমাদের জাতের তুলনায় পশ্চিম দেশীয়রা বেশী কৃপণ। আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস পৃথিবীতে এশিয়াবাসীরাই সব থেকে বেশী দানপরায়ণ, তবে তারা বড় গরীব।

কয়েক মাস আমি নিউ ইয়র্কে থাকব। এইটি সারা দেশের মগজ, কর্মকেন্দ্র এবং অর্থভাণ্ডার। অবশ্য বোস্টনকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য নগর, আর আমেরিকার এই স্থানে শত সহস্র লোক আছে যারা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল।…নিউ ইয়র্কের লোকেরা মন-খোলা। দেখতে হবে এখানে কী করা যায়; ভরসার কথা, এখানে আমার বেশ কিছু প্রভাবশালী বন্ধু আছেন। আসলে এই লেকচার ব্যাপারটাতে আমার বিরক্ত

ধরে যাচ্ছে। উচ্চতর আধ্যাত্মিকতার মর্ম বুঝতে পশ্চিম দেশীয়দের অনেক সময় লাগবে। তাদের কাছে সব কিছুই পাউণ্ড শিলিং পেন্সের মাপে বাঁধা। যদি কোন ধর্ম তাদের অর্থ স্বাস্থ্য সৌন্দর্য বা দীর্ঘায়ু এনে দিতে পারে তবে তারা সবাই সেই ধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠবে, নচেৎ নয়।...

বালাজীকে, জি. জি.-কে এবং আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ো।

চির প্রেমবন্ধ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২১]

ইউ. এস. এ.
২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় বৎস,

এত শীঘ্র তোমার পৃথিবী ছেড়ে যাবার সঙ্কল্পের কথা শুনে মর্মাহত হলাম। ফল পাকবার পরই তা গাছ থেকে পড়ে। তাই ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা কর। তাড়াহুড়ো কিছু কোরো না। অধিকন্তু নিজের মূঢ় কাজে অন্যকে দুঃখ দেওয়ার অধিকার কারও নেই। অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২২]

(ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলির কাছে লেখা)

বোস্টন
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় বোন,

ভারতের ডাকের সঙ্গে তোমার চিঠিখানা এই মাত্র পেলাম। ভারত থেকে আমাকে একগাদা কাগজের কাটিং পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওগুলো তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি; পড়ে যত্ন করে রেখে দিও।

গত কয়েকদিন ধরে ভারতে চিঠিপত্র লিখতে ব্যস্ত আছি। বোস্টনে আরো কয়েকদিন থাকব।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদসহ
তোমাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[২০]

ইউ. এস. এ.
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিংগা,

...কলকাতায় প্রকাশিত আমার বক্তৃত ও নানা উক্তি সম্বলিত গ্রন্থসমূহে একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। তার কতকগুলি এমন ভাবে ছাপানো হয়েছে যে তাতে রাজনীতিক মতামতের আভাসটাই স্পষ্ট, অথচ আমি রাজনীতিজ্ঞ নই, রাজনৈতিক আন্দোলন আমার নয়। আমার সমগ্র প্রয়াস আধ্যাত্মিকতা নিয়ে—এইটি ঠিক হলে আর সব কিছু আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।...অতএব কলকাতার লোকজনকে সতর্ক করে দিও আমার লেখা বা বলার মধ্যে মিথ্যা করে যেন কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ না করা হয়। যত সব বাজে ব্যাপার!

...শুনলাম, ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের কাছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জি বলেছেন আমি নাকি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। একথা প্রকাশ্যে বলা হয়ে থাকলে আমার হয়ে সেই বাবুকেই প্রকাশ্যেই বলো তিনি যেন কলকাতার যে কোনো কাগজে লিখে তা প্রমাণ করেন, আর নয়ত যেন তার মূঢ় উক্তি প্রত্যাহার করেন। এসব আসলে ওদের চাতুরি! ক্রিশ্চিয়ান গভর্নমেণ্টদের সম্পর্কে সততাপূর্ণ সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে আমি কিছু কড়া কথা বলেছি; তদ্দারা একথা প্রমাণ হয়না যে, রাজনীতি বা ঐ ধরনের ব্যাপার নিয়ে আমি খুব মাথা ঘামাচ্ছি বা ঐ সব ব্যাপারের সঙ্গে আমার খুব সম্পর্ক আছে। ঐ সব বক্তৃতার অংশ বিশেষ ছাপিয়ে যারা বাহবা নিতে চায় এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, আমি একজন রাজনীতির প্রবক্তা, তাদের উদ্দেশে আমি বলি, "আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো।"...

...আমার বন্ধুদের বলবে, একটানা নীরবতাই কুৎসাকারীদের প্রতি আমার জবাব। তাদের ঢিলের বদলে আমি যদি পাটকেল মারি তবে তো আমাদের গিয়ে নামতে হয় তাদেরই স্তরে। তাদের বলবে, সত্য স্বয়ং প্রকাশ, তারা যেন আমার হয়ে কারো সঙ্গে লড়াই করতে না যায়। তারা এখনো বালখিল্য মাত্র, এখনো অনেক কিছুই তাদের শিখতে হবে। সামান্য বালক সব! এখনো তারা সোনার স্বপ্নেই বিভোর।

...লোকহিতকর জীবনের এই অসার কথাটা আর সংবাদপত্রের এই প্রচার আমাকে একেবারে তিক্ত বিরক্ত করে তুলেছে। আমার ইচ্ছে করছে হিমালয়ের নির্জনতায় ফিরে যাই।

সতত স্নেহবদ্ধ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২৪]

ইউ. এস. এ.
২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিংগা,

আমার সাহসী নিঃস্বার্থ বৎসবৃন্দ, তোমরা সবাই বেশ ভালো কাজ করেছ। তোমাদের নিয়ে আমার কত যে গর্ব!…আশা রাখ, নিরাশ হয়ো না। এই রকম আরম্ভের পরেও যদি নিরাশ হও তবে তো তোমরা নিতান্ত মূর্খ।…

আমাদের কর্মক্ষেত্র ভারতই, ভারতকে জাগ্রত করার মধ্যেই বিদেশের গুণগ্রাহিতার মূল্য। আর কিছু নয়।…একটি শক্ত ঘাঁটি আমাদের চাই, সেইখান থেকেই ছড়িয়ে পড়তে হবে। - এক মুহূর্তের জন্যও ভয়ে পিছিয়ে পড়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ইচ্ছাশক্তি পৃথিবীকে চালায়।

তরুণরা ক্রিশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে বলে দুঃখ কোরো না বৎস। এখনকার সামাজিক বন্ধনের অবস্থায়, বিশেষতঃ মাদ্রাজে তারা আর কি বা করতে পারে? বড় হওয়ার প্রথম শর্ত স্বাধীনতা। তোমার পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাই ধর্ম গড়ে উঠেছে। দেহকে তারা সর্ব বন্ধনের অধীন করেছিলেন, তাই সমাজে উন্নতি হয় নি। পাশ্চাত্যে ব্যাপারটা একেবারে বিপরীত—সমাজে সব রকম স্বাধীনতা, ধর্মে কোনো স্বাধীনতাই নেই। এখন প্রাচ্য দেশে সমাজের পা থেকে এবং পাশ্চাত্যে ধর্মের পা থেকে শিকল খসে পড়ছে।

প্রত্যেকেরই অবশ্য আপন স্বকীয়তা থাকবে; ভারতের বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় মনোভাব এবং অন্তর্মুখিনতা, আর পশ্চিমের হল বৈজ্ঞানিক বা বহির্মুখী দৃষ্টি। পাশ্চাত্য সামান্যতম আধ্যাত্মিকতাও চায় সামাজিক উন্নতির মধ্য দিয়ে। আর প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়েই পেতে চায় প্রতি বিন্দু সামাজিক ক্ষমতা। তাই দেখা যায় আধুনিক ধর্মসংস্কারকগণ ভারতের ধর্ম প্রথমে ধ্বংস করার আগে কোনো সংস্কার সাধনের পথ পান নি। তাঁরা চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়েছে। কেন? কারণ তাদের মধ্যে প্রায় কেউ আপন ধর্মেরও অনুধাবন করেন নি, আর সর্ব ধর্মের আদি মাতাকে বুঝবার জন্য যে শিক্ষা দরকার একজনও তা গ্রহণ করেন নি। আমি বলি হিন্দুসমাজকে উন্নত করার জন্য ধর্মের ধ্বংস সাধনের কোনো প্রয়োজন নেই; সমাজের এই অবস্থা যে ধর্মের কারণে হয়েছে তা নয়, সমাজে যে ভাবে ধর্মের প্রয়োগ উচিত ছিল সেই ভাবে তা হয়নি বলেই এই অবস্থা। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ থেকে এ বিষয়টি—এর প্রত্যেকটি কথা আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত। এই শিক্ষাই আমি প্রচার করে থাকি, এই আইডিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্যই আমাদের জীবন ভর সংগ্রাম করে যেতে হবে। কিন্তু তার অধ্যয়নে সময় লাগবে, দীর্ঘ সময়। ধৈর্য ধারণ করে কাজ করে যাও। আপনাকে দিয়েই আপনাকে রক্ষা কর।

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

বর্তমান হিন্দুসমাজ সংস্থাপিত শুধু আধ্যাত্মিক মানুষদের জন্য, অন্যদের তা নির্মম ভাবে পেষণ করে। কিন্তু কেন? যারা পৃথিবীকে তার চাপল্য সমেত উপভোগ করতে চায় তারা কোথায় যাবে? আমাদের ধর্মে যেমন সকলেরই আশ্রয় আছে সমাজেও তেমনই থাকা উচিত। এই মতটিকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে প্রথমে আমাদের ধর্মের মূলনীতিকে অনুধাবন করে এবং অতঃপর তা সামনে প্রয়োগ করে। এই কাজটিই করতে হবে, ধীর গতিতে—কিন্তু নিশ্চিতভাবে।

বি

[২৫]

ওয়াশিংটন
২৩ অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় বেহেমা চাঁদ লিম্বদি,

এ দেশে আমার বেশ ভালোই চলছে। এর মধ্যে আমি তাদেরই নিজস্ব একজন শিক্ষক হয়ে উঠেছি। এরা সব আমাকে এবং আমার শিক্ষণকে পছন্দ করছে।··· আমি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করি—যেমন ভারতে করা আমার অভ্যাস ছিল—এবং শিক্ষা দান করি, মত প্রচার করি। হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনেছে, আমার আইডিয়াকে তারা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এই দেশের জীবনযাত্রা অতিশয় ব্যয়বহুল, কিন্তু আমি যেখানেই যাই ভগবান আমার সব সংস্থান করে দেন।

তোমাকে এবং ওখানকার (লিম্বদি, রাজপুতনা) সকল বন্ধুদের আমার অজস্র ভালোবাসা জানাই।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২৬]

ওয়াশিংটন
C।O মিসেস টি. টটেন
১৭০৮ ডব্লু ৯ নং স্ট্রীট
২৬ (?) অক্টোবর, ১৮৯৪

(ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলিকে লেখা)

প্রিয় বোন,

দীর্ঘকাল কোনো চিঠিপত্র দিইনি, মাফ কোরো; মাদার চার্চকে অবশ্য নিয়মিত চিঠি দিয়েছি। আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই সুন্দর আবহাওয়ার ঠাণ্ডা আমেজটি

বেশ উপভোগ করছ। বাল্টিমোর এবং ওয়াশিংটন আমার খুব ভালো লাগছে। এখান থেকে আমি যাব ফিলাডেলফিয়ায় ভেবেছিলাম, মিস মেরী ফিলাডেলফিয়াতে আছে, তাই তার ঠিকানা চেয়েছিলাম। এখন জানছি সে ফিলাডেলফিয়ার নিকটবর্তী অন্য কোনো এক জায়গায় রয়েছে; আমার সঙ্গে এসে দেখা করার জন্য সে আবার ঝামেলায় পড়ুক তা আমি চাই না, মাদার চার্চ যদিও তাই বলছিলেন।

আমি যে মহিলার বাড়িতে আছি—মিসেস টটেন—তিনি মিস হাওয়ের ভাইঝি। আরো এক সপ্তাহ এখানে থাকব; আমাকে এই ঠিকানাতেই চিঠি দিতে পার।

এই বছর শীতকালে, জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী মাসের কোনো একটা সময়ে আমার ইংল্যাণ্ডে যাবার ইচ্ছে আছে। লণ্ডনে আমার এক বন্ধু যে মহিলাটির বাড়িতে থাকে তিনি সেখানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্য দিকে ভারত থেকেও তাগাদা আসছে সেখানে ফিরে যাবার জন্য।

কার্টুনে পিটুকে তোমার কেমন লাগল? ওটা কাউকে দেখিয়ো না। পিটুকে ঐ ভাবে ব্যঙ্গ করা আমাদের লোকজনদের খুব খারাপ কাজ হয়েছে।

তোমার কাছ থেকে চিঠি পেতে চাইছি দীর্ঘকাল ধরে; একটু সাবধান হয়ে লিখো যাতে লেখাটা স্পষ্ট হয়। এ কথার জন্য আবার রাগ কোরো না।

সতত স্নেহবদ্ধ তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[২৭]

ওয়াশিংটন
২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪

কল্যাণীয় স্নেহের আলাসিংগা,

ইতিমধ্যে আমার অন্যান্য পত্র নিশ্চয় পেয়েছ। আমার চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে যে কর্কশ সুর ফুটে ওঠে তাতে কিছু মনে কোরো না, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি সে তুমি খুব জানো। তুমি প্রায়ই জানতে চাও এদেশে আমি কী ভাবে চলাফেরা করছি, আমার বক্তৃতাদির রিপোর্টও পাঠাতে বল। ভারতে যা করতাম এখানে আমি ঠিক তাই করছি। সর্বদাই প্রভুর উপর নির্ভর করি, আগে থাকতে কোনো প্ল্যানই করি না।…অধিকন্তু তোমার স্মরণ রাখা দরকার যে এদেশে আমাকে কাজ করতে হয় অবিশ্রান্ত। আমার চিন্তাধারাকে সংবলিত করে যে একটি বইয়ের আকার দেব তার বিন্দুমাত্র সময় পাই না। আর অনবরত ছোটাছুটির ফলে আমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেটা আমি বেশ টেরও পাচ্ছি। আমার জন্য তোমরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এবং নিঃস্বার্থভাবে যা কিছু করেছ তার জন্য তোমার কাছে, জি. জি.র কাছে এবং মান্দ্রাজের অন্যান্য বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু কাজটা তো শুধু আমার প্রচারব্যবস্থা মাত্র নয়, তার উদ্দেশ্য ছিল

তোমাদের আপন শক্তি সম্পর্কে সচেতন করা। আমি সংগঠক নই, আমার ধাতে রয়েছে বিদ্যাচর্চা এবং ধ্যান। আমার মনে হয় কাজ আমি যথেষ্ট করেছি, এখন বিশ্রাম চাই, আর গুরুদেবের কাছ থেকে যারা আমার কাছে এসেছে তাদের কিছু কিছু শিক্ষা দান করতে চাই। ইতিমধ্যে তোমরা বুঝেছ কী তোমরা করতে পার, আসলে তোমরাই, মাদ্রাজের তরুণেরাই সব কিছু করেছ, আমি তো নামে মাত্র। আমি একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার কেবল একটি জিনিস চাই। এখন কোনো ভগবানে বা ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই যা বিধবার চোখের জল না মুছিয়ে দিতে পারে, যা অনাথের মুখে একটুকরো রুটি না তুলে ধরতে পারে। তত্ত্ব যত মহিমান্বিত হোক না কেন, দর্শন যতই কেন না সুচারু হোক—যতক্ষণ তা বইপত্রে এবং গোঁড়ামিতে সীমাবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ আমি তাকে ধর্ম বলতে পারব না। মানুষের চোখ থাকে কপালে, পিঠে নয়। সুতরাং অগ্রে চলতে হবে; যাকে তোমরা ধর্ম বলে গর্ব কর তা-ই ব্যবহারে প্রয়োগ করো, ভগবান তোমাদের সহায় হোন!

আমার পানে তাকিয়ো না, তাকাও নিজেদের দিকে। একটি উৎসাহ জাগিয়ে তোলার কারণ হতে পেরেছি যে তাতেই আমি সুখী। তার সুবিধাটা নিয়ে ঐ স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রেম কখনো বৃথা হয় না বৎস; আজ কিংবা আগামীকাল অথবা যুগ যুগ পরে হোক, সত্যের জয় হবেই। প্রেমই জয়যুক্ত হবে। তুমি কি তোমার মানুষ ভাইদের ভালোবাস? কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?—এই সব দরিদ্র হতভাগ্য দুর্বল বঞ্চিতরাই কি ঈশ্বর নয়? আগে এদের কেন পূজা কর না? গঙ্গাতীরে কূপ খনন করতে চলেছ কেন? প্রেমের সর্বজয়ী শক্তিতে বিশ্বাস রাখো। তুচ্ছ ফাঁপানো নাম খ্যাতিকে কে পরোয়া করে? সংবাদপত্রে কী বলা হচ্ছে তা আমি খুলেও দেখি না। তোমার মনে কি প্রেম আছে?—তাহলে তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি কি সম্পূর্ণ স্বার্থলেশশূন্য? তা হলে তুমি অপ্রতিরোধ্য। সর্বত্র চরিত্রবলেই ফললাভ হয়ে থাকে। সমুদ্রের গভীর তলদেশেও ভগবান তার সন্তানদের রক্ষা করেন। তোমার দেশের আজ বীর প্রয়োজন; বীর হও! ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন!

প্রত্যেকেই চাইছে আমি ভারতে ফিরে আসি। তাদের ধারণা আমি ফিরে এলেই কাজটা আরো ভালো হবে। তারা ভ্রান্ত, বন্ধু। বর্তমানে যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তা সামান্য দেশপ্রেম মাত্র, এর কোনো তাৎপর্য নেই। এই উৎসাহ যদি সত্য হয় অকৃত্রিম হয় তাহলে দেখবে অচিরেই শত শত বীর এগিয়ে আসবে এবং কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাবে। অতএব সবাই মিলে কতটুকু কী করেছ সেইটি ভালো করে বোঝো, তারপর অগ্রসর হয়ে চলো। আমার মুখাপেক্ষী হয়ো না। অক্ষয়কুমার ঘোষ লণ্ডনে রয়েছেন। লণ্ডন থেকে সুন্দর একটি আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে বলেছেন মিস মুলারের ওখানে আসতে। আশা করছি আগামী জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী মাসে যাব। ভট্টাচার্যও আমাকে আসতে লিখেছে। এখানে কর্মক্ষেত্র বিরাট। এই 'বাদ' (ইজম) বা ঐ 'বাদ' দিয়ে আমি কি করব? আমি প্রভুর সেবক মাত্র। উচ্চ ভাবধারা প্রচারের পক্ষে এখানকার চেয়ে ভালো ক্ষেত্র

পৃথিবীর আর কোথায় আছে? এখানে একজন লোক যদি আমার বিরুদ্ধে তবে আরো শত হস্ত আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে; এখানে মানুষের জন্য মানুষ দরদ বোধ করে, মানুষ অন্য মানুষের দুঃখে কাঁদে, আর এখানকার নারীরা যেন দেবী! আপন প্রশংসা শুনবার জন্য মূর্খরাও উঠে দাঁড়াতে পারে, যখন সব কিছুই ভালোয় ভালোয় ঘটে যাবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তখন কাপুরুষও বীরত্বের ভান করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত যে বীর তার কাজ চলে নীরবে। একজন বুদ্ধ বাস্তব হবার পূর্বে কত বুদ্ধ না শেষ হয়ে যায়! বৎস, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, তাই আমি মানুষেও বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি দুস্থ কাতর মানুষকে সাহায্য করায়। অন্যান্যদের রক্ষা করার জন্য নরকে যাওয়াতে পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি। পশ্চিম দেশীয়দের কথা? তারা আমাকে খাদ্য দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, দিয়েছে বন্ধুত্ব, দিয়েছে নিরাপত্তা এমন কি সব থেকে রক্ষণশীল ক্রিশ্চিয়ানদের কাছেও তা পেয়েছি। এদের কোনো পাদ্রী ভারতে গেলে আমার দেশের লোক কী করে? তারা ম্লেচ্ছ বলে তোমরা তো তাদের ছোঁওনা পর্যন্ত! অন্যকে ঘৃণা করে কোনো মানুষ, কোনো জাতি বেঁচে থাকতে পারে না বৎস। যেদিন ম্লেচ্ছ কথাটি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেদিন অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগ বন্ধ হয়েছে ভারতের দুর্ভাগ্য সেদিনই নিশ্চিত হয়ে গেছে। সেই আইডিয়াকে কী করে লালন করবে তা ভালো করে বিবেচনা কোরো। বেদান্ত নিয়ে সাবলীল কথাবার্তা বেশ চমৎকার, কিন্তু তার সামান্যতম অনুশাসন পালন করা কত কঠিন!

আশীর্বাদসহ

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

দুটি বিষয়ে সাবধান থেকো—ক্ষমতার লিপ্সা এবং ঈর্ষাপরায়ণতা। সব সময় "নিজের ওপর আস্থা" রাখার অভ্যাস করবে।

[১৮]

ইউ. এস. এ.

৩০ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিংগা,

ফনোগ্রাফ এবং চিঠি ঠিক ঠিক পৌঁছেছে শুনে খুশী হলাম। খবরের কাগজের কাটিং পাঠাবার আর দরকার নেই। কাটিংয়ের বন্যায় আমি প্লাবিত। এখন সংস্থার জন্য কাজ করতে লেগে যাও। নিউ ইয়র্কে ইতিপূর্বেই আমি একটি পত্তন করেছি, তার সহ-সভাপতি শীঘ্রই তোমাকে পত্র দেবেন। তাদের সঙ্গে পত্রালাপ রেখো। শীঘ্রই অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করব। আমরা নিজেদের শক্তি সংগঠিত করব গোষ্ঠীভুক্ত হবার জন্য নয়—সংগঠন ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে নয়, পরন্তু অনাধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে। এক প্রবল প্রচারাভিযান সুরু করতে হবে। সবাই মিলে বুদ্ধি করে সংগঠন তৈরী করো।

রামকৃষ্ণর অলৌকিক কীর্তিকলাপ নিয়ে কী সব বাজে কথা বলা হচ্ছে!… অলৌকিক কীর্তিকলাপের কিছু আমি জানি না বুঝিও না। সুরাকে গুপ্তর পাচনে পরিণত করা ছাড়া কি এই পৃথিবীতে রামকৃষ্ণর আর কিছুই করবার ছিল না? কলকাতা এরকম সব লোকজনের হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! কি বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করতে হবে! শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কর্ম সাধনের জন্যে, কোন শিক্ষা প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করে তাঁর প্রকৃত জীবনী রচনা যদি করতে পারে তাহলে তা করুক, অন্যথায় তারা যেন কোনো প্রকারেই তাঁর জীবনী ও বাণীকে বিকৃত না করে। এই সব লোক ঈশ্বরকে জানতে চায়, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণর মধ্যে তারা ভোজবাজি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পায় না!…কিডি যেন তাঁর প্রেম, তাঁর জ্ঞান, তাঁর শিক্ষা, তাঁর সারগ্রাহিতা প্রভৃতিকে ভাষায় প্রকাশিত করে তোলে। এই হল বিষয়বস্তু! শ্রীরামকৃষ্ণর জীবন একটি অনন্যসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার দ্যুতিতে হিন্দুধর্মের সামগ্রিকতা সম্পর্কে একটি সম্যক উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। শাস্ত্রসমূহের মধ্যে তত্ত্বের যে জ্ঞান নিহিত আছে তিনি ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক। ঋষি এবং অবতারগণ যা শেখাতে চেয়েছেন তা সবই বিধৃত তাঁর জীবনে। গ্রন্থাদিতে শুধু তত্ত্ব, আর তিনি তার মূর্ত উপলব্ধি। এই মানুষটি তাঁর একান্ন বছর বয়সের মধ্যে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার জীবনকে ধরেছিলেন, তাই তো তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কাছে এক মহৎ শিক্ষার আধার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরই প্রবর্তিত 'অবস্থা' তত্ত্ব দ্বারাই কেবল বেদকে ব্যাখ্যা করা চলে এবং শাস্ত্র সমূহের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়; এই তত্ত্বের মর্ম হল—অন্যান্যদের আমরা যে শুধু বরদাস্ত করব তাই নয়, পরন্তু তাদের আলিঙ্গন করতে হবে; এই সত্যটিই সর্ব ধর্মের বনিয়াদ। এই ভাবধারা অনুসরণ করে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী এবং মনোজ্ঞ জীবনী রচনা করা যায়। যাই হোক, ঠিক সময় মত সবই হবে। যৌনবিষয়ক ইত্যাদি অবিধেয় এবং অশালীন প্রসঙ্গ বাদ দেবে, কারণ অন্যান্য দেশে এই সকল প্রসঙ্গকে নিতান্ত অশ্লীল মনে করা হয়; আর ইংরিজিতে লেখা তাঁর জীবনী তো সারা পৃথিবীতেই পড়া হবে। একখানা বাংলা জীবনী আমাকে পাঠানো হয়েছিল, সেটি পড়লাম। ও সব কথায় বইটা ভরতি!…অতএব সতর্ক হবে, ও সব কথা এবং প্রসঙ্গ সযত্নে বাদ দেবে। কলকাতার বন্ধুদের এক কানাকড়ি যোগ্যতাও নেই, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য জাহির করার ক্ষমতাটা আছে। তারা এত উঁচুতে যে উপদেশ পরামর্শ শোভা তাদের সম্ভব নয়। এই সকল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের দিয়ে যে কী করা যায় জানি না। ও দিক থেকে বেশী কিছু আশা করবার নেই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে! বাংলা বইখানার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত। লেখক সম্ভবত ভেবেছিলেন তিনি সত্যকেই অবিকল লিপিবদ্ধ করছেন এবং স্বয়ং পরমহংসের ভাষাটিকে অকৃত্রিম রূপ দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর স্মরণ নেই যে রামকৃষ্ণ কখনো মহিলাদের সামনে ও রকম ভাষা ব্যবহার করতেন না আর এই লেখকই কিনা আশা করেন নর নারী নির্বিশেষে সকলে তাঁর বই পড়বে! মূর্খদের হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! তাছাড়া আবার তাদের সব খেয়াল-টেয়াল আছে; সবাই নাকি তাঁকে চিনত ও জানত! যত সব বাজে কথা!

…ভিখিরীর পক্ষে রাজার মতো চাল মারা! মূর্খ যেমন নিজেকে জ্ঞানী মনে করে! ক্রীতদাস যেমন ভাবে সেই প্রভু! এদের অবস্থাটাও তাই। কী করব জানি না। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। মাদ্রাজ নিয়েই আমার সব আশা ভরসা। তোমাদের কাজ জোরসে চালিয়ে যাও। কলকাতার লোকদের দ্বারা চালিত হয়ো না। ওদের মধ্যে কেউ হয়ত উপযুক্ত হয়ে উঠবে এই আশা নিয়ে তাদের খোস মেজাজে রেখো কিন্তু তোমাদের কাজ স্বাধীন ভাবে চালিয়ে যাও। "রান্না হয়ে গেলে অনেকেই আসে ভোজ খেতে।" সতর্ক থেকে কাজ করে যাও।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের।
বিবেকানন্দ

[২৯]

ইউ. এস. এ.
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

…শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আশ্চর্য সব কাহিনীর কথা বলেছ; এ বিষয়ে আমার উপদেশ হল: এই সব গল্প কাহিনী এবং যারা এসব লেখে সেই মূর্খদের পরিহার করে চলবে। কাহিনী সব সত্যি, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মূর্খেরা সব কিছুকে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। তিনি ছিলেন জগতের শিক্ষণীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার, তা বাদ দিয়ে অনাবশ্যক বিষয়ের ওপর অনর্থক জোর দেওয়া কেন! অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথা অনাবশ্যক বিষয় ছাড়া আর কী! ওসব দিয়ে তো কিছুই প্রমাণ হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মা কিংবা অমরত্ব প্রভৃতির সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কী সম্বন্ধ?… শ্রীরামকৃষ্ণর বাণী প্রচার কর। যে পাত্র থেকে তোমার তৃষ্ণা তৃপ্ত হয়েছে তা অন্যকে দাও। ভক্তি প্রচার কর। অধিবিদ্যার অসারতায় নিজের মস্তিষ্ক বিচলিত হতে দিও না এবং আপন গোঁড়ামি দিয়ে অপরকে বিরক্ত বিব্রত কোরো না।…

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩০]

ইউ. এস. এ.
২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

কল্যাণীয় স্নেহের আলাসিংগা,

…(শুনছি) মিশনারীদের কাগজে কাগজে আমার উল্লেখ মাত্রই গালাগালি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ওসব দেখবার আমার কোনো বাসনা নেই। ভারতে তৈরী

ওরকম কোনো জিনিস যদি তুমি পাঠাও তবে তা আমি আবর্জনার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দেব। আমাদের কাজের স্বার্থে একটু আলোড়ন প্রয়োজন। কথাবর্তা যথেষ্ট শোনা হয়েছে। আমার সম্পর্কে লোকে ভালো মন্দ যাই বলুক না কেন, একেবারেই কান দিও না। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও, আর সর্বদা মনে রাখবে গীতার সেই বাণী: "যে ভালো করার চেষ্টা করে অশুভ কখনো তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।"

প্রতিদিনই লোকে আমার মূল্য বুঝছে। আর শুধু তোমাকে জানাই, এখানে আমি যে প্রভাব সৃষ্টি করেছি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। সব কিছুরই অগ্রসর হওয়া উচিত ধীরে সুস্থে।...তোমাকে আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, সংবাদ-পত্রের নিন্দা প্রশংসাকে আমি গ্রাহ্য করি না। তাদের স্থান দিই অগ্নিতে। তুমিও তাই কোরো। সংবাদপত্রের বাজে কথায় বা সমালোচনায় একেবারে মন দিও না। একনিষ্ঠ হয়ে নিজের কাজ করে যাও। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই।...

মিশনারীরা যে অপব্যাখ্যা করবে সে তোমার মনোযোগের যোগ্য নয়।...তাদের খণ্ডন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল অখণ্ড নীরবতা। আমি চাই তুমি তাই করবে।...মিঃ সুব্রাহ্মণ্য আয়ারকে তোমাদের সোসাইটির সভাপতি করো। আমার জানা সব থেকে একনিষ্ঠ এবং মহত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর মধ্যে ধীশক্তি এবং হৃদয়-ভাবের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে। আমার ওপর খুব বেশী নির্ভর না করে প্রবলভাবে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও; নিজেদের ক্ষমতার ওপর ভরসা নিয়েই কাজ করতে থাকো।...আমার কথা যদি বল, আমি জানি না কবে ফিরে যাব। আমি তো এখানে—এবং ভারতেও বটে—কাজ করছিই।...

তোমাদের সবাইকে আমার ভালোবাসা
আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩১]

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
চিকাগো, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিংগা,

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম।...আমার পাঠানো টুকিটাকি অংশগুলো তোমাকে ছাপাতে বলে ভুল করেছি। আমার যে সব সাংঘাতিক ভুল হয় এ তারই একটি। এক মুহূর্তের দুর্বলতাই ওতে ধরা পড়ে। দুই তিন বছর ধরে বক্তৃতা করে গেলে এই দেশে টাকা তোলা যায়। কিছু কিছু চেষ্টা আমি করেছি, এখানে লোকে আমার কাজের মূল্যও স্বীকার করে; কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অরুচিকর, এবং তা মনোভঙ্গেরও কারণ বটে।...

ভারতীয় সংবাদপত্র এবং তাদের সমালোচনা বিষয়ে তুমি যা লিখেছ পড়লাম; এই তো স্বাভাবিক। দাসত্বে-পীড়িত প্রতিটি জাতিরই প্রধান পাপ হল ঈর্ষাপরায়ণতা। ঈর্ষাবোধ এবং ঐক্যের অভাবের ফলেই দাসত্ব আসে এবং কায়েম হয়। ভারত থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তুমি এই সত্য অনুভব করতে পারবে না। পশ্চিম-দেশীয়দের সাফল্যের রহস্য আছে তাদের সম্মিলিত হওয়ার মধ্যে, যার ভিত্তি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যে জাতি বেশী দুর্বল এবং বেশী ভীরু তার মধ্যেই ঐ পাপটাও বেশী করে দেখা যায়। দেখ বৎস, দাসত্বে বদ্ধ জাতির কাছ থেকে কোনো কিছুই আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা অবশ্যই অতি গুরুতর, কিন্তু তোমাদের সকলের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরাও দরকার। এই মৃত জড়পিণ্ডে কি তুমি প্রাণ সঞ্চার করতে পার?—সমস্ত নৈতিক অনুপ্রেরণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেতনাহীন, সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে নিস্পন্দ এই জড়পিণ্ড,—পার তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে? যে মৃত জড়পিণ্ড উপকার-ইচ্ছুর ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়তে সর্বদাই প্রস্তুত তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পার কি? অতি চঞ্চল ও অবাধ্য শিশুর গলায় ওষুধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করেন যে চিকিৎসক তুমি কি তার মতো অবস্থান গ্রহণ করতে পার?…একজন আমেরিকান কিংবা ইউরোপীয়ান বিদেশে বিভূঁয়ে তার নিজ দেশবাসীকে সর্বদাই সাহায্য করে।…তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "তোমার অধিকার শুধু কর্মে, তার ফলের উপর নয়।" পাহাড়ের মতো দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। সত্যের জয় হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ নিজেদের প্রতি সত্য হোক, তখন আর সব ঠিক হয়ে যাবে। ফলশ্রুতি দেখতে হয়ত আমরা বেঁচে থাকব না, কিন্তু তা আগে হোক পরে হোক আসবেই তা নিশ্চিত। ভারতের এখন প্রয়োজন এক নতুন বৈদ্যুতিক আগুন যা জাতির শিরায় শিরায় সচেতন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে। এই কাজ ধীরগতি হতে বাধ্য, বরাবরই তাই হয়েছে। কাজ করে তৃপ্ত হও, সর্বোপরি নিজের প্রতি সত্য হও। খাঁটি হও, দৃঢ় হও, আর সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ হও, দেখবে সব ঠিক হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য যদি দেখে থাক তবে তা হল: তারা মনে প্রাণে একনিষ্ঠ। আমি যদি এরকম একশতটি মানুষ গড়ে তুলে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলেই জানব আমার কর্ম সাধিত হয়েছে, তখন আমি পূর্ণ তৃপ্তিতে মরতে পারব। প্রভুই সব জানেন। অজ্ঞ লোকেরা বাজে কথা বলুক। আমরা সাহায্য প্রার্থনাও করি না তা পরিহারও করি না—আমরা সর্বোন্নত মহত্তমের সেবক। ক্ষুদ্র মানুষের তুচ্ছ চেষ্টা যেন আমাদের নজরেও না পড়ে। এগিয়ে চলো! যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে তবেই চরিত্র নির্মাণ হয়। নিরুদ্যম হয়ো না। সত্যের একটি শব্দও নষ্ট হবার নয়; যুগের পর যুগ ধরে তা আবর্জনার আড়ালে থাকতে পারে, কিন্তু আজ হোক কাল হোক তার প্রকাশ হবেই। সত্য ধ্বংসাতীত, সৎগুণের বিনাশ নেই, শুদ্ধতা ধ্বংসের অসাধ্য। আমাকে একটি খাঁটি মানুষ দাও; অসংখ্য কনভার্ট আমার চাই না। বৎস, দৃঢ় থাকো! কারও সাহায্যের জন্য ব্যগ্র হয়ো না। সকল মানুষের সকল সাহায্য অপেক্ষাও কি ঈশ্বর অনন্ত পরিমাণ মহত্তর নন? পবিত্র হও—ভগবানে বিশ্বাস রাখো, তাঁর উপরই সর্বদা নির্ভর করো, তাহলেই তুমি ঠিক পথে থাকবে, কোনো কিছুই তোমাকে কাবু করতে পারবে না।…

এসো আমরা প্রার্থনা করি, "পথ দেখাও, ওগো দয়ার আলো"—দেখবে অন্ধকার ভেদ করে আলোর রশ্মি আবির্ভূত হবে, একখানা বাহু প্রসারিত হবে, আমাদের হাত ধরে চালিয়ে নেবার জন্য। তোমার জন্য আমি সর্বদা প্রার্থনা করি, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কোরো। এসো প্রত্যেকে আমরা ভারতের কোটি কোটি পদানত মানুষের জন্য দিনে রাতে প্রার্থনা করি—যারা দরিদ্র, পুরোহিততন্ত্র এবং অত্যাচারে জর্জরিত—এসো দিনে রাত্রে তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। ধনী ও উচ্চস্তরের মানুষের অপেক্ষা এদের মধ্যে ধর্ম প্রচারকে আমি শ্রেয় মনে করি। আমি অধি-বিদ্যাবিদ নই, নই দার্শনিক, আমি মুনিঋষি নই। আমি দীন, দরিদ্রদের আমি ভালোবাসি। এদেশে কাদের দরিদ্র বলা হয় তা দেখছি, দেখছি তাদের জন্য ভাবে কত বিপুল সংখ্যক মানুষ! আর ভাবছি ভারতের সঙ্গে কত বিরাট পার্থক্য! কুড়ি কোটি দরিদ্র ও অজ্ঞতা-পীড়িত নরনারীর জন্য সেখানে কেই বা ভাবে? সমাধান কোথায়? কে ভাবে তাদের জন্য? তারা তো শিক্ষার আলোক পায় না। কে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে আলোক? দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে কে তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেবে? এই মানুষেরাই হোক তোমার ভগবান—তাদের কথা ভাববে, তাদের জন্য কাজ করবে। অবিরাম তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো। ঈশ্বর তোমায় পথ দেখাবেন। দরিদ্রের জন্য যাঁর হৃদয় রক্তাক্ত হয় তাঁকেই বলি মহাত্মা, আর তার অন্যথা হলে বলি দুরাত্মা। দরিদ্রের নিরন্তর কল্যাণ কামনায় এসো আমরা মনে প্রাণে এক হই। কোনো সাফল্য অর্জন না করেই অজ্ঞাত আমরা মরে যেতে পারি, কেউ হয়ত আমাদের জন্য করুণা বোধ করবে না, একটুও শোক প্রকাশ করবে না—কিন্তু তবু আমাদের প্রার্থনার একটুও বৃথা যাবে না। ফল ফলবেই, আশু হোক বা বিলম্বিত হোক। আমার হৃদয় এত ভারাক্রান্ত যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না; তুমি তা বুঝবে কারণ তুমি জান। যতদিন কোটি কোটি লোক বুভুক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে বাস করবে ততদিন প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বলব বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী, কারণ এই দরিদ্র সাধারণের স্বার্থের বিনিময়েই এরা প্রত্যেকে লেখাপড়া শিখেছে, অথচ তাদের প্রতি কারও বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেবার অবকাশ নেই! দরিদ্র মানুষদের পিষ্ট করে যারা সব অর্থ সম্পদ অর্জন করেছে এবং সেই সুবাদে যারা বেশভূষার পারিপাট্যে গর্ব করে বেড়ায় তাদের আমি জঘন্য আখ্যা দেব; বিশ কোটি যে মানুষ আজ নিতান্ত ক্ষুধার্ত বর্বর ছাড়া কিছু নয় তাদের জন্য এই সব লোক যতদিন কিছু করবে ততদিন তাদের অন্য কোনো আখ্যা দেওয়া চলে না। ভাই সব, আমরা দরিদ্র, আমরা তুচ্ছ নগণ্য, কিন্তু সর্বোত্তমের হাতে সর্বকালে এই রকম নগণ্যরাই তো হাতিয়ার হয়ে এসেছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

অজস্র ভালোবাসা সহ

বিবেকানন্দ

[৩২]

ইউ. এস. এ.
১৮৯৪

প্রিয় ধর্মপাল,

তোমার কলকাতার ঠিকানা ভুলে গেছি। তাই চিঠিখানা মঠে পাঠালাম। কলকাতায় তোমার বক্তৃতার বিবরণ শুনেছি; শুনেছি তার কী চমৎকার ফল হয়েছে। এখানে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনারী আমাকে ভ্রাতা সম্বোধন করে এক পত্র দেন, তারপর আমার সংক্ষিপ্ত জবাবটি প্রকাশ্যে ছাপিয়ে এখন নিজেকে খুব জাহির করে নিয়েছেন। কিন্তু তুমি তো জান এখানে এরকম লোকদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা হয়। অধিকন্তু সেই একই মিশনারী আমার কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলেছেন তাঁরা যেন আমাকে খাতির না করেন। সকলের কাছ থেকেই অবশ্য তাঁর লাভ হয়েছে অবজ্ঞা। লোকটির ব্যবহারে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি; একজন ধর্ম প্রচারক হয়ে তাঁর এ কী গোপন আচরণ! দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতি দেশে এবং প্রতি ধর্মের লোকের মধ্যে এ রকম বিসদৃশ ব্যাপার দেখা যায়। গত বছর শীতকালে আবহাওয়ার প্রচণ্ড দাপট সত্ত্বেও এই দেশে আমি প্রচুর ঘুরেছি। ভেবেছিলাম ব্যাপারটা খুবই ভয়াবহ হবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ফ্রী রিলিজিয়াস সোসাইটির সভাপতি কর্নেল নেগেনসনের কথা তোমার মনে আছে। তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে তোমার খোঁজ খবর নেন। অক্সফোর্ডের (ইংল্যাণ্ড) ডাঃ কার্পেনটারের সঙ্গে সেদিন দেখা হল। প্লিমথে বৌদ্ধ ধর্মের নীতিবোধ বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করলেন। খুবই সহানুভূতিশীল এবং সারগর্ভ ভাষণ। তিনি তোমার সম্পর্কে এবং তোমাদের কাগজ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। আশা করি তোমার মহৎ কাজ সাফল্য লাভ করবে। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তুমি তাঁর যোগ্য সেবক।

...ভারতে যে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মমত প্রচার করা হয়, দেখা যাচ্ছে এখানকার চাইতে তা পৃথক। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে ধর্মপাল যে, এদেশে এপিস কোপান চার্চ এবং এমন কি প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চেরও যাজকদের মধ্যেও আমার এমন অনেক বন্ধু আছেন যারা তোমাদেরই ন্যায় সমান উদারচেতা, একনিষ্ঠ এবং প্রশস্তমনা। প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানুষ সর্বত্রই উদারচেতা হয়ে থাকেন। তাঁর প্রেম তাকে ঐরূপ হতে অনুপ্রাণিত করে। যাদের কাছে ধর্ম একটি ব্যবসায় তারা বিশ্বের প্রতিযোগী, সংঘর্ষমূলক ও স্বার্থপর ধর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাধ্য হয় সঙ্কীর্ণমনা এবং অমঙ্গলের আধার হতে।

চির ভ্রাতৃপ্রেম বদ্ধ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৩]

ইউ. এস. এ.
১৮৯৪

প্রিয় আলাসিংগা,

একটি পুরোনো গল্প শোনো। এক অলস ভবঘুরে পথ দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেল এক বৃদ্ধ তার ঘরের দাওয়ায় বসে আছে; একটা কোন জায়গার নাম করে সে বৃদ্ধর কাছে জানতে চাইল তা কোথায়। প্রশ্ন করলে, "অমুক গ্রামটা কতদূর?" বৃদ্ধ নীরব। বার কয়েক লোকটি একই প্রশ্ন করেও বৃদ্ধর কাছ থেকে কোনো জবাব পেল না। তাতে বিরক্ত হয়ে পথচারী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হল, বৃদ্ধ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ঐ গ্রাম এখান থেকে এক মাইল দূরে।" ভবঘুরে বলল, "কী! আগে কেন বলেন নি?" বৃদ্ধ বললে, "কারণ চলে যাবার ব্যাপারে আগে তোমাকে খুবই অনিশ্চিত দেখাচ্ছিল, তুমি ইতস্তত করছিলে। কিন্তু এখন তুমি সাগ্রহে রওয়ানা দিয়েছ; এখন তোমার অধিকার হয়েছে প্রশ্নের জবাব পাবার।"

গল্পটি মনে রাখবে, বৎস? কাজে লাগো, দেখবে আর সব ঠিক হয়ে যাবে। "অন্য সব কিছু ছেড়ে যে আমার ওপর আস্থা স্থাপন করে, নির্ভর করে আমার ওপর, তাকে আমিই তার প্রয়োজনের সব কিছু সরবরাহ করি।" (গীতা, IX ২২)। এ নিতান্ত স্বপ্ন নয়।

…উপস্থিত কাজের ধারা হওয়া উচিত প্রচার করা এবং উপাসনা করা। একটি জায়গা বেছে নাও, যেখানে প্রতি সপ্তাহে তোমরা মিলিত হতে পারো; সেখানে উপাসনা করবে এবং টীকা ও ব্যাখ্যা সহ উপনিষদ পাঠ করবে। এই ভাবে ধীরে সুস্থে কাজ করে যাও এবং শিক্ষাও লাভ করতে থাক। চাকায় কাঁধ লাগাতে পারলে দেখবে সব কিছুই আসবে তোমার কাছে।…

অতএব কাজে চলো। জি. জি.-র একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতি, তোমার আছে ভারসাম্য বোধ, দুজনে তাই একত্রে কাজ করো। কাজে ডুবে যাও; এই তো সবে আরম্ভ। প্রত্যেক জাতিরই আপনাকে বাঁচাতে হবে; হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করা অর্থ তহবিলের উপর নির্ভর করলে চলবে না, সে এক মহা ভ্রান্তি। একটি কেন্দ্র লাভ করা খুব বিরাট ব্যাপার; মাদ্রাজের ন্যায় বড় শহরে ও রকম একটি কেন্দ্র যোগাড় করতে চেষ্টা কর, তারপর চতুর্দিকে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করতে থাক। কাজ আরম্ভ কর ধীরে ধীরে। প্রথম সূত্রপাত কর কয়েকজন অপেশাদার মিশনারী দিয়ে; ক্রমে ক্রমে অন্যান্যরা আসবে, তারা তাদের সমস্ত জীবন নিয়োজিত করবে কাজে। শাসক হয়ে উঠবার চেষ্টা কোরো না। যে ভালো সেবা করতে পারে সেই হয়ে উঠতে পারে শ্রেষ্ঠ শাসক। আমৃত্যু সত্যের প্রতি অবিচল থাকো। আমরা চাই কাজ—আমরা বিত্ত, নাম ও খ্যাতি যাচ্ঞা করি না।…সাহসী হও।…মাদ্রাজের লোকদের এই কাজে তহবিল সংগ্রহে আগ্রহান্বিত করে তুলতে চেষ্টা কর, তারপর আরম্ভ করে দাও।…সম্পূর্ণ স্বার্থলেশ শূন্য হও, তাহলেই সাফল্যলাভ

নিশ্চিত হবে।…কাজের স্বাধীনতা না খুইয়েও ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সম্মান দেখাবে। কাজ করবে একসূত্রে গাথা হয়ে।…কার্য সম্পাদন করবার জন্য দরকার হলে আমার ছেলেরা আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত থাকবে। এবার কাজ কর, কাজ করতেই থাক! পরে একসময় একটু থেমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যাবে। ধৈর্য অবলম্বন কর, অধ্যবসায়ী হও, এবং শুদ্ধ থাক!

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এখনই আমি কোনো বই লিখছি না। শুধু খণ্ড খণ্ড চিন্তার অংশ নোট করে রাখছি। জানি না এসব কোনোদিন প্রকাশ করব কিনা। আর বইপত্রে কী-ই-বা আছে? পৃথিবী ইতিপূর্বেই বহু অর্থহীন বিষয়ে ভরতি হয়ে আছে। বেদান্তর লাইনে যদি একখানা ম্যাগাজিন বার করতে পার তবে বরং কাজ এগুতে পারে। প্রত্যয়সিদ্ধ হও; অন্যের সমালোচনা কোরো না। তোমার বক্তব্য প্রচার কর, যা শেখানোর আছে তা শেখাও, তারপর ক্ষান্ত হও। বাকী সব ভগবানই জানেন।…

আর কোনো সংবাদপত্র আমাকে পাঠিয়ো না, আমার সম্পর্কে মিশনারীদের সমালোচনা আমি লক্ষ্যও করি না, আর সেই কারণে এখানে সাধারণের মধ্যে আমার সম্পর্কে ধারণাটা উৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।

…যদি তোমরা আমার সন্তান হয়ে থাক তবে অকুতোভয় হও, কিছুতেই যেন তোমাদের থামাতে না পারে। আমরা হব সিংহের ন্যায়। ভারতকে এবং সারা বিশ্বকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। কাপুরুষতার কোনো স্থান নেই। আমি 'না' শুনব না। বুঝতে পারছ? আমৃত্যু সত্যের প্রতি একাগ্র থাকবে।…তার গূঢ় রহস্য হল গুরু ভক্তি—মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর প্রতি আস্থা! তোমার কি তা আছে? আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি তোমার তা আছে; তুমি জান তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে—অতএব কাজে লেগে যাও। তোমাকে সাফল্য লাভ করতেই হবে। প্রতি পদক্ষেপে আমার আশীর্বাদ এবং প্রার্থনা তোমাকে অনুসরণ করবে। এক হয়ে কাজ কর। ধৈর্য নিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে চলবে। প্রত্যেকের প্রতিই রয়েছে আমার ভালোবাসা। আমি তোমাদের উপর লক্ষ্য রাখছি। এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! এই শুধু আরম্ভ। জানো কি এখানে আমার সামান্য কাজও ভারতে প্রবল প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তোলে? অতএব তড়িঘড়ি দেশে ফিরে যাব না। আমার ইচ্ছা এখানে স্থায়ী একটা কিছু করি, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি দিনে দিনে কাজ করে যাচ্ছি। প্রতিদিনই আমি আমেরিকান জনগণের আস্থা অর্জন করে চলেছি।… তোমার হৃদয়কে প্রসারিত কর, আশা বিস্তার কর বিশ্বের বিস্তারের ন্যায়। সংস্কৃত চর্চা কর, বিশেষ করে বেদান্তর তিন ভাষ্য অধ্যয়ন কর। তৈরী হও, ভবিষ্যতের জন্য আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। আকর্ষণীয় বক্তৃতা করতে শেখ। মানুষকে আলোড়িত করে তোল। যদি বিশ্বাস থাকে তবে সব কিছুই তোমার হবে। কিডিকে, এবং ওখানে আমার সব সন্তানকে এই সব কথা বোলো। যথা সময়ে তারা মহৎ কাজ করবে, আর তাদের কাজে বিস্ময় মানবে সারা বিশ্ব। ভরসা করে কাজ কর। কিছু একটা করে আমাকে দেখাও। দেখাও একটি মন্দির, একটি

ছাপাখানা, একখানা কাগজ, আমার জন্য একটি নিকেতন। মাদ্রাজে যদি আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করতে না পার তবে এসে থাকব কোথায়? লোককে সচকিত করে তোল। তহবিল সংগ্রহ কর আর মত প্রচার করে যাও। আপন উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্র থাক। এ পর্যন্ত তোমার প্রতিশ্রুতি আশাপ্রদ, অতএব কাজ করে চল, ক্রমান্বয়ে অধিকতর ফল লাভ করতে থাক।

…লোকের সঙ্গে বিবাদ কোরো না। কাউকে বৈরীভাবাপন্ন কোরো না। জ্যাক বা জন ক্রিশ্চিয়ান হলে আমাদের তাতে কিসের মাথা ব্যথা? তারা তাদের সুবিধা মত যে কোনো ধর্মের অনুসরণ করুক। বিতর্কিত বিষয়ে তুমি কেন জড়িয়ে পড়বে? প্রত্যেকেরই মতামত সম্পর্কে সহিষ্ণু হও। ধৈর্য, শুদ্ধ মন এবং অধ্যবসায়ের জয় হবেই।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৪]

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ
চিকাগো
৩ জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

গত রবিবারে ব্রুকলিনে লেকচার দিলাম, যেদিন এলাম সেই সন্ধ্যায়ই মিসেস হিগিন্স একটি ছোট রিসেপশন দিয়েছেন; এথিক্যাল সোসাইটির ডাঃ জেমস সমেত কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের কারও কারও মতে এই রকম প্রাচ্য দেশীয় ধর্মীয় বিষয়ে ব্রুকলিনের লোকদের তেমন আগ্রহ থাকবে না।

কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে বক্তৃতাটি প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে। ব্রুকলিন সমাজের যারা মধ্যমণি এমন ৮০০ নরনারী উপস্থিত ছিলেন; যারা বলেছিলেন এসব ব্যাপারে তেমন সাফল্যের সম্ভাবনা নেই, সেই ভদ্রমহোদয়গণই ব্রুকলিনের এক বক্তৃতামালার আয়োজনে লেগে গেছেন। নিউ ইয়র্ক কোর্সও প্রায় তৈরী, কিন্তু মিসেস থার্সবি নিউ ইয়র্কে না আসা পর্যন্ত আমি দিন তারিখ স্থির করছি না। মিসেস থার্সবি যদি নিউ ইয়র্কে কিছু একটা করতে চান তাহলে মিস ফিলিপস তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন; মিস ফিলিপস মিসেস থার্সবির বান্ধবী, তিনিই নিউ ইয়র্কে আমার বক্তৃতার আয়োজন করছেন।

হ্যালে পরিবারের কাছে আমার অশেষ ঋণ; নববর্ষে তাদের ওখানে হঠাৎ হাজির হয়ে সবাইকে অবাক করে দেব ভেবেছি। এখানে আমি একটি নতুন গাউন সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। পুরানো গাউনটিও আছে, কিন্তু ধুতে ধুতে তা এমন আঁটো হয়ে গেছে যে তা পরে আর বাইরে বেরুনো যায় না। চিকাগোয় ঠিক জিনিসটি পাব বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে।

আশা করি ইতিমধ্যে আপনার পিতা ভালো হয়ে গেছেন।

মিস ফার্মার, মিঃ ও মিসেস গিবনস এবং 'হোলি ফ্যামিলী'র অন্যান্য সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাবেন।

চির স্নেহবদ্ধ আপনাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

ব্রুকলিনে মিস কোরিং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বরাবরের মতোই সহৃদয়া। তাকে চিঠিপত্র দিলে আমার ভালোবাসা জানাবেন।

বি

[৩৫]

জি. জি. নরসিংহাচারিয়ারকে লেখা]

চিকাগো
১১ জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় জি. জি.,

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম।...অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের ওপরে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়েই 'পার্লিয়ামেণ্ট অব রিলিজিয়নস'-এর আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মের দর্শন তার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পেরেছে। ডাঃ বারোজ এবং তার গোষ্ঠীর অন্যান্যরা অত্যন্ত গোঁড়া, আমি তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হব না।...এদেশে ভগবান আমাকে অনেক বন্ধুবান্ধব দিয়েছেন, এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। যারা আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছে ভগবান তাদেরও কল্যাণ করুন!...এ যাবৎ কেবল বোস্টন আর নিউ ইয়র্কের মধ্যে ছুটোছুটি করেছি; এ দেশের দুইটি বৃহৎ কেন্দ্র এই দুই নগর, তার মধ্যে বোস্টনকে বলা যায় মস্তিষ্ক আর নিউ ইয়র্ককে অর্থ ভাণ্ডার। উভয় ক্ষেত্রেই আমার সাফল্য অনন্য সাধারণ। সংবাদ-পত্রের রিপোর্ট সম্পর্কে আমি একেবারেই উদাসীন, কোনো খবরের কাগজ তোমাকে পাঠাব এমন আশা কোরো না। কাজ সুরু করার জন্য একটু প্রচার প্রয়োজন ছিল। তা আমাদের হয়েছে, অতিরিক্তই হয়েছে।

মনি আয়ারকে লিখেছি, তোমাকেও ইতিপূর্বেই নির্দেশ দিয়েছি। এখন আমাকে দেখাও তুমি কী করতে পার। এখন আর কোনো বাচালতা নয়, এখন যথার্থ কাজ; কাজের দ্বারাই হিন্দুদের বক্তব্য সপ্রমাণ করতে হবে; তা যদি না পারে তাহলে কিছুই তাদের প্রাপ্য হবে না; এইটিই সার কথা। তোমাদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য আমেরিকা টাকা দেবে না। কেনই বা দেবে? আমার কথা যদি বল আমি সত্য শিক্ষা দিতে চাই; তা এখানেই হোক বা অন্যত্র হোক সেটি ধর্তব্য নয়।

তোমার বা আমার পক্ষে বা বিপক্ষে লোকে যা-ই বলুক না কেন ভবিষ্যতে আর কখনো ওসবে গ্রাহ্য কোরো না। কাজ করে যাও, সিংহের মতো হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। মরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি অবিশ্রান্ত কাজ করে যাব, এমন কি মৃত্যুর পরেও আমি বিশ্বের কল্যাণে কাজ করব। অসত্যের চেয়ে তার মূল্য অনেক অনেক বেশী, যেমন বেশী মূল্যবান ধার্মিকতা। তোমার যদি এসব গুণ থাকে তবে শুধু গুরুত্বের শক্তিতেই পথ করে দেবে।

থিয়সফিস্টদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। জজ সাহেব আমায় সাহায্য করবেন! পুঃ! হাজার হাজার মহৎ লোক আমার কথা ভাবে, চিন্তা করে; তুমি সেকথা জান, এখন ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখ। এই দেশে ধীরে ধীরে আমি এমন একটি প্রভাব সৃষ্টি করছি কাগজের প্রচার ক্ষমতার চেয়ে তা অনেক বড়। যারা গোঁড়া তারা এটা টের পায়, কিন্তু তাদের ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। এ হল চরিত্র বল, শুদ্ধতা এবং সত্যের পরিণতি—ব্যক্তিত্বের ফলশ্রুতি। যতক্ষণ আমার এই সব গুণ থাকবে ততক্ষণ নিশ্চিন্তে থাকতে পার। কেউ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। যদি চেষ্টাও করে তবু তারা ব্যর্থ হবে—এইটিই ভগবানের বিধান।…বই আর তত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে। লোক সাধারণের হৃদয়কে আলোড়িত করার একমাত্র এবং সর্বোন্নত উপায় হল জীবন আচরণের উদাহরণ; তার দ্বারাই ব্যক্তিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।…ঈশ্বর আমাকে প্রতিদিন গভীর থেকে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দান করছেন। কাজ, কাজ আর কাজ কর।…বাচালতা ক্ষান্ত হোক; কেবল ভগবানের কথা বল। জীবন ক্ষণস্থায়ী পাগল আর প্রতারকের সম্পর্কে আলোচনা করে তা অপচয় করা যায় না।

সব সময় মনে রেখো প্রত্যেক জাতিরই উচিত নিজেকে নিজে রক্ষা করা; প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রেও তাই; সাহায্যের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ো না। এখানে কঠোর পরিশ্রম করে তোমাদের কাজের জন্য কিছু টাকা আমি পাঠাতে পারব; তার বেশী নয়। কিন্তু যদি তারই জন্য তোমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয় তাহলে বরং কাজ বন্ধ করে দাও। একথাও জেনে রাখ যে, আমার আইডিয়ার পক্ষে এটি একটি চমৎকার ক্ষেত্র, এরা হিন্দু না মহমেডান না কি ক্রিশ্চিয়ান তা আমি দেখব না, যারা প্রভুকে ভালোবাসে তারাই আমার সেবার অধিকারী।

…আমি শান্তচিত্তে নীরবে কাজ করতে পছন্দ করি, আর প্রভু তো সর্বদাই আমার সঙ্গে রয়েছেন। যদি ইচ্ছে হয় আমাকে অনুসরণ কর; তার জন্য হতে হবে অতি একনিষ্ঠ, সম্পূর্ণ স্বার্থ লেশশূন্য, এবং সর্বোপরি একান্ত শুদ্ধচিত্ত। তোমার জন্য রয়েছে আমার আশীর্বাদ। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সৌজন্য বিনিময়ের সময় নেই। সংগ্রাম সমাপ্ত হলে পরে আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি এবং মনের সাধে পরস্পরকে সৌজন্য জানাতে পারি। কিন্তু এখন কোনো কথা নয়, এখন শুধু কাজ, কাজ আর কাজ! ভারতে স্থায়ী কিছু করতে পেরেছ দেখছি না, দেখছি না তো যে কোনো একটি কেন্দ্র তোমরা গড়ে তুলতে পেরেছ, কোনো মন্দির বা হল নির্মাণ করেছ বলেও তো কিছু দেখছি না—কেউ তোমাদের সঙ্গে এসে হাত মেলাচ্ছে তেমনও কিছু

দেখছি না। বড্ড বেশী কথা হচ্ছে, শুধু কথা কথা আর কথা! আমরা কত বড়, আমরা কত মহান! বাজে কথা! আমরা কতগুলি জড়বুদ্ধি লোক, আর কিছু নই! এই যে নাম যশের জন্য লালায়িত হওয়া, এই যে সব দমবাজি—এসবে আমার কি? ওসব ব্যাপার নিয়ে আমি কী কেয়ার করি? আমি বরং দেখতে চাই শত শত লোক প্রভুর কাছে আসছে। কোথায় তারা? তাদের আমি চাই, আমি তাদের দেখতে চাই। তোমারই তাদের খুঁজে বার করতে হবে। তোমরা আমাকে কেবল নাম দিচ্ছ খ্যাতি দিচ্ছ। নাম যশ যথেষ্ট হয়েছে, এখন কাজ চাই, সাহসী পুরুষেরা শুধু চাই কাজ! তোমাদের মধ্যে এখনো আমার অগ্নি সঞ্চারিত হয় নি; তোমরা আমাকে বুঝতে পার না! তোমরা কেবল ঢিলেমি আর আমোদ প্রমোদের পুরাতন পথ-রেখায় ছুটে বেড়াও। এখনই কিংবা এরপর সব ঢিলেমি নিপাত যাক, নিপাত যাক সব আমোদ প্রমোদ। আগুনে ঝাঁপ দাও, মানুষদের প্রভুর পানে নিয়ে এসো।

তোমাদের যেন আমার আগুনের ছোঁয়া লাগে, তোমরা যেন অত্যান্তিক একনিষ্ঠতায় সিদ্ধ হও, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা যেন বীরের মৃত্যু বরণ করতে পার—একথা আমার সতত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

টম ডিক হ্যারী আমাদের পক্ষে কি বিপক্ষে কী বলল না বলল তাতে কোনে আমল দেবার দরকার নেই; সর্বশক্তি কাজে নিয়োজিত করতে হবে—একথা আলাসিংগাকে, কিডিকে, ডাঃ বালাজীকে এবং অন্যান্য সবাইকে বোলো।

বি

[৩৬]

ইউ. এস. এ.
১২ জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

দুঃখের কথা, তুমি এখনো আমাকে পুস্তিকা ও সংবাদপত্র পাঠিয়ে যাচ্ছ, অথচ তা না পাঠাতেই তোমাকে বেশ কয়েকবার বলেছি। ওসব পড়বার ও মনে রাখবার কোনো সময় নেই আমার। আর ওসব পাঠিও না। মিশনারীরা ও থিওসফিস্টরা আমার সম্পর্কে কী বলল তা নিয়ে আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। ওরা যা খুশী করুক। তাদের কথায় একটুও কর্ণপাত করলেই তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাছাড়া, তুমি ত জান, মিশনারীরা কখনো যুক্তিতর্কে যায় না, কেবল গালাগালি দেয়।

এবার শেষবারের মতো জেনে নাও, আমি নাম যশের গ্রাহ্য করি না, ওরকম কোনো দমবাজিতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত আমি আমার আইডিয়া প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় একটা কাজ করেছ;

কিন্তু তার ফল একটিই হয়েছে—তার ফলে আমার নাম এবং খ্যাতি প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বের প্রশংসা লাভের জন্য ব্যয় করার চেয়ে আমার জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। এই ধরনের আহাম্মুকির সময় আমার নেই। আইডিয়া প্রচারের ব্যাপারে এবং সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে ভারতে তোমরা কি করেছ? কিছুই করোনি, কিছুই না, কিছুমাত্র না।

হিন্দুদের পারস্পরিক সাহায্য ও শ্রদ্ধার মনোভাব শিক্ষা দিতে পারে এমন একটি সংস্থার প্রয়োজন অপরিহার্য। আমার এখানকার কাজের গুণাবধারণের জন্য কলকাতার সভায় পাঁচ হাজার এবং অন্যান্য স্থানে আরো শত শত লোক যোগ দিয়েছিল—বেশ, ভালো কথা! কিন্তু তাদের প্রত্যেককে যদি একটি আনা করে দিতে বলতে তা কি তারা দিত? সমগ্র জাতীয় চরিত্রটাই শিশুসুলভ পরনির্ভরতার চরিত্র। মুখে তুলে দিলে তারা সবাই খাবারটা উপভোগ করতে পারে, কেউ কেউ আবার তা গলায় ঠেলে দিলে খুশী হয়।···নিজেদের নিজেরা সাহায্য না করতে পারলে তোমরা বেঁচে থাকারই উপযুক্ত নও।···

জনসাধারণের শিক্ষার জন্য আমার যে পরিকল্পনা উপস্থিত আমি তা ত্যাগ করেছি। তা আসবে মাত্রাক্রমে। এখন আমি চাই একদল আগুনে মিশনারী। মাদ্রাজে আমাদের একটি কলেজ চাই, সেখানে শেখানো হবে নানাধর্মের তুলনামূলক বিচার, সংস্কৃত, বেদান্তর নানা ব্যাখ্যা এবং কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষা; আমাদের চাই একটি ছাপাখানা এবং ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় ছাপা কয়েকখানা পত্রিকা। এই কাজ কয়টি হলে আমি জানব তোমরা সত্যিই কিছু কর্ম সাফল্য অর্জন করেছ। জাতি প্রমাণ করুক যে সত্যি তারা কিছু করতে প্রস্তুত। এই ধরনের কিছু যদি ভারতে তোমরা না করতে পার, তাহলে আমাকে অব্যাহতি দাও। আমার একটি বক্তব্য প্রচার করার আছে, আমি বরং তা সেই সব লোকের মধ্যে প্রচার করি যারা এর মূল্য বুঝবে এবং যারা সেই অনুসারে কাজ করবে। কে তা গ্রহণ করল তা আমার দেখতে যাবার কি দরকার? "আমার পিতার অভিলাষ যে কার্যকর করবে" সে-ই আমার আপন জন।···

আমার নাম জাহির করার দরকার নেই। আমার আইডিয়া বাস্তবায়িত হোক আমি তাই চাই। সকল ধর্ম প্রবক্তারই শিষ্যমণ্ডলী তাদের গুরুকে আর গুরুর আইডিয়াকে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে ফেলেছিল, পরিণামে তারা গুরুর খাতিরে তাদের আইডিয়াকে হত্যা করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের ঐ রকম পরিণাম থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কাজ কর আইডিয়ার জন্য, ব্যক্তির জন্য নয়। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

আশীর্বাদসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৭]

(ধীরা মাতাকে লেখা)*

ব্রুকলিন
২০ জানুয়ারী, ১৮৯৫

...আমার একটি পূর্বাশঙ্কা এই ছিল যে আপনার পিতা প্রাচীন দেহ পরিত্যাগ করবেন ; এক রাশ বেতালা মায়া যখন কাউকে আঘাত করতে চলেছে বুঝি তখন আর তাকে পত্র দেওয়া আমার রীতি নয়। এই সকল ঘটনায় জীবনের মোড় ঘুরে যায়, আমি জানি এই ঘটনায় আপনি আদৌ বিচলিত হন নি। সমুদ্র পৃষ্ঠ একবার ওঠে একবার নামে, কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি--আলোকের সন্তান—প্রত্যেকবার নামবার সময় সমুদ্রের গভীরতাকেই আরো বেশী করে উপলব্ধি করেন, তার দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত হয় সমুদ্র তলদেশের মুক্তা ও প্রবালের স্তরসমূহ। আসা যাওয়ার সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মিথ্যা মোহ। আত্মার কখনো যাওয়া আসা নেই। যাবার জায়গাটা কোথায়? সমগ্র আকাশ তো আত্মায় বিধৃত! প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় কোথায়? সমগ্র কাল তো আত্মায় নিহিত!

ঘুরছে পৃথিবী, মোহ সৃষ্টি হয় বুঝিবা সূর্যই ঘুরছে ; সূর্য কিন্তু নড়ে না। তেমনি ঘুরে চলেছে প্রকৃতি বা মায়া, আবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, উন্মোচন করছে আবরণের পর আবরণ, এই মহা গ্রন্থের পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে—আর সব কিছু দেখছে আত্মা, দেখছে আর অপরিবর্তিত ও অবিচলিত থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে চলেছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব আত্মাই বর্তমান কালের, এবং বাস্তব উপমা টেনে বলা যায় সব আত্মাই একটি জ্যামিতিক পয়েন্টে স্থির হয়ে আছে। আত্মায় যেহেতু স্থান বা আকাশের আইডিয়া বিধৃত, সেই কারণে যা কিছু আমাদের ছিল তা আমাদেরই আছে এবং আমাদেরই থাকবে, তা আমাদের কাছে আছে এবং থাকবে যেমন ছিল আমাদের কাছে। আমরা তাদের মধ্যে নিহিত, তারা আমাদের মধ্যে। এই জীবকোষগুলির কথাই ধরুন। প্রত্যেকে আলাদা বটে, কিন্তু সবাই ABতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। সেখানে তারা মিলেমিশে এক। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র! কিন্তু AB অক্ষে তারা সবাই মিলে এক। অক্ষ থেকে কেউ বের হতে পারে না ; পরিধি রেখা যতই না কেন ভগ্ন বা ছিন্ন হোক, অক্ষে অবস্থান করে আমরা যে কোনো চেম্বারে প্রবেশ করতে পারি। এই অক্ষই ঈশ্বর। সেখানে আমরা তাঁর সঙ্গে একীভূত, সকলে মিলে একাকার, সবাই ভগবানে আশ্রিত।

চাঁদের মুখের ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে যায়, কিন্তু দেখে মনে হয় চাঁদই বুঝি ভেসে চলেছে। তেমনি ভেসে চলেছে প্রকৃতি, দেহ, বস্তু অথচ মনে হয় আত্মাই বুঝি ভেসে চলেছে। এমনি করে অবশেষে আমরা টের পাই, ছোট বড় প্রত্যেক জাতিরই মানুষ

*(মিসেস অলিবুলের পিতৃবিয়োগের পর স্বামীজী তাকে এই পত্রটি দেন ; মিসেস বুলকে তিনি ডাকতেন 'ধীরা মাতা' বলে।)

আপন প্রবৃত্তি (না কি প্রেরণা) বলে গতাসু ব্যক্তির নিকট উপস্থিতি যে অনুভব করে থাকে তা বুদ্ধিগ্রাহ্যতার দিক দিয়েও সত্য।

প্রতিটি আত্মা একটি নক্ষত্র, এই রকম সকল নক্ষত্র স্থাপিত রয়েছে অসীম চিরন্তন নীল আকাশে—ঈশ্বর বক্ষে। সেখানেই প্রত্যেকের এবং সকলের মূল বাস্তব, স্থিতি এবং প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য। আমাদের দিকচক্রবাল থেকে অপসৃত এইরূপ কোনো কোনো নক্ষত্র অন্বেষণ থেকেই ধর্মের সূত্রপাত; তারা সবাই ভগবানে লীন, আর আমাদেরও সবার আশ্রয় একই—এই জ্ঞানে তার (ধর্মের) পরিণতি। অতএব গূঢ় সত্যটি এই: আপনার পিতা তাঁর প্রাচীন পরিধেয় বাস বর্জন করেছেন, এবং নিরবধি কাল ধরে যেখানে ছিলেন এখন তিনি সেইখানেই স্থির হয়েছেন। তিনি কি এই বিশ্বে কিংবা অপর কোনো বিশ্বে এইরকম আর একখানি বস্ত্র পরিধান করবেন? যতদিন না পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে তিনি তা করতে পারছেন ততদিন যেন আদৌ তা না করেন এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। অতীত কর্মফলের অদৃশ্য শক্তি যেন কাউকে পৃথিবীতে আবার টেনে না আনে, এই আমার প্রার্থনা। আমি প্রার্থনা করি সকলে যেন মুক্ত হতে পারে, যেন জানতে পারে তারা মুক্ত। আর যদি তাদের আবার স্বপ্ন দেখতে হয় তবে তাদের স্বপ্ন যেন হয় শান্তি এবং স্বর্গসুখে পরিপূর্ণ।…

আপনাদের বিবেকানন্দ

[৩৮]

৫৪ ডব্লু, ৩৩নং স্ট্রীট
এন. ওয়াই
১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় বোন,

এই মাত্র তোমার সুন্দর চিঠিখানা পেলাম।…তা বুঝলে, কাজের জন্যই কাজ করতে, বাধ্য হলে, এমন কি আপন পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে না পেলেও, কখনো কখনো ব্যাপারটা বেশ একটি শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।…তোমার সমালোচনায় আমি আদৌ দুঃখিত নই, বরং খুব খুশী। সেদিন মিস থার্সবির ওখানে এক প্রেসবাইটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব উত্তেজিত তর্ক বিতর্ক হল; ভদ্রলোক যথারীতি রেগে অত্যন্ত গরম হয়ে গেলেন এবং শেষে গালাগালি দিতে লাগলেন। পরে অবশ্য আমি মিসেস বুলের কাছে এজন্য কঠোর তিরস্কার লাভ করেছি; তিনি বলেন, এই ধরনের ব্যাপারে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটে। তোমারও অভিমত তা-ই মনে হয়!

বিষয়টি নিয়ে এখনই লিখেছ বলে আমি খুশী, কেন না এ নিয়ে আমি খুব ভেবেছি। প্রথম কথা, ঐ সব নিয়ে আমি আদৌ দুঃখিত নই; এই কথায় হয়ত তুমি বিরক্ত হবে—হয়ত। পার্থিব সুখ সম্ভাবনার খাতিরে মাধুর্য কত কাম্য সে আমি বেশ জানি। আমি মধুর হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যখন

সত্যের সঙ্গে একটা ভয়ানক আপোসের আশঙ্কা দেখা দেয় তখন ক্ষান্ত হই। বিনম্র নম্রতায় আমার বিশ্বাস নেই। আমি বিশ্বাস করি সমদর্শীত্বে—সকলের সম্পর্কেই সমান মনোভাবে। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হল তার "দেবতা" অর্থাৎ সমাজের অনুজ্ঞা পালন করা। কিন্তু আলোকের সন্তানগণ কখনো তা করে না। এটি একটি চিরন্তন বিধি। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, সামাজিক মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, এবং সেই সুবাদে সমাজের কাছ থেকে সব ভালো জিনিস লাভ করে, —তার কাছে সমাজই হয় সব উপকারের আধার। অন্যজন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর ধীরে ধীরে সমাজকে তার নিজের কাছে টেনে আনে। যে খাপ খাওয়াতে জানে তার পথ হয় গোলাপে আস্তীর্ণ, যে জন তা জানে না তার পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু "জনমতের" পূজারীদের বিলোপ ঘটে একটি মুহূর্তে; সত্যের সন্তানগণ বেঁচে থাকে চিরকাল।

আমি সত্যের তুলনা করব অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষয়কারী কোনো পদার্থের সঙ্গে। যে কোনো জিনিসের ওপর তা পড়বে তাকেই সে পুড়িয়ে ক্ষয় করে করে চলবে—নরম পদার্থ হলে তা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে—শক্ত গ্র্যানাইট হলে আস্তে আস্তে, কিন্তু ক্ষয় হবেই। লিখন যা আছে তা আছেই। দুঃখিত বোন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত প্রতিটি জঘন্য মিথ্যার প্রতি আমি মধুর হতে পারব না, বা তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারব না। কিছুতেই পারব না। সারা জীবন তার জন্য ক্ষতি সয়েছি। কিন্তু তবু আমি তা পারব না। পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখেছি। কিন্তু না, পারব না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বর মহান। তিনি আমাকে ভণ্ড হতে দেবেন না। ভেতরে যা আছে এবার তা বেরিয়ে আসুক। এমন কোনো উপায় বার করতে পারিনি যাতে সবাইকে সন্তুষ্ট করা চলে; আমি ঠিক যা, তার থেকে তো অন্য কিছু হতে পারব না, আমি আমার নিজের প্রতি সত্য। "যৌবন ও অহঙ্কার লুপ্ত হয়, জীবন ও সম্পদ লোপ পায়, নাম ও যশ বিলুপ্ত হয়, এমন কি পর্বতও ধুলোয় গুড়িয়ে যায়। প্রেম ও বন্ধুত্বের বিলোপ ঘটে। স্থায়ী একমাত্র সত্য।" হে সত্যের দেবতা, তুমিই হও আমার পথ প্রদর্শক! আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন আর দুধ আর মধুতে 'পরিবর্তিত হতে পারব না। আমি যেমন আছি আমাকে তেমনই থাকতে দাও। "হে সন্ন্যাসী, সত্যের প্রতি অবিচল থাক, ভয়শূন্য হয়ে, দোকানদারি বাদ দিয়ে, শত্রু মিত্র পরোয়া না করে সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাক; এই মুহূর্তে এই বিশ্ব পরিত্যাগ কর, ত্যাগ কর পরবর্তী এবং আগামী সব বিশ্বকে, পরিহার কর পার্থিব ভোগসুখ এবং সব দর্প অহঙ্কার। সত্য, তুমিই হও আমার একমাত্র পথ প্রদর্শক।" ধনসম্পদ নাম যশ কিংবা ভোগসুখের কোনো এষণা আমার নেই বোন—ও সব আমার কাছে ধুলো মাত্র। আমি আমার গুরু-ভাইদের সাহায্য করতে চেয়েছি। প্রভুর ইচ্ছা—অর্থ উপার্জনের কায়দা কৌশল আমার জানা নেই। আমার চতুষ্পার্শে পৃথিবীর নানা খেয়ালের সঙ্গে আমার মানিয়ে চলার, এবং অন্তরের সত্য নির্দেশ না পালন করবার কোন কারণ আছে? কিন্তু বোন, মন এখনো দুর্বল, তাই মাঝে মাঝে তা নেহাৎ যান্ত্রিকভাবে পার্থিব সাহায্যকে

আঁকড়ে ধরে। আমি অবশ্য ভীত নই। আমার ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী ভয়ই সব থেকে বড় পাপ।

প্রেসবাইটেরিয়ান পাদ্রীর সঙ্গে আমার শেষ তর্কযুদ্ধের পর এবং অতঃপর মিসেস বুলের সঙ্গে লম্বা লড়াইয়ের পর সন্ন্যাসীর প্রতি মনুর অনুজ্ঞা স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি; সে অনুজ্ঞা হল: "একাকী জীবন যাপন কর, একলা পথ চল।" সমস্ত বন্ধুত্ব, সমস্ত প্রেম, সবই একটি সীমা মাত্র। এমন কোনো বন্ধুত্ব দেখা যায়নি, মেয়েদের বন্ধুত্বের যা আরো বেশী প্রযোজ্য, যা অতিরিক্ত দাবী করতে ছাড়ে। মহান মুনিঋষিগণ, আপনারা সত্যি কথাই বলে গেছেন। অন্য কারও ওপর নির্ভর করে কোনো মানুষ সত্যের দেবতার সেবা করতে পারে না। হে আমার আত্মা, স্থির হও, একাকী হও! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। জীবন তুচ্ছ! মৃত্যু একটা ভ্রান্তি! আর সবাই কিছু নয়, ভগবানই সব! হে আত্মা ভয় কোরো না! নিঃসঙ্গ হও। পথ দীর্ঘ বোন, সময় সংক্ষিপ্ত, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমাকে শীঘ্রই ঘরে ফিরতে হবে। আমার আচার আচরণে পালিস লাগাবার আর সময় নেই। আমার যে বক্তব্য আছে তা ঘোষণা করার সময় পাচ্ছি না। তুমি খুব ভালো, খুব দয়ালু তুমি, তোমার জন্য আমি সব কিছু করব; কিন্তু রাগ কোরো না, আমি দেখছি তোমরা সবাই নিতান্ত ছেলেমানুষ।

আর স্বপ্ন দেখো না! হে আমার হৃদয়, স্বপ্ন আর দেখো না! এক কথায়, আমার একটি বাণী দেবার আছে, বিশ্বের কাছে মিষ্ট হবার সময় আমার নেই, মধুর হবার যে কোনো চেষ্টা আমাকে ভণ্ড বানিয়ে তোলে। জেলি মাছের জীবন যাপন করার চেয়ে, নিজ দেশে বা পর দেশে রাজ্যের যত বাজে চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে আমি বরং হাজার মৃত্যু বরণ করব। মিসেস বুলের ন্যায় তুমিও যদি মনে করে থাক যে আমার একটা কাজ করার আছে তবে তুমি ভ্রান্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই সৌরমণ্ডলে কিংবা তাকে ছাড়িয়েও আমার কোনো কাজই নেই। আমার একটি বক্তব্য বলবার আছে, তা আমি বলব আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে। সে বক্তব্যকে আমি হিন্দুয়ানিতে বা খ্রীষ্টানিতে বা অন্য কোনো পোষাকে মুড়বো না। আমি তাকে আমার মতো করেই বলব, এই মাত্র। মুক্তিই আমার ধর্মের সব। তাকে খর্ব করার কোনো চেষ্টা হলে আমি তার সঙ্গে লড়াই করব, কিংবা তাকে এড়াবার জন্য পালিয়ে যাব। ছোঃ! পাদ্রীদের মন রাখার চেষ্টা করব আমি! আমার কথা ভুল বুঝো না বোন। কিন্তু তোমরা খুকী মাত্র, শিক্ষা গ্রহণের জন্য খুকীদের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। তুমি এখনো সেই ঝরণা থেকে জলপান করোনি যা "যুক্তিকে করে যুক্তিহীন, মরণশীলকে অমর করে, এই বিশ্বকে শূন্যে পরিণত করে, এবং মানুষকে দেবতা বানায়"। বিশ্ব নামক এই মূঢ়তার জাল থেকে যদি পার বেরিয়ে এসো। তাহলে তোমাকে বাস্তবিক সাহসী এবং মুক্ত বলব। নিজে যদি না পার তবে বাহবা দিও তাদের যারা সমাজরূপ এই মিথ্যা দেবতাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবার সাহস রাখে, যারা এই সমাজের চরম ভণ্ডামিকে পদদলিত করবার সাহস রাখে। যদি বাহবা না দিতে পার তাহলে দয়া

করে মুখ বন্ধ করো, আপোস করা বা মিষ্টি মিষ্টি কথাবার্তা ভাব প্রভৃতি কতগুলি অসার মিথ্যা দিয়ে তাদের আবার পঙ্কে টেনে নামিয়ো না।

আমি ঘৃণা করি এই দুনিয়াকে, এই কল্পনাকে, এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নকে; এই চার্চ আর এই প্রতারণা, এর বই আর বিশ্বাসঘাতকতা, তার সুন্দর মুখ আর মিথ্যা হৃদয়, ওপরে সোচ্চার ন্যায়পরায়ণতা আর ভেতরের শূন্যগর্ভতা, সর্বোপরি এই পালিশ করা দোকানদারি—সব কিছু আমি ঘৃণা করি। কী! দাসত্ব-বন্ধনে যারা বন্দী তাদের মাপকাঠিতে আমি আমার আত্মার পরিমাপ করব? ছোঃ! তুমি এই সন্ন্যাসীকে চেন না বোন। বেদই বলেছেন, "সে দাঁড়ায় বেদের মাথার ওপর," কারণ সে মুক্ত-চার্চ থেকে, ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে, ধর্ম থেকে, প্রবক্তা ও ধর্মগ্রন্থ থেকে এবং এই রকম সব কিছু থেকে সে মুক্ত। মিশনারী হোক আর অন্য যে হোক, যত পারে চীৎকার করুক আর আমাকে আক্রমণ করুক, আমি তাদের দেখব যেমন বলেছেন ভর্তৃহরি, "সন্ন্যাসী, তোমার পথে তুমি চলো! কেউ হয়ত বলবে, 'এই পাগলটা কে?' অন্যান্যরা বলবে, 'কে এই চণ্ডাল?' আবার অন্যান্যরা তোমাকে জানবে মহাজ্ঞানী বলে। মরজীবদের এই সব আবোল তাবোল শুনে তুমি খুশী হয়ো।" কিন্তু যখন তারা আক্রমণ করবে তখন জানবে "হাতী যখন বাজারের মধ্য দিয়ে চলে তখন নেড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে কিন্তু হাতী তাতে গ্রাহ্য করে না। সে সোজা নিজের পথে চলে। এই রকমই হয় সবদা, মহৎ মানুষের আবির্ভাব ঘটলে তাকে বহুর ঘেউ ঘেউ শুনতে হবেই।" [তুলসী দাস]

আমি এখন ল্যাণ্ডসবার্গের বাড়িতে ৫৪ ডব্লু ৩৩নং স্ট্রীট এই ঠিকানায় বাস করছি। তিনি লোকটি খুব সাহসী এবং মহৎ। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। মাঝে মাঝে ঘুমোনোর জন্য গুয়েরনসের বাড়িতেও যেয়ে থাকি।

চিরকাল ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, বিশ্ব নামক এই দমবাজি থেকে তিনি যেন যথাশীঘ্র তোমাকে পরিত্রাণের পথ দেখান! বিশ্ব নামক এই বুড়ী ডাইনী যেন কখনো তোমাকে যাদু করতে না পারে! শঙ্কর তোমার সহায় হোন! উমা যেন তোমার কাছে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, যেন তোমার সকল ভ্রান্তি অপনোদন করেন।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৭]

১৯ ডব্লু ৩৮ নং স্ট্রীট,
নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

...তথাকথিত সমাজ-সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাতে যেয়ো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার সাধিত না হলে অন্য কোনো সংস্কার হতে পারে না। আমি সমাজ-সংস্কার চাই কে বলল তোমাকে? সে আমি না। প্রভুর কথা প্রচার কর—কুসংস্কার বা

খাদ্য পথ্য বিষয়ে ভালো মন্দ কিছুই বোলো না। আশা হারিয়ো না, গুরুর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না, ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না। যত দিন এই তিন বিশ্বাস থাকবে ততদিন কোনো কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না বৎস। প্রতিদিনই আমার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাহসী বৎসগণ, কাজ করে চল।

সতত আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪০]

৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নিউ ইয়র্ক
২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় বোন,

অসুখে পড়েছিলে জেনে দুঃখিত হলাম। তোমার স্বীকারোক্তি আমার মনোবল অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে, তথাপি একটি অনুপস্থিত চিকিৎসা বাৎলাব তোমাকে।

তুমি যে তা থেকে বেরিয়ে এসেছ সে খুব ভালো কথা। সব ভালো যার শেষ ভালো।

বইগুলো সব ভালোয় ভালোয় এসেছে, তার জন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

তোমার চির স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[চিঠিখানা ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলিকে লেখা। হালে ভগ্নীদের (ইসাবেল তাদের অন্যতম) ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স পড়া ও চর্চা করা নিয়ে মৃদু পরিহাস করে স্বামীজী খুব মজা পেতেন। নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা এই ছোট চিঠিটিতে তিনি দুষ্টুমি করে খোঁচা মেরেছেন 'সায়েন্টিস্টদের' অসুখের স্বীকারোক্তি না করার অভ্যাসের প্রতি।]

[৪১]

ইউ. এস. এ.
৬ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

…এক মুহূর্তের তরেও ভেবো না "ইয়াঙ্কিরা" ধর্ম ব্যাপারে খুব প্র্যাকটিক্যাল। ও ব্যাপারে প্র্যাকটিক্যাল শুধু হিন্দুরা, ইয়াঙ্কিরা প্র্যাকটিক্যাল টাকা করতে; অতএব আমি চলে যেতে না যেতেই সব ব্যাপার হাওয়া হয়ে যাবে। কাজে কাজেই চলে যাবার আগে পায়ের তলায় একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে চাই। প্রত্যেকটি কাজকেই আদ্যন্তব্যাপী করে তুলতে হবে।…শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচারের জন্য তোমার জেদ ধরবার দরকার নেই। আগে তাঁর আইডিয়া প্রচার কর, যদিও আমি জানি এ

সংসারে সবাই মানুষটিকেই চায় সর্বপ্রথম, তারপর তার আইডিয়া।...প্রথমেই মস্ত মস্ত প্ল্যান ফাঁকিয়ে বোসো না, সুরু করো ধীরে সুস্থে, পা রাখবার জায়গা দেখে যাও, তারপর ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলো।

...আমার নির্ভীক বৎসগণ, কাজ করে যাও। এক দিন আমাদের আলোকের দর্শন মিলবেই।

সামঞ্জস্য এবং শান্তি চাই!...সব কিছু ধীরে ধীরে গড়ে উঠুক। রোম একদিনে নির্মিত হয় নি। মহীশূরের মহারাজা—আমাদের মস্ত একটি ভরসাস্থল—মারা গেলেন। সে যাই হোক, ঈশ্বর মহান। আমাদের আদর্শ স্থাপনে সাহায্যের জন্য তিনি অন্যান্যদের প্রেরণ করবেন।

যদি পার তবে কিছু কুশাসন পাঠিয়ো।

সতত আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪২]

(ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলিকে লেখা)

৫৪ ডব্লু, ৩৩ নিউ ইয়র্ক
২৭ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় বোন,

তোমার সহৃদয় পত্রখানা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে তা বর্ণনার অতীত। সহজে পড়তেও পেরেছি। অবশেষে কমলা রঙ ঠিক হল, কোট করলাম একটি, কিন্তু গ্রীষ্মকালে পরবার মত কাপড় এখনো পাইনি। তুমি যদি পাও আমাকে দয়া করে জানিয়ো। পোষাক এই নিউ ইয়র্কে তৈরী করিয়ে নেব। তোমাদের ডিয়ারবর্ন এভিনিউর আশ্চর্য দর্জি যে বেমানান পোষাক তৈরী করে এমন কি সন্ন্যাসীর পক্ষেও ব্যবহার করা অসম্ভব।

মিস্টার লকি আমাকে একখানা দীর্ঘ পত্র দিয়েছেন, জবাব দিতে আমার দেরী দেখে সম্ভবত ভাবছেন। তাঁর উৎসাহে আত্মহারা হবার প্রবণতা আছে। তাই অপেক্ষা করছি। আর কী জবাব দেব জানি না। আমার হয়ে তাঁকে দয়া করে বোলো যে এখুনি কোনো জায়গা স্থির করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মিসেস পীক অত্যন্ত মহৎ, চমৎকার এবং খুবই আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে তার চাতুর্য আমারই ন্যায়, আমি অবশ্য এই ব্যাপারে প্রত্যহই বেশী করে চতুর হয়ে উঠছি। মিসেস পীক ওয়াশিংটনে কাকে যেন আবছা আবছা চেনেন, সেই চেনা লোক গ্রীষ্মকালের জন্য একটি জায়গা দিতে চেয়েছেন।

তাকে যে ঠকানো হবে না একথা কে জানে? তঞ্চকতার পক্ষে এ এক আশ্চর্য দেশ, শতকরা ৯৯.৯ জন লোকেরই কিছু না কিছু একটা মতলব থাকে অন্যদের

বেকায়দায় ফেলে সুবিধা আদায় করবার। কেউ যদি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ত সে গেছে!! সিস্টার যোসেফাইন অত্যন্ত অগ্নিস্ফুরা। মিসেস পীক সরল ভালো মানুষ। এখানকার লোকেরা আমাকে নিয়ে যা করেছে তাতে বেশ কয়েক ঘন্টা চারদিক না দেখে নিয়ে আমি এক পাও ফেলি না। কিন্তু সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। সিস্টার যোসেফাইনকে বোলো একটু ধৈর্য ধারণ করতে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস বুড়ো মানুষের সংসার চালাবার চেয়ে কিণ্ডারগার্টেন দেখা শোনা করাকেই তোমার ক্রমে ক্রমে বেশী ভালো লাগছে। মিসেস বুলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তাঁকে অমন শান্ত নিরীহ দেখে তুমি নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছ। মিসেস অ্যাডামসের সঙ্গে কি কখনো সখনো দেখা হয়? মিসেস বুল তাঁর পাঠ থেকে খুব উপকৃত হয়েছেন। আমিও নিয়েছিলাম কয়েকটি, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। সম্মুখে বোঝা ক্রমশঃ বাড়ছে, এমতাবস্থায় মিসেস অ্যাডামসের নির্দেশ অনুযায়ী সামনে ঝুঁকে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হাঁটতে হাঁটতে যদি সমুখ পানে ঝুঁকি তাহলে অভিকর্ষ কেন্দ্রটি আসে পেটের ওপরটায়, ফলে আমাকে ডিগবাজি খেতে হয়।

কোনো দশ লাখপতি আসছে না? লাখ কয়েকও না? কী দুঃখের কথা!!! আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; কিন্তু আমি কি করব? আমার ক্লাস সব তো মহিলারাই ভরে রেখেছে। তুমি তো আর নারীকে বিয়ে করতে পার না। তা যেমন হোক, ধৈর্য ধর। আমি আমার চোখ খোলা রাখব, কোনো একটি সুযোগ এলে তা হারাব না। তোমার যদি না জোটে ত' সেটা আমার আলস্যের দরুণ হবে না।

জীবন বয়ে চলেছে পুরাতন রেখা ধরে। চিরকাল এই লেকচার দিতে দিতে আর কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠি; তখন মনে হয় একদম কথা না বলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই।

তোমার শুভ স্বপ্ন কামনা করি, (সুন্দর স্বপ্ন দেখাই সুখী হবার একমাত্র উপায়।)

তোমার চিরস্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[৪৩]

ইউ. এস. এ.
৪ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। কেউ আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে ভেবে তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। যতক্ষণ প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন ততক্ষণ আমি অক্ষয়। আমেরিকা সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই ধোঁয়াটে। এ একটা বিশাল দেশ, বেশীর ভাগ লোকই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না।... ক্রিশ্চিয়ানিটি টিকে আছে শুধুমাত্র একটি দেশহিতৈষণা হিসাবে, আর কিছু নয়।

…দেখ বৎস, সাহস হারিয়ো না।…আমাকে বেদান্তসূত্র সমূহ এবং সব গোষ্ঠীর ভাষ্যগুলি পাঠিয়ে দিও।…আমি সম্পূর্ণ তাঁরই হাতে। ভারতে ফিরে গিয়ে ফল কি? ভারত আমার আইডিয়া শক্তিশালী করতে পারবে না। আমার আইডিয়ার প্রতি এই দেশের আচরণ সহৃদয়। ফিরে যাব সেদিনই যেদিন আদেশ পাব। ইতিমধ্যে তোমরা শান্তভাবে এবং ধৈর্য সহকারে কাজ করতে থাক। কেউ যদি আমাকে গালমন্দ করে তবে তার অস্তিত্বকেই অগ্রাহ্য করবে।…তোমাদের জন্য আমার পরামর্শ: একটি সোসাইটির পত্তন কর যেখানে লোকে টীকা ও ভাষ্য সমেত বেদ ও বেদান্তের শিক্ষা লাভ করতে পারে! উপস্থিত এই ধারায় কাজ কর।…একথা জেনো যে যখনই নিজে দুর্বল বোধ করবে তখনই শুধু যে নিজের ক্ষতি করবে তা নয়, পরন্তু আদর্শেরও ক্ষতি করবে। অপরিসীম বিশ্বাস এবং মনোবলই সাফল্যের একমাত্র শর্ত।

প্রফুল্ল হও।…নিজের আদর্শে অবিচল থাক।… সর্বোপরি, অন্যকে পরিচালনা করার, অন্যের ওপর শাসন করার, ইয়াঙ্কিদের ভাষায় অন্যের ওপর "মাতব্বরি" করার চেষ্টা কখনো করবে না। সকলের সেবক হবে।

আশীর্বাদসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[88]

ব্রিজি মেডোজ
মেটকাফ, মাসাচুসেটস্
অগস্ট ২০, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিংগা,

কাল তোমার চিঠি পেলাম। আমার জাপান থেকে লেখা চিঠি তুমি বোধ হয় ইতিমধ্যে পেয়ে থাকবে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরদিকে—আমি জাপান থেকে ভ্যানকুভার গেলাম, খুব ঠাণ্ডা ছিল। গরম জামা কাপড় না থাকায় বড় কষ্ট পেয়েছি। যাই হোক, কোন রকমে ভ্যাংকুভার পৌঁছে সেখান থেকে কানাডা হয়ে শিকাগো চলে গেলাম। শিকাগোয় প্রায় বারো দিন ছিলাম। প্রতিদিনই মেলা দেখতে যেতাম। সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। সবটা দেখতে অন্ততঃ দিন দশেক লেগে যায়। যে মহিলাটির সঙ্গে বরদা রাও আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ও তাঁর স্বামী শিকাগোর খুব অভিজাত সমাজের লোক। তাঁরা আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। শিকাগো ছেড়ে বস্টনে এলাম, শ্রীলালুভাই বস্টন পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন…

এখানে সাংঘাতিক খরচ। তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে ১৭০ পাউণ্ডের খত্‌ ও ৯ পাউণ্ড নগদ দিয়েছিলে, এখন সব মিলিয়ে ১৩০ পাউণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। গড়ে প্রতিদিন আমার এক পাউণ্ড করে খরচ; আমাদের টাকার হিসাবে একটা

চুরুটের দাম আট আনা। মার্কিনিরা এত বড়লোক যে তারা জলের মতো টাকা খরচ করে; আর আইন করে সব জিনিসের দাম তারা এত বাড়িয়ে রেখেছে যে পৃথিবীর অন্য কোন জাত তার ধারে কাছে যেতে পারে না। প্রত্যেকটা সাধারণ কুলি দৈনিক ন-দশ টাকা করে রোজগার করে আর তা খরচ করে। রওনা হবার আগে যে সব রঙিন ধারণা ছিল তা সব উবে গেছে, আর এখন আমাকে এক দুরূহ অবস্থার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। শতবার মনে হয়েছে এ দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাই। কিন্তু আমিও অটল, আমি ওপর থেকে ডাক পেয়েছি। আমি কোন পথ দেখি না কিন্তু তাঁর চোখ দেখি। মরি কি বাঁচি, আমিও আমার লক্ষ্য ছাড়ছি না।···

এই মুহূর্তে আমি বস্টনের কাছে একটা গ্রামে এক বৃদ্ধার অতিথি হয়ে আছি। এই মহিলার সঙ্গে হঠাৎ ট্রেনে আলাপ। ওঁর সঙ্গে থাকার জন্য উনি আমন্ত্রণ জানালেন, ওঁর সঙ্গে থাকায় আমার একটা সুবিধাই হয়েছে। দৈনিক এক পাউণ্ড করে খরচ বাঁচছে। আর ওঁর লাভ এই যে, উনি ওঁর বন্ধুবান্ধবকে ডেকে ডেকে ভারতবর্ষের এক দুর্লভ মজার জিনিস দেখাচ্ছেন। এ সব সহ্য করতেই হবে। উপোস, ঠাণ্ডা আর আমার অদ্ভুত পোষাকের জন্য রাস্তার লোকের বিদ্রূপের আওয়াজ—সব কিছুর সঙ্গেই লড়ে যাচ্ছি। কিন্তু, বাছা হে, কোন বড় কাজই বড় রকমের কষ্ট ছাড়া কোনদিন হয়নি।

···তারপর, জেনে রেখো যে এটা খ্রীস্টানদের দেশ, আর অন্য কোন প্রভাব এখানে প্রায় নেই-ই। আমি অবশ্য পৃথিবীর কোন—বাদীদের শত্রুতাকেই বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করি না। মেরি-পুত্রের অনুগামী ছেলেমেয়েদের মধ্যেই আমি এখানে আছি। প্রভু যীশুই আমাকে সাহায্য করবেন। এরা অবশ্য হিন্দুধর্মের উদারনীতি ও ন্যাজারেথের অবতারের প্রতি আমার ভালবাসায় খুব খুশী। আমি এদের বলেছি যে গ্যালিলির মহাপুরুষের বিরুদ্ধে আমি কিছুই প্রচার করি না। খ্রীষ্টানদের আমি শুধু একটা কথাই বলি যে তারা যেন প্রভু যীশুর সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষদের গ্রহণ করেন। তারা এই কথাটার মর্ম উপলব্ধি করেন।

শীত আসছে। আমাকে সব রকম গরম জামা কাপড় যোগাড় করতে হবে। আমাদের আবার স্থানীয় লোকেদের চেয়ে বেশী গরম জামা কাপড় দরকার।··· বাছা হে, দৃষ্টি শাণিত কর, সাহস সঞ্চয় কর। ভারতবর্ষে বড় বড় কাজ করার জন্য আমরা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট আস্থা রাখি। আমরা করবই। আমরা যারা গরীব ও ঘৃণিত যারা প্রকৃত অনুভব করে, অন্যেরা নয়···

শিকাগোয় সেদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। কাপুরথলার রাজা এখানে এসেছিলেন, আর শিকাগো সমাজের কেউ কেউ তাকে এক পুরুষসিংহ বানিয়ে ফেলেছিল। মেলার চত্বরে আমার সঙ্গে এই রাজার দেখা হয়। একজন গরীব ফকিরের সঙ্গে কথা বলার পক্ষে তিনি খুবই বড়। ধুতি পরা এক ছিটেল মারাঠী ব্রাহ্মণ এই মেলায় নখের সাহায্যে তৈরী ছবি বিক্রি করছিল। এই লোকটা রিপোর্টারদের কাছে এই রাজার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে—এই রাজা নীচু জাতের লোক ছিল, এদের মতো রাজারা ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নয়, এরা সাধারণতঃ অসৎ

জীবন যাপন করে ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর এই সব সত্যনিষ্ঠ (?) সম্পাদকরা, যাদের জন্য আমেরিকা বিখ্যাত, এই ছোকরার কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিল, আর পরদিন আমাকে লক্ষ্য করে ভারতবর্ষ থেকে আগত এক জ্ঞানী ব্যক্তির বর্ণনা বিরাট আকারে সংবাদপত্রে বেরুল। আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে এমন সব কথা আমার মুখে বসালো যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর এই কাপুরথলার রাজা সম্বন্ধে ওই মারাঠী ব্রাহ্মণ যা যা বলেছিল তার সবই আমার মুখে বসিয়ে দিল। এবং এর ফলে এমন একটা রগড়ানি হল যে, শিকাগো সমাজ হুড়মুড় করে এই রাজাকে ত্যাগ করল।... এই সব সংবাদপত্রের সম্পাদকরা আবার আমাকে মুখ্য বিষয় করে আমার দেশবাসী-দের বেশ খানিকটা রগড়ানি দিলেন। এর থেকে বোঝা গেল যে এদেশে টাকা এবং উপাধির আড়ম্বরের চেয়ে বুদ্ধির গুরুত্ব অনেক বেশী।

গতকাল মহিলা-কারাগারের পরিচালিকা শ্রীমতী জনসন এখানে এসেছিলেন। এখানে কারাগার বা জেলখানা বলে না, বলে সংশোধনাগার। আমেরিকায় আমি যা দেখেছি তার মধ্যে এ এক অতি চমৎকার জিনিস। কারাবাসিন্দাদের সঙ্গে কী সদাশয় ব্যবহার করা হয়, কিভাবে তাদের সংশোধন করে সমাজের উপযোগী করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কী চমৎকার, কী সুন্দর—তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আর, আমরা ভারতবর্ষে গরীব ও অনুন্নতদের সম্পর্কে কি ভাবি সে কথা চিন্তা করলে বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। তাদের কোন সুযোগ নেই, কোন নিষ্কৃতি নেই, ওপরে ঠওার কোন পথ নেই। ভারতবর্ষে গরীব, অনুন্নত ও পাপীদের কোন বন্ধু নেই, কোন সহায় নেই—তারা যত চেষ্টাই করুক, ওপরে উঠতে পারে না। তারা দিন দিন ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর সমাজের আঘাত তারা অনুভব করে, কিন্তু তারা জানে না যে আঘাতটা কোথা থেকে আসে। তারা ভুলে গেছে যে তারাও মানুষ। এবং এর পরিণতি হল দাসত্ব। যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তারা এসব দেখেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা এর জন্য হিন্দুধর্মকে দায়ী করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে উন্নতি সাধনের একমাত্র পথই হল পৃথিবীর এই মহত্তম ধর্মটিকে চূর্ণ করে ফেলা। শোন বন্ধু, ঈশ্বরের কৃপায় আমি এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছি। ধর্মের কোন দোষ নেই। বরং তোমাদের ধর্ম বলছে যে প্রতিটি প্রাণীই তোমার আত্মার এক একটি রূপ মাত্র। এ সবের বাস্তব প্রয়োগের অভাব ছিল, অভাব ছিল সমবেদনার– অভাব ছিল হৃদয়ের। ঈশ্বর আর একবার তোমাদের কাছে এসেছিলেন, বুদ্ধরূপে। তিনি তোমাদের শেখালেন কিভাবে উপলব্ধি করতে হয়, কিভাবে গরীবদের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য দরদী হতে হয়। কিন্তু তোমরা তাঁর কথা শুনলে না। তোমাদের পুরোহিতরা গল্প বানালো যে, ভুল মতবাদ প্রচার করে দৈত্যদের প্রতারণা করার জন্যই ঈশ্বরের এখানে আগমন! এ কথা সত্য, কিন্তু যাদের ভাবা গিয়েছিল তারা নয়, দৈত্য আসলে আমরাই। আর ইহুদিরা যেমন প্রভু যীশুকে অস্বীকার করার দিন থেকে আজও ঘরছাড়া ভিখিরি হয়ে, সর্বত্র অত্যাচারিত হয়ে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমরাও তেমনি যে জাতি তোমাদের শাসন করতে চাইছে তার কাছে

ক্রীতদাস হয়ে যাচ্ছ। আহা! অত্যাচারীরা জানে না যে, সোজা দিকটা অত্যাচার, আর উলটো দিকটা দাসত্ব। ক্রীতদাস আর অত্যাচারী সমার্থ।

বালাজী ও জি. জি.-র হয়তো মনে আছে। পণ্ডিচেরিতে আমরা একদিন সন্ধ্যাবেলা এক পণ্ডিতের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তার সেই বর্বর অঙ্গভঙ্গী আর "কদাপি ন" (কখনও না) আমার চিরকাল মনে থাকবে। ওরা জানে না যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটা ছোট অংশ মাত্র, আর ভারতের এই সুন্দর মাটিতে যে তিরিশ কোটি কেঁচো পরস্পরকে পীড়ন করে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসী তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। এই অবস্থার অবসান চাই। ধর্ম ধ্বংস করে নয়; বরং হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলোকে অনুসরণ করে। আর তার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে বৌদ্ধধর্মের অপূর্ব সংবেদন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই এক ন্যায়সঙ্গত পরিণতি।

বিশুদ্ধতার অসক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে, সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস বলে শক্তিশালী হয়ে, স্নায়ুতে সিংহের মত সাহস সঞ্চয় করে দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি দরদী হয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দেশের চতুর্দিকে মুক্তির বাণী, সহযোগিতার বাণী, সামাজিক উন্নয়নের বাণী—সাম্যের বাণী প্রচার করে ঘুরতে হবে।

হিন্দুধর্মের মতো এত উচ্চসুরে মানুষের মহিমাকীর্তন পৃথিবীতে আর অন্য কোন ধর্মেই নেই, আবার হিন্দুধর্মের মতো এমনভাবে দরিদ্র ও অনুন্নতদের উপর এত অত্যাচারও পৃথিবীতে কোন ধর্ম করে না। ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ধর্মের কোন দোষ নেই। কিছু ভণ্ড ও নাস্তিক—কপটচারী—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ইত্যাদি মতবাদের নাম দিয়ে সমস্ত রকম অত্যাচারের কল বের করেছে।

হতাশ হ'য়ো না; মনে রেখো ভগবান গীতায় বলেছেন, "কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়।" কোমর বাঁধো, বাছা! ঈশ্বর আমাকে এজন্য ডেকেছেন। দুঃখ দুর্দশা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে, আমার ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় লোকজনদের আমি প্রায় অনাহারে মরতে দেখেছি; আমাকে উপহাস করা হয়েছে, অবিশ্বাস করা হয়েছে, আর যারা আমাকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছে তাদের প্রতি দরদ দেখানোর জন্য আমাকে ভুগতে হয়েছে। শোন বাছা, এ পাঠশালায় যন্ত্রণা যৎপরোনাস্তি, কিন্তু আবার এ পাঠশালাতেই পাবে মহাপুরুষ ও ভাববাদীদের শিক্ষা যা থেকে আয়ত্ত করতে পারবে সংবেদন, সহনশীলতা ও সর্বোপরি ইস্পাতের মতো অদম্য মনোবল যা আমাদের গায়ের তলার পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেও অনড়, অটল থাকে। ওদের জন্য আমার করুণা হয়। ওদের কোন দোষ নেই; ওরা ছেলেমানুষ, নিতান্তই ছেলেমানুষ, যদিও সমাজে ওরা অনেক বড় ও উঁচু পদে অধিষ্ঠিত। ওরা ওদের চারপাশে কয়েকগজ সীমারেখার বাইরে কিছুই দেখতে পায় না। ওদের জগৎসীমা—বাঁধাধরা-কাজ, খাওয়া, পান করা, রোজগার করা ও বংশবৃদ্ধি করা—সব অঙ্কের মতো নিখুঁতভাবে পর পর হয়ে চলেছে। এর বাইরে ওরা কিছু জানে না—ছোট ছোট সুখী প্রাণ সব। ওদের কখনও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, শত শতাব্দীর উৎপীড়ন থেকে উদ্ভূত দুঃখ, যন্ত্রণা, মর্যাদাহানি ও দারিদ্র্যের যে ক্রন্দনে

ভারতের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ তা কখনও ওদের মানসিক আচ্ছন্নতাকে ব্যাহত করে না। যুগযুগ ধরে যে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক অত্যাচারের ফলে ঈশ্বরের ভাবমূর্তি ভারবাহী গর্দভে পরিণত হয়েছে, স্বর্গীয় মাতৃমূর্তি সন্তানবাহী ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়েছে, এবং মানুষের জীবন এক অভিশাপে পরিণত হয়েছে তা কখনও ওদের কল্পনাতে আসে না। কিন্তু আরো অনেকে আছে যারা উপলব্ধি করে, অনুভব করে, হৃদয়ে রক্তাশ্রু বিসর্জন করে, যারা মনে করে যে এর প্রতিবিধান আছে, যারা যে কোন মূল্যে এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিয়েও এই প্রতিবিধান প্রয়োগ করতে প্রস্তুত। আর এদের নিয়েই তো স্বর্গরাজ্য। হে বন্ধুগণ, এটাই কি তাহলে স্বাভাবিক নয় যে উচ্চমার্গের এই সব মানুষের ঐসব সর্বদা বিষোদ্গারণে তৎপর ক্ষুদ্র ঘৃণ্য কীটদের খামখেয়ালীপনার দিকে তাকিয়ে দেখার কোন অবকাশ নেই।

তথাকথিত বড়লোকদের ওপর আস্থা রেখো না। তারা মৃতপ্রায়, জীবনীশক্তি তাদের কম। ভরসা তোমরা—যারা নম্র, অবনত কিন্তু কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। কোন কূটনীতি নয়, ওটা কিছু নয়। দুঃখীদের জন্য অনুভব কর আর সাহায্য সন্ধান কর—সাহায্য আসবেই। এই ভার বুকে বয়ে, এই চিন্তা মাথায় নিয়ে আমি বারো বছর ধরে ঘুরছি। তথাকথিত বড়লোক ও মানী লোকদের দরজায় দরজায় ঘুরেছি। নিদারুণ যন্ত্রণা বুকে বয়ে সাহায্য চেয়ে চেয়ে আমি পৃথিবীর অর্ধেক অতিক্রম করে এই অদ্ভুত দেশে এসে পৌঁছেছি। ঈশ্বর মহান্। আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। শীতে কিংবা অনাহারে আমি হয়তো এখানেই মারা যেতে পারি ; কিন্তু, হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও পীড়িত মানুষের প্রতি দরদ ও তাদের জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব আমি তোমাদের ওপর দিয়ে যেতে চাই। এই মুহূর্তে পার্থসারথির* মন্দিরে যাও। তাঁর সামনে গিয়ে মাথা নীচু কর যিনি ছিলেন গোকুলের দরিদ্র অনুন্নত রাখালদের বন্ধু, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে কখনও সঙ্কুচিত হন নি, যিনি বুদ্ধ-অবতার রূপে সম্ভ্রান্ত লোকদের আহ্বান প্রত্যাখান করে এক পতিতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেন। যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সেই সব দরিদ্র, অনুন্নত ও পীড়িতদের জন্য তোমরা মহৎ আত্মত্যাগ, জীবন-বলি নিবেদন কর যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন, যাদের তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। শপথ গ্রহণ কর যে এই তিরিশ কোটি মানুষ যারা দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্ধার করার জন্য তোমরা সারাটা জীবন নিয়োগ করবে।

এ এক দিনের কাজ নয়, আর এই পথও মারাত্মক কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু আমরা জানি, পার্থসারথি আমাদের সারথি হতে প্রস্তুত। তাঁর নামে, তাঁর ওপর অগাধ আস্থা রেখে ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত দুঃখদুর্দশার পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দাও—তা পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবেই। নিশ্চিত মনে এগিয়ে এসো ভাইসব, এ এক বিরাট কর্মভার, আর সে তুলনায় আমরা কত ছোট। কিন্তু আমরা জ্যোতির পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র। জয় ভগবান, জয় আমাদের হবেই। শত শত লোকের এই সংগ্রামে জীবন যাবে, আবার শত শত লোক দায়িত্ব তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতও থাকবে। আমি অসফল

*অর্জুনের রথচালক শ্রীকৃষ্ণ।

হয়ে এখানে মারা যেতে পারি, তখন আর একজন কর্মভার তুলে নেবে। রোগটা কি তোমরা জান, প্রতিবিধান কি তা-ও তোমরা জান—এখন শুধু বিশ্বাস রাখো। তথাকথিত ধনী ও মানী লোকদের সম্মান দেখাতে যেও না, হৃদয়হীন বুদ্ধিজীবী লেখকদের, আর তাদের অনুভূতিহীন সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলোকে গ্রাহ্য করো না। বিশ্বাস ও দরদ—উদ্দীপ্ত বিশ্বাস ও একান্ত দরদ! জীবন কিছু নয়, মৃত্যু কিছু নয়, অনাহার কিছু নয়, শীত কিছু নয়। জয় ভগবান—এগিয়ে চলো, ঈশ্বর আমাদের প্রধান সেনাপতি। কে পড়ে গেল দেখার জন্য পেছনে চেয়ো না—সামনে চল, এগিয়ে চল। ভাইসব, আমরা এইভাবেই এগিয়ে যাব! একজন পড়ে গেলে আর একজন কর্মভার তুলে নেবে।

এই গ্রাম থেকে আগামীকাল বস্টন যাচ্ছি। সেখানে একটা বড় মহিলা-ক্লাবে বক্তৃতা দিতে হবে। এই ক্লাবটি রমাবাইকে সাহায্য করছে। বস্টন পৌঁছেই প্রথমে আমাকে কিছু জামাকাপড় কিনতে হবে। আমাকে যদি এখানে বেশ কিছুদিন থাকতে হয় তাহলে আমার এই অদ্ভুত পোষাকে চলবে না। সুতরাং আমার পরা দরকার কালো লম্বা কোট, আর বক্তৃতা দেওয়ার পোষাক হিসাবে লাল আলখাল্লা ও পাগড়ি। মহিলারা আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরাই এখানে কর্ত্রী; তাঁদের সহানুভূতি আমার চাই-ই। তুমি এই চিঠি পাবার আগেই আমার তহবিলের পরিমাণ ষাট থেকে সত্তর পাউণ্ডে এসে দাঁড়াবে। সুতরাং কিছু টাকা পাঠাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করো। কিছু প্রভাব বিস্তার করার জন্য এখানে কিছুদিন থাকা দরকার। শ্রীভট্টাচার্যের জন্য কলের গান আমি দেখতে পারি নি, কারণ তার চিঠি আমি এখানে পেলাম। আবার যদি আমি শিকাগো যাই তো দেখব। আর শিকাগো ফিরব কিনা জানি না। সেখানকার বন্ধুরা আমাকে ভারতবর্ষে প্রতিনিধি হবার জন্য লিখছেন। আর যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বরদা রাও আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ওখানকার মেলার একজন বড়কর্তা; তবুও আমি যেতে রাজি হইনি, কারণ শিকাগোয় মাসাধিক কাল থাকতে গেলে সামান্য যা অর্থ হাতে আছে তাও খরচ হয়ে যেত।

কানাডা ছাড়া আমেরিকার কোথাও ট্রেনে কোনরকম শ্রেণী বিভাগ নেই। যেহেতু প্রথম শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণী নেই, আমাকে প্রথম শ্রেণীতেই ঘুরতে হয়। আমি কিন্তু যে কামরায় ঘুমনোর ব্যবস্থা আছে সে কামরায় যেতে সাহস পাই নি। এই কামরাগুলো খুব আরামদায়ক—ঠিক হোটেলের মতো এখানে ঘুমনো, খাওয়া, পান করা, এমন কি স্নানেরও ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এতে খরচ বড় বেশী।

এখানকার সমাজে প্রবেশ করা ও শ্রোতা পাওয়া খুব কঠিন। শহরগুলোয় এখন কেউ নেই, সবাই গ্রীষ্মাবাসে চলে গেছে। সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এত পরিশ্রমের পর সহজে আমি ছাড়ছি না। তোমরা শুধু যতটা পার আমাকে সাহায্য কর; আর তোমরা যদি নাও পার আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবই। আমি যদি এখানে শীতে বা রোগে বা অনাহারে মারাও যাই, এই কর্মভার তোমরা তুলে নেবে। পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বাস। কুক কোম্পানিকে আমি নির্দেশ দিয়ে

রেখেছি যে, আমার নামে কোন চিঠি বা টাকা এলে আমি যেখানেই থাকি ওরা আমাকে তা পাঠিয়ে দেবে। রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি। তোমরা যদি আমাকে এখানে অন্তত ছমাস রাখতে পার তাহলে, আমি মনে করি, সব ঠিক ঠিক মতো হয়ে যাবে। আমিও এদিকে ভেসে থাকার মতো যে কোন তক্তা খুঁজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আর, যদি আমি নিজেকে চালিয়ে নেবার মতো কোন পন্থা বের করতে পারি তো সঙ্গে সঙ্গে খবর দেব।

প্রথমে আমি আমেরিকায় চেষ্টা করব, না পারলে ইংলণ্ডে চেষ্টা করব; সেখানেও যদি না পারি তো ভারতবর্ষে ফিরে যাব ও ঈশ্বরের পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করব। রামদাসের বাবা ইংলণ্ড গেছেন। তিনি বাড়ি ফেরার জন্য খুব ব্যস্ত। ওঁর মনটা খুব ভাল, বেনেদের অমার্জিতভাবটা ওঁর শুধু বাইরের ব্যাপার। চিঠি পৌঁছতে বিশ দিনের বেশী লেগে যাবে। নিউ ইংলণ্ডে এখনই এতো শীত যে প্রতিদিনই রাত্রে ও সকালে আগুন জ্বেলে রাখতে হয়। কানাডায় আরও ঠাণ্ডা। এখানকার মতো আর কোথাও আমি এতো নীচু পাহাড়ে বরফ পড়তে দেখিনি।

নিজের পথ আমি ধীরে ধীরে করে নিতে পারি, কিন্তু তার মানেই তো এই ব্যয়-বহুল দেশে দীর্ঘদিন থাকা। বর্তমানে ভারতবর্ষে টাকার দর চড়ে যাওয়াতে এদেশের লোকের মনে আশংকা দেখা দিয়েছে, অনেক মিলও বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এই মুহূর্তে আমি কিছু আশা করতে পারি না, কিন্তু অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে।

এইমাত্র আমি দর্জির কাছে গিয়েছিলাম, কিছু গরম জামাকাপড়ের জন্য বায়না করে এলাম, এর খরচ খুব কম হলেও তিনশ টাকার ওপর। তাও যে খুব ভাল কাপড় তা নয়, ভদ্রদুরস্ত মাত্র। এখানকার মহিলারা পুরুষদের পোষাক সম্বন্ধে বড় বেশী খুঁতখুঁতে আর এদেশে সব ক্ষমতা ওদেরই হাতে। ওরা···ধর্মযাজকদের কখনও নিরাশ করে না। আমাদের রমাবাইকে ওরা প্রতি বছরই সাহায্য করছে। তোমরা যদি আমাকে এখানে না রাখতে পার তাহলে এদেশ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য কিছু টাকা পাঠাও। ইতিমধ্যে আমার পক্ষে সুবিধাজনক কিছু যদি ঘটে তাহলে আমি চিঠি লিখে বা টেলিগ্রাম করে জানাব। টেলিগ্রাম করতে প্রতিটি শব্দের জন্য চার টাকা খরচ!

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৫]

শিকাগো
২ নভেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিংগা,

আমার এক মুহূর্তের দুর্বলতার জন্য তোমরা কত কষ্ট পেলে! আমি দুঃখিত। সে সময় আমার হাতে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না। তারপর ঈশ্বর বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছেন।

বস্টনের কাছে একটা গ্রামে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ডক্টর রাইটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি আমার প্রতি খুবই সদয় হন ও ধর্মমহাসভায় যাবার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি মনে করেন যে তাহলে আমার আমেরিকান জাতির সঙ্গে পরিচয় হবে। আমার কারুর সঙ্গেই আলাপ পরিচয় ছিল না। ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোক সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবার ভার নিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত আমি আবার শিকাগোয় ফিরে এলাম। ধর্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় পেলাম।

মহাসভা খোলার দিন সকালে আমরা সবাই আর্ট প্যালেস ভবনে সমবেত হলাম। মহাসভার অধিবেশনের জন্য সেখানে একটা মস্ত বড় ও কয়েকটা ছোট ছোট হলঘর তৈরী করা হয়। সমস্ত জাতের লোক সেখানে ছিল। ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের মজুমদার, বোম্বাই-এর নগরকার, জৈনদের প্রতিনিধি শ্রীগান্ধী এবং থিয়সফির প্রতিনিধি শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত। এঁদের মধ্যে মজুমদার আমার পুরনো বন্ধু, আর চক্রবর্তী আমাকে নামে চিনতেন। বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়ে আমাদের সকলকে সভামঞ্চে হাজির করা হল। কল্পনা কর—নীচে একটা হলঘর আর ওপরে একটা বিশাল গ্যালারি আমেরিকান কৃষ্টিজগতের বাছাই করা ছ'-সাত হাজার প্রতিনিধিতে ঠাসা, আর সভামঞ্চের ওপর পৃথিবীর সমস্ত দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী। আর আমার মতো একজন লোক যে নাকি কখনও জনসাধারণ্যে মুখ লোখোনি সে দেবে এই মহান্ সমাবেশে বক্তৃতা! গানবাজনা আনুষ্ঠানিক পর্ব ও ভাষণ দিয়ে এক মহাসমারোহে এই মহাসভার উদ্বোধন হল; তারপর প্রতিনিধিদের একে একে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, আর তাঁরা এগিয়ে এগিয়ে কিছু কিছু বললেন। আমার অবশ্য বুক দুর দুর করছিল, গলাও শুকিয়ে এসেছিল; আমি এতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে সকালে আমি কোন বক্তৃতা করতে সাহস পাইনি। মজুমদার ভারি চমৎকার বক্তৃতা করলেন, চক্রবর্তী আরও ভালো বললেন; ওঁরা দুজনেই প্রচুর হাততালি কুড়লেন। ওঁরা তৈরী ছিলেন, বক্তৃতা তৈরী করে এনেছিলেন। আমি এক নির্বোধ, কিছুই তৈরী করে আনিনি, শুধু দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে এগিয়ে গেলাম। ডঃ ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমি একটা ছোট বক্তৃতা দিলাম। "আমেরিকার বোনেরা ও ভাইয়েরা" বলে আমি সমাবেশকে সম্বোধন করলাম, আর অমনি দু মিনিট ধরে কানে তালা-লাগানো হাততালি—তারপর আমি বলতে শুরু করলাম। বক্তৃতা শেষ করে হৃদয়ের আবেগে প্রায় অবশ হয়ে বসে পড়লাম। পরদিন সব খবরের কাগজ লিখল যে আমার বক্তৃতাই সেদিনের বিস্ময়কর সাফল্য। আর অমনি সমগ্র আমেরিকায় আমার নাম ছড়িয়ে গেল। মহান্ ভাষ্যকার শ্রীধর ঠিকই বলেছেন—"মূকং করোতি বাচালং"—যিনি (ঈশ্বর) বোবাকে বাচাল করেন। ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত হোক! সেদিন থেকেই আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম, আর যেদিন আমি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আমার রচনা পাঠ করলাম সেদিন হলে যেরকম লোক হয়েছিল তা আগে কখনও হয়নি। একখানা খবরের কাগজের লেখা থেকে খানিকটা তোমার জন্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি: "সমস্ত

জায়গাটা শুধু মহিলা আর মহিলায় ঠাসা। প্রতিটি কোণ পর্যন্ত ভর্তি—বিবেকানন্দের বক্তৃতার আগে যতক্ষণ অন্যান্য রচনা পাঠ হয়েছে ততক্ষণ তারা ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করেছে।" খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা কেটে নিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে তুমি দেখে বিস্মিত হয়ে যাবে; কিন্তু তুমি তো জানো যে প্রসিদ্ধিকে আমি ঘৃণা করি। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে যখনই আমি সভামঞ্চে উঠেছি তখনই কানে তালা-লাগানো হাততালি পড়েছে। প্রায় সব খবরের কাগজেই আমার খুব প্রশংসা বেরিয়েছে, এমন কি সবচেয়ে গোঁড়া যে খবরের কাগজ তাকেও মেনে নিতে হয়েছে: "এই সুদর্শন ব্যক্তিটিই ছিল মহাসভায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। যেমন সম্মোহনী তাঁর উপস্থিতি তেমনই বিস্ময়কর তাঁর বাগ্মিতা," ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমার এটুকু জানলেই যথেষ্ট যে এর আগে প্রাচ্যের কোন লোক আমেরিকান সমাজের মনে কখনও এমন দাগ কাটতে পারেনি!

ওদের সদাশয়তার কথা কী বলব? এখন আর আমার কোন অভাব নেই। আমার অবস্থা এখন সচ্ছল, আর য়ুরোপ ঘুরতে যা টাকাকড়ি লাগবে তা এখানেই পেয়ে যাব।…নরসিংহাচার্য নামে একটি ছেলে আমাদের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে। গত তিন বছর ধরে সে এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরে বেড়াক নাই বেড়াক ছেলেটিকে আমার বেশ লাগে, যাই হোক ওর সম্বন্ধে তুমি কিছু জানলে আমাকে জানিও। ও তোমাকে চেনে। যে বছর প্যারি প্রদর্শনী হয় ও সেবার য়ুরোপ আসে।…

আমার এখন কোন অভাব নেই। শহরের সুদৃশ্যতম অনেক বাড়ীর দরজাই আমার জন্য খোলা। সব সময়ই আমি কারুর না কারুর অতিথি হয়েই আছি। এ জাতের কৌতূহল খুবই—যা অন্য কোথাও তুমি দেখতে পাবে না। এরা সব কিছুই জানতে চায়—আর এদের মহিলারা হল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর। একজন সাধারণ পুরুষ আমেরিকানের চেয়ে একজন সাধারণ মহিলা আমেরিকান অনেক বেশী উন্নত, সংস্কৃতিসম্পন্ন। পুরুষরা সারাটা জীবন অর্থের জন্য গোলামি করে, আর মহিলারা নিজেদের উন্নতির জন্য সমস্ত সুযোগ কাজে লাগায়। ওরা খুব সহৃদয় ও দিলখোলা। যার যা খোশখেয়াল আছে তা প্রচার করার জন্য এখানে আসে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এদের বেশীর ভাগেরই গভীরতার বড় অভাব। আমেরিকানদের দোষও আছে, আর তা কোন জাতেরই বা নেই? মোটামুটি আমি যা বুঝি তা হল এই: এশিয়া সভ্যতার বীজ বপন করে, য়ুরোপ উন্নতি সাধন করে পুরুষের, আর আমেরিকা ব্যস্ত মহিলা ও সাধারণ মানুষের উন্নতি সাধনে। এদেশ মহিলা ও শ্রমিক-দের কাছে স্বর্গ। আমাদের দেশের সঙ্গে আমেরিকার জনসাধারণ ও মহিলাদের তুলনা করলেই তোমার একটা পরিষ্কার ধারণা হবে। আমেরিকানরা দ্রুত উদার হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষে যে সব উগ্রনীতির খ্রীষ্টান দেখতে পাও তাদেরকে নমুনা ধরে নিয়ে এদের বিচার করো না। তারা অবশ্য এখানেও আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে, আর যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে হিন্দুরা গর্ব করে এই মহান্ জাতি দ্রুত সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

হিন্দুরা যেন কিছুতেই তাদের ধর্ম ত্যাগ না করে, কিন্তু তাদেরকে অতি অবশ্যই দেখতে হবে যে ধর্ম যেন যথোচিত সীমার মধ্যে থাকে আর সমাজ যেন উন্নতি সাধনের স্বাধীনতা পায়। ভারতবর্ষের সমস্ত সংস্কারকই একটা ভুল করেছেন। তাঁরা যাজকদের ভয়াবহ অপকৌশল ও অধঃপাতের জন্য ধর্মকে দায়ী করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বংসাতীত কাঠামোকে ভেঙে ফেলার জন্য এগিয়ে গেছেন। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? ব্যর্থতা! বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই জাতি-ব্যবস্থাকে ধর্মীয় বিধান বলে ভুল করেছেন, আর জাতি ও ধর্ম দুটোকেই একসঙ্গে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। পুরোহিতরা উন্মত্ত হয়ে যাই বলে থাকুক জাতিপ্রথা একটা কেলাসিত সামাজিক বিধান মাত্র। স্বীয় কর্মসাধন শেষ হয়ে যাবার পর এখন এই বিধান ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস পূতিগন্ধময় করে তুলেছে। কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দিলেই এই অবস্থার অবসান হবে। এখানে যে মানুষগুলো জন্মেছে তারা প্রত্যেকেই জানে যে সে একজন "মানুষ"। ভারতবর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকেই জানে যে সে সমাজের একজন ক্রীতদাস। উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিবেশ হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর জাতিপ্রথারও কী রকম দ্রুত অবসান হয়ে যাচ্ছে! একে শেষ করতে এখন আর কোনো ধর্মের প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ দোকানদার, জুতোব্যবসায়ী ও মদ্যব্যবসায়ী উত্তর ভারতে সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু কেন? প্রতিযোগিতা। বর্তমান সরকারের অধীনে কারুরই আর পছন্দসই জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কাজ করাতেই বাধা নেই। এর ফলে চলছে সমাজ-সমান প্রতিযোগিতা, আর তাই হাজার হাজার মানুষ এখন নির্বোধ নিশ্চল হয়ে নীচে পড়ে না থেকে যে যা উচ্চ সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছিল সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করছে, ও পৌঁছচ্ছে।

অন্ততঃ শীতকাল পর্যন্ত আমাকে এ দেশে থাকতেই হবে, তারপর য়ুরোপ যাব। ঈশ্বর সবকিছু জুটিয়ে দেবেন। তোমার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। তোমাদের ভালবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

প্রত্যহই বুঝতে পারছি যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন, আর আমি তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।...আমরা পৃথিবীর জন্য মহৎ কাজ করব, আর তা শুধু মঙ্গল সাধনের জন্য, নামের জন্য বা প্রশংসা পাবার জন্য নয়।

আমাদের কাজ করতে হবে ও কাজ করে মরে যেতে হবে, 'কেন' জিগ্যেস করা আমাদের কাজ নয়। মনকে তৈরী কর, বিশ্বাস রাখো যে ঈশ্বর বড় বড় কাজ করার জন্য আমাদের বেছে নিয়েছেন, আর সেই সব বড় কাজ আমরা করবই। তৈরী থাকো, অর্থাৎ শুদ্ধ, পবিত্র মন নিয়ে নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য তৈরী থাকো। দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত ও অবহেলিতদের ভালবাসো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।

মাঝে মাঝে রামনাদের রাজা ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে দেখা করো, তাদের বোঝাবার চেষ্টা করো ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হবার জন্য। তাদের ব'লো যে কীভাবে তারা গরিবদের ওপর অত্যাচার করে, আর তারা যদি গরিবদের উন্নতির চেষ্টা না করে তো তারা মানুষ নামের অযোগ্য। নির্ভীক হও, ঈশ্বর

তোমাদের সঙ্গে আছেন ; তিনি নিজেই ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অভুক্ত ও অজ্ঞ জনসাধারণের উন্নতি সাধন করবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক ও অধিকাংশ যুবরাজের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত। অধিকাংশ হিন্দু মহিলা যতদূর ভাবতে পারে প্রতিটি আমেরিকান মহিলা তার চেয়েও বেশী শিক্ষিত। আমাদেরও এরকম শিক্ষা ব্যবস্থা হবে না কেন ? সে ব্যবস্থা করতেই হবে।

নিজেদেরকে দরিদ্র ভেবো না ; অর্থই শক্তি নয়, শক্তি সততা, পবিত্রতা। এসে দেখো, বিশ্বের সর্বত্রই তাই।

আশীর্বাদান্তে
তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনশ্চঃ, ও ভাল কথা, তোমার কাকার রচনার মতো অদ্ভুত জিনিস আমি জীবনে দেখিনি। এটা একটা দোকানদারের ফর্দের মতো, তাই মহাসভার পাঠের যোগ্য মনে হয়নি। সুতরাং নরসিংহাচার্য পাশের একটা হলঘরে এর অংশ বিশেষ পাঠ করে আর কেউই তার একবর্ণও বুঝতে পারেনি। এ বিষয়ে ওকে কিছু বলো না। বিস্তর চিন্তাভাবনাকে সংক্ষেপে অল্প কথায় প্রকাশ করা একটা বিরাট পারদর্শিতা। এমন কি মণিলাল দ্বিবেদীর রচনাও কেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছিল। সহস্রাধিক রচনা পাঠ করা হয়, কাজেই ও রকম অসংলগ্ন ভাষণ দেবার কোন অবসরই ছিল না। আমাকে অবশ্য নির্ধারিত আধঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশী সময় দেওয়া হয়েছিল,… কারণ শ্রোতাদের আটকে রাখার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় বক্তাদের সব শেষে বলতে দেওয়া হয়। এতো সহানুভূতি, এতো ধৈর্য যাদের ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন। বেলা দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তারা বসে থাকত—মাঝে কেবল খাবার জন্য আধ ঘণ্টা বিরতি আর একটার পর একটা রচনা পাঠ হয়ে চলছে যার বেশীর ভাগই অত্যন্ত গতানুগতিক ; তারা কিন্তু বসেই রয়েছে শুধু তাদের প্রিয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনবে বলে।

সিংহলের ধর্মপাল ছিলেন অন্যতম প্রিয় বক্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না। তাঁর বক্তৃতা কেবল ম্যাকস্ মূলার ও রিস ডেভিসের উদ্ধৃতিতে পূর্ণ। তিনি বড় মধুর স্বভাবের মানুষ। মহাসভার অধিবেশনের সময় আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়।

শ্রীমতী সোরাবজী নামে পুনার এক খ্রীষ্টান মহিলা আর জৈনদের প্রতিনিধি শ্রীগান্ধী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বক্তৃতা দেবেন বলে কিছুদিন এদেশে থাকবেন। বক্তৃতা দেওয়া এদেশে বেশ লাভজনক পেশা, আর মাঝে মাঝে তো বেশ ভাল পয়সা পাওয়া যায়।

মিস্টার ইংগারসোল এক একটা বক্তৃতা দিয়ে পাঁচশ থেকে ছ'শ ডলার পান। এদেশে তিনি সবচেয়ে নামকরা বক্তা। এই চিঠি প্রকাশ করো না। পড়া হয়ে গেলে খেতড়ির মহারাজাকে পাঠিয়ে দিও। তাঁকে আমার আমেরিকার ছবি পাঠিয়েছি।

বি

[৪৬]

ইউ. এস. এ.
২ মে, ১৮৯৫

প্রিয় স—,

তাহলে তুমি মনস্থির করেই ফেললে—এই পৃথিবী পরিত্যাগ করবে। তোমার ইচ্ছার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। আত্ম-অস্বীকৃতির ন্যায় এত উচ্চ গুণ আর কিছু নেই। কিন্তু তোমার একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যারা তোমার ওপর নির্ভর করে আছে তাদের কল্যাণে তোমার প্রিয় বাসনা পরিহার করা খুব সামান্য আত্মত্যাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণর নিখাদ শুদ্ধ জীবন ও শিক্ষাকে অনুসরণ কর এবং তোমার পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্নবান হও। তুমি তোমার নিজের কর্তব্য পালন কর, বাকী সব তাঁর উপর ছেড়ে দাও।

প্রেম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে না, ভেদাভেদ করে না আর্য ও ম্লেচ্ছর মধ্যে, ব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজের মধ্যে, এমন কি নারী ও পুরুষের মধ্যেও ভেদাভেদ করে না। প্রেম সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই আপন গৃহে রূপান্তরিত করে। সত্য প্রগতি ধীরগামী কিন্তু অমোঘ। সেই তরুণদের মধ্যেই কাজ করবে যারা মন প্রাণ নিয়োগ করতে পারবে একটি কর্তব্য পালনে—যে কর্তব্য হল ভারতের সর্বসাধারণকে উন্নীত করে তোলা। তাদের জাগিয়ে তোল, ঐক্যবদ্ধ কর, ত্যাগের মন্ত্রে তাদের অনুপ্রাণিত করে তোল; ভারতের তরুণ সমাজের উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

আজ্ঞানুবর্তিতার গুণ অভ্যাস কর, কিন্তু তোমার নিজের বিশ্বাস ত্যাগ কোরো না। শ্রেয়র আজ্ঞানুবর্তিতা না থাকলে কেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র শক্তিগুলির কেন্দ্রীকরণ ব্যতীত কোনো মহৎ কাজ করা যায় না। কলকাতার মঠই প্রধান কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের নিয়ম অনুসারে অন্য সকল শাখাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

ঈর্ষা এবং অহঙ্কার ত্যাগ কর। অপরের জন্য একত্রে কাজ করতে শেখ। আমাদের দেশের পক্ষে তারই বড় প্রয়োজন।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৭]

ইউ. এস. এ.
৬ মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

আজ সকালে তোমার সর্বশেষ পত্র এবং রামানুজাচার্যর ভাষ্যের প্রথম খণ্ডটি পেয়েছি। দিন কয়েক আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছি। একখানা পত্র মিঃ মণি আয়ারের কাছ থেকেও পেয়েছি। আমার চলছে ভালোই, সেই পুরানো

ধারাতেই চলছি। তুমি মিঃ লাণ্ডের লেকচারের কথা উল্লেখ করেছ। তিনি কে এবং কোথায় আছেন আমি তা জানি না। হয়ত এমন কেউ যিনি গীর্জায় গীর্জায় লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছেন; প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তৃতা করলে আমরা শুনতে পেতাম। সম্ভবতঃ তিনি তার বক্তৃতা কোনো কোনো সংবাদপত্রে ছাপাবার ব্যবস্থা করেন এবং তা ভারতে পাঠিয়ে দেন। আর মিশনারীরা হয়ত তা দিয়ে বাণিজ্য করে। তোমার পত্রের সুর থেকে আমি তো এইটুকুই আন্দাজ করতে পারছি। ব্যাপারটা এমন কিছু প্রকাশ্যে নয় যে আমাদের এখুনি আত্মরক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে। ওরকম হলে তো আমাকে প্রতিদিন শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে। এখন আকাশে বাতাসে ভারতের কথা, গোঁড়াপন্থীরা ডাঃ বারোজ সমেত সবাই আগুন নিভিয়ে দেবার কঠোর সংগ্রাম করছেন। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিরুদ্ধে গোঁড়াপন্থীদের বক্তৃতার প্রত্যেকটিতে নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে প্রচুর গালমন্দ থাকে। এইসব গোঁড়া নারী ও পুরুষ আমার বিরুদ্ধে যে সব নোংরা গল্প ছড়িয়ে বেড়ায় তা শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে। তুমি কি বলতে চাও যে এইসব আত্মসর্বস্ব নারী ও পুরুষের বর্বর ও কাপুরুষ আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সন্ন্যাসীকে আত্মপক্ষ সমর্থনে দাঁড়াতে হবে? এখানে আমার বেশ কিছু অতি প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, তাঁরাই মাঝে মাঝে ওদের শোধ তোলেন। তাছাড়া, হিন্দুরা যদি সবাই ঘুমিয়েই থাকে তবে আমিই বা হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আমার শক্তি অপচয় করব কেন? তোমরা ত্রিশ কোটি লোক, বিশেষত যারা নিজেদের শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি নিয়ে খুব গর্বিত তারা, ওখানে বসে কি করছ? লড়াইয়ের কাজটা তোমরাই নাও না কেন, আর আমাকে শিক্ষা ও প্রচারের কাজে ছেড়ে দাও না কেন? এখানে দিন রাত্রি আমি সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মধ্যে কঠোর শ্রমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।...ভারত কোন সাহায্যটা পাঠায়? ভারতীয়দের চেয়ে দেশপ্রেম কম এমন কোনো জাতি কি পৃথিবীতে আর দেখা গেছে? ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচার চালাবার জন্য বেশ শক্ত সমর্থ সুশিক্ষিত দশ বারো জন লোককে পাঠিয়ে বছর কয়েক তাদের ভরণ পোষণ চালাতে পার তাহলে আত্মিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই ভারতের বিরাট উপকার করতে পারবে। ভারতের প্রতি আত্মিক সহানুভূতি সম্পন্ন প্রতিটি লোক অচিরে তার রাজনৈতিক বন্ধু হয়ে উঠবেন। পশ্চিম দেশে অনেকেই তোমাদের মনে করে অর্ধ-নগ্ন বর্বরের জাত, কাজেই চাবকে তোমাদের সভ্যতার পথে নিয়ে আসা যেতে পারে বলে তাদের ধারণা। তোমরা ত্রিশ কোটি লোক যদি সামান্য কয়েকজন মিশনারীর ভয়ে কাবু হয়ে থাকতে পার—ভীরু কাপুরুষ সব—তাহলে দূর দেশে বসে একজন লোক কি করতে পারে? এমন কি আমি যতটুকু করেছি তোমরা তারও যোগ্য নও।

আত্মপক্ষ সমর্থন করে তোমরা আমেরিকার কাগজে পত্রে প্রবন্ধ পাঠাও না কেন? বাধাটা কিসের? একটা কাপুরুষের জাত তোমরা, দৈহিক মানসিক আত্মিক কাপুরুষতায় ভরা একটা জাত! তোমরা জানোয়ারের মতো আচরণেরই উপযুক্ত, তোমরা বোঝ শুধু দুটি জিনিস—অর্থ এবং লালসা—তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে সতত

সংগ্রামের জীবনে ঠেলে দিতে চাও, তোমরা 'সাহেব লোগদের' ভয়ে, এমন কি মিশনারীদের ভয়েও ভীত! আর তোমরাই কিনা বড় বড় কাজ করবে, ছোঃ! তোমাদের মধ্যে কেউ একজন নিজেদের পক্ষের বক্তব্য দিয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বোস্টনের 'এরিনা পাবলিশিং কোম্পানী'তে পাঠিয়ে দাও না কেন? "এরিনা" এমন একখানা সাময়িক পত্র যা তোমাদের বক্তব্য সানন্দে ছাপবে, চাই কি ওই বাবদে তোমাদের মোটা টাকাও সম্ভবত দেবে। আপাততঃ এই পর্যন্ত। বোকামিতে টলে পড়বার সময় এই কথাটা ভেবো। মনে কোরো এই কথাটা যে আজ পর্যন্ত যে কটি পাজী হিন্দু পশ্চিমী দেশে এসেছে সেই আপন মত বিশ্বাসকে এবং আপন দেশকে গালি দিয়েছে অর্থ ও প্রশংসা পাবার লোভে। তুমি জান আমি এখানে নাম যশ কুড়োতে আসিনি; আমাকে আসতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আমি ভারতে ফিরে যাব কেন? কে আমাকে সাহায্য করবে?···তোমরা ছেলেমানুষ, কী আবোল তাবোল বকছ তা তোমরা জান না। মাদ্রাজে এমন লোক কোথায় যারা ধর্ম প্রচারের স্বার্থে পৃথিবীও ত্যাগ করতে পারে? বিষয়বোধ এবং ঈশ্বরোপলব্ধি একই সঙ্গে চলে না। আমিই একমাত্র লোক যে তার দেশের পক্ষ সমর্থন করতে সাহসী হয়েছে, বিদেশে এমন কিছু আইডিয়া দিয়েছে যা কেউ একজন হিন্দুর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে নি। অনেকে আছে আমার বিরোধী, কিন্তু আমি তোমাদের মতো কাপুরুষ হব না কখনো। এ দেশে এমন হাজার হাজার লোকও আছে যারা আমার বন্ধু, শত শত এমন লোকও আছে যারা মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করবে; এদের সংখ্যা বছরে বছরে বাড়বে, আমি যদি তাদের সঙ্গে থেকে তাদের নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে আমার জীবনের এবং ধর্মের পূর্ণতা লাভ হবে। বুঝতে পারছ?

আমেরিকায় এক সার্বজনীন মন্দির নির্মাণের কথা ছিল, তার কথা এখন আর বেশী শুনতে পাই না; কিন্তু নিউ ইয়র্কে, আমেরিকার জীবন কেন্দ্রে আমার একটি দৃঢ় বনিয়াদ তৈরী হয়েছে, অতএব আমার কাজ চলবেই। আমার কয়েকজন শিষ্য নিয়ে গ্রীষ্মকালীন এক নির্জন আবাসে যাচ্ছি, যোগ ভক্তি এবং জ্ঞান বিষয়ে সেখানে তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করব, তারপর তারা আমার কাজ চালিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারবে। এবার বৎস তোমরা কাজে লাগো।

মাস খানেকের মধ্যে কাগজের জন্য কিছু টাকা পাঠাতে পারব। হিন্দু ভিখিরিদের কাছে ভিক্ষা মেগে বেড়িয়ো না। আমি ও কাজটা একাই করতে পারব আমার মগজের জোরে আর আমার শক্ত ডান হাতখানার জোরে। এখানে বা ভারতে কোনো লোকের কাছ থেকে আমি সাহায্য চাই না।···রামকৃষ্ণ অবতার নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।

এখন তোমাদের বলব আমার আবিষ্কারের কথা। ধর্মের সামগ্রিকতা নিহিত আছে বেদান্তের মধ্যে, বেদান্ত দর্শনের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে; এই তিনটি পর্যায় হল: দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—একটির পর আর একটি করে। মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে এই তিন পর্যায়ে। প্রত্যেকটি পর্যায়ই দরকারী। ধর্মের সার কথা এই: ভারতের নানা জাতিগত প্রথা ও মতবিশ্বাসের মধ্যে প্রযুক্ত বেদান্তই হল

হিন্দুধর্ম। প্রথম পর্যায়ের দ্বৈতবাদ ইউরোপের জাতিগোষ্ঠীর ভাবধারার মধ্যে রূপ পেয়েছে যার মধ্যে তার নাম ক্রিশ্চিয়ানিটি; শেষোৎপন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে তার প্রকারের নাম মহামেডানিজম। যোগ-কল্পমূর্তির মধ্যে প্রযুক্ত অদ্বৈতবাদের নাম বুদ্ধিজম, ইত্যাদি। ধর্ম মানেই বেদান্ত; তার প্রয়োগে পার্থক্য থাকবেই—বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শিক এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেই পার্থক্যের প্রকার ভেদ ঘটে। দেখতে পাবে, একই দর্শন হওয়া সত্ত্বেও শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতিরা তাদের নিজ নিজ পদ্ধতি ও প্রকার অনুযায়ী তা প্রয়োগ করে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন পর্যায় ব্যবস্থা নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে যাও, তাদের মধ্যে ক্রমানুসারী সামঞ্জস্যটি দেখাও, কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছুমাত্র উল্লেখ কোরো না। অর্থাৎ দর্শনটি প্রচার কর, আধ্যাত্মিক অংশটিই ব্যাখ্যা কর, লোকেরা তাকে আপন আপন প্রকার-পদ্ধতি অনুসারে মানিয়ে নিক। এই বিষয়ে আমি একখানা বই লিখতে চাই, ভাই তিনটি ভাষ্য চেয়ে পাঠিয়েছি; কিন্তু এখন পর্যন্ত রামানুজ (ভাষ্য)-এর একটি খণ্ড মাত্র আমার কাছে এসে পৌছেছে।

আমেরিকার থিয়সফিস্টরা অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এখন তারা ভারতকে খুব ঘৃণা করে। বেচারীরা! ইংল্যাণ্ডের স্টার্ডি সম্প্রতি ভারতে গিয়েছিল, সেখানে আমার গুরুভাই শিবানন্দর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে; সে আমাকে এক চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে আমি কবে ইংল্যাণ্ড যাব। আমি তাকে একখানা সুন্দর পত্র দিয়েছি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কী? তাঁর কাছ থেকে আর কোনো চিঠিপত্র পাই না। মিশনারীদের এবং অন্যান্যদের যা প্রাপ্য তা দিয়ো। আমাদের যে সব বেশ শক্ত সমর্থ লোকজন আছে তাদের কাউকে দিয়ে একটি সুন্দর জোরালো অথচ সুললিত প্রবন্ধ লেখাও ভারতের বর্তমান ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন বিষয়ে, তারপর সেটি কোনো এক আমেরিকান ম্যাগাজিনে পাঠিয়ে দাও। আমি ওরকম একটি কি দুটি মাত্রকে জানি। তুমি ত জান আমি তেমন কিছু একজন লেখক নই। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াবার অভ্যাস আমার নেই। আমার স্বভাব হল চুপচাপ বসে থাকা, সব কিছু আমার কাছে আসবে সেজন্য অপেক্ষা করা।…জান বৎস, আমি যদি বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন একটা ভণ্ড হতাম তাহলে সংগঠনের দৌলতে এখানে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে নিতে পারতাম। হায়! এখানে ধর্ম মানেই ও সব। অর্থ ও নাম=পাদ্রী, অর্থ ও লালসা=সাধারণ লোক। আমাকে এখানে মানুষের এক নতুন ধর্ম আচরণ সৃষ্টি করতে হবে, যে মানুষ ভগবানে আন্তরিক বিশ্বাস রাখবে এবং পার্থিব কোনো বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবে না। এ কাজ ধীরগতি, অতি ধীরে ধীরে চলবে। ইতিমধ্যে তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও, আমি সোজা আমার তরী বেয়ে নেব। জার্নালটি যেন লঘু না হয়, যেন তা ধীর প্রশান্ত হয়, এবং সুর উচ্চ গ্রামে বাধা থাকে।… একদল ভালো স্থির স্বভাবের লেখক গোষ্ঠী তৈরী কর।…পরিপূর্ণ স্বার্থবোধশূন্য হও, অটল থাক, আর কাজ করে যাও। আমরা বহু মহৎ কাজ সাধন করব, ভয় কোরো না।…আর একটি কথা। সকলের সেবক হও, অন্যকে শাসন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা কোরো না। ওরকম করলে ঈর্ষা জাগবে এবং তাহলেই সব ধ্বংস

হয়ে যাবে।··· কাজ চালিয়ে যাও। তোমরা ইতিমধ্যে খুবই ভালো কাজ করেছ। আমরা সাহায্যের জন্য বসে থাকি না, আমরা সব ব্যবস্থা নিজেরা করে নিই; বৎস, আত্ম নির্ভরশীল হও, বিশ্বস্ত হও এবং ধৈর্যশীল হও। আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের চটিয়ে দিওনা, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলবে। সকলকে আমার অফুরন্ত ভালোবাসা জানাই।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,
নিজেকে নেতা বলে জাহির করলে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না।··· সাফল্য লাভ করতে চাও যদি তবে অহং হত্যা কর।

বি

[১৮]

নিউ ইয়র্ক
১৪ মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

···এখন নিউ ইয়র্কে আমি একটি ভিৎ পেয়েছি, আশা করছি স্থায়ী একদল কর্মী পাব যারা আমার এদেশ ছেড়ে যাবার পরেও কাজ চালিয়ে যাবে। দেখছ ত' বৎস, সংবাদপত্রের ঐ সব প্রাচর কিছুই না? যখন যাব তখন পশ্চাতে একটি স্থায়ী ফলশ্রুতি রেখে যাওয়া চাই। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তা শীঘ্রই হতে চলেছে।··· পৃথিবীর যাবতীয় অর্থ সম্পদের চেয়েও মানুষই বেশী মূল্যবান।

আমার জন্য ভেবো না। প্রভু সর্বদা আমাকে রক্ষা করছেন। আমার এদেশে আসা এবং এই আমার সমস্ত মেহনত বৃথা হতেই পারে না।

প্রভু করুণাময়; এমন অনেকেই আছে যারা যে কোনো প্রকারে আমার ক্ষতি করতে চায়, কিন্তু আরো অনেকে আছে যারা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে মিত্রতা রেখে চলবে। সৎ কাজে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি হল অফুরন্ত ধৈর্য, অসামান্য শুদ্ধতা, এবং অপরিসীম অধ্যবসায়।

অশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৯]

(মিঃ এফ. লেগেটকে লেখা)

C/o মিস ডুচের
থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্ক
এন. ওয়াই
১৮ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

মিসেস স্টার্জেস যেদিন চলে গেলেন তার আগের দিন তাঁরই একখানা চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে, সঙ্গে ৫০ ডলারের একখানা চেক। পরদিনই প্রাপ্তি স্বীকার করে তাঁকে জানানো অসম্ভব ছিল; তাই আপনার কাছে এই সুযোগে একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি—আপনি দয়া করে আমার হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন, তাঁর কাছে পরবর্তী পত্রে আমার হয়ে ঐ প্রাপ্তি স্বীকারটুকুও করে দেবেন।

এখানে আমাদের সময়টা বেশ ভালোই যাচ্ছে, খালি একটি ব্যতিক্রম; সেই যে হিন্দু প্রবাদে বলেছে, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" আমাকে ঠিক একরকমই কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আগস্ট মাসের গোড়ায় আমি চিকাগো যাচ্ছি। আপনি রওয়ানা হচ্ছেন কবে?

এখানে আমাদের সকল বন্ধু আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছে। আপনার সুখ শান্তি স্বাস্থ্য কামনা করি।

আপনার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৫০]

১৯ ডব্লু ৩৮ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২২ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় কিডি,

এক লাইনের বদলে একখানা পুরো চিঠিই তোমাকে লিখব। তোমার উন্নতি হচ্ছে শুনে খুশী হলাম। আমি ভারতে ফিরব না ভেবে থাকলে ভুল করেছ; শীঘ্রই আসছি। আমি ব্যর্থতার কাছে হার মানি না। এখানে একটি বীজ বপন করেছি, তা গাছ হবে, হবেই। আমার শুধু ভয়, অতি শীঘ্র যদি তা ছেড়ে দিই তবে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হবে।...

বৎস, কাজ করে যাও। রোম একদিনেই তৈরী হয় নি। আমি পরিচালিত হচ্ছি প্রভুর ইচ্ছায়, সুতরাং পরিণামে সব কিছু ঠিক হবেই।

তোমার প্রতি আমার অক্ষয় ভালোবাসা।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫১]

ইউ. এস. এ.
১ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

রামশদের আলোকচিত্র এবং তোমার মিশনারী পুস্তক পেয়েছি। মহীশূরের রাজা এবং দেওয়ানকে পত্র দিয়েছি। মিশনারী পুস্তিকাটি এখানে অনেক আগেই নিশ্চয় পৌঁছেছে, কেননা মনে হচ্ছে ওর মধ্যে ডাঃ জেনসের সঙ্গে রামাবাই চক্রের বিতর্কের আভাস রয়েছে। তোমার কোনো কিছুতেই ভয় পাবার কারণ নেই। ঐ পুস্তিকায় একটি ভুল কথা আছে। এই দেশে কখনোই কোনো বড় হোটেলে আমি যাই নি, অন্য দেশেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে, অজ্ঞতার কারণেই, ছোট হোটেলগুলিতে কালো আদমিকে নেবেই না, কালো হলেই ওরা তাকে নিগ্রো মনে করে। কাজে কাজেই আমার আশ্রয়দাতা ডাঃ ক্রম্যান আমাকে একটি বৃহত্তর হোটেলে নিয়ে যান, তার কারণ ওরা জানত নিগ্রো আর একজন বিদেশীর মধ্যে পার্থক্যটা কী। তোমাকে বলি আলাসিংগা, তোমাদের পক্ষ সমর্থন তোমাদেরই করতে হবে। কেন শুধু শুধু শিশুর ন্যায় ব্যবহার করছ? যদি কেউ তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে তবে তার পক্ষ তোমরা সমর্থন করতে পার না কেন? আমার জন্য তোমাকে ভয় পেতে হবে না, এখানে শত্রুর চেয়ে আমার বন্ধু বেশী, এই দেশে এক তৃতীয়াংশ ক্রিশ্চিয়ান, আর অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকই মিশনারীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে থাকে। আবার মিশনারীরা যেহেতু সবকিছুরই বিরুদ্ধে, তাই শিক্ষিতরা সেই সবকিছু পছন্দও করে থাকে। ওরা বর্তমানে আর আগের মতো শক্তিশালী নয়, প্রতিদিন সেই শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। তাদের আক্রমণে যদি ব্যথা পাও তবে খিটখিটে শিশুর ন্যায় ব্যবহার কর কেন? কেন আমার কাছে সব হাজির কর?...কাপুরুষতা কোনো গুণ নয়।

এখানে ইতিপূর্বেই আমি অনুগামী পেয়েছি মোটামুটি ভালোই। আগামী বছর এদের সংগঠিত করব কাজের ভিত্তিতে, তারপর কাজ চলতে থাকবে। এর পর যখন আমি ভারতে ফিরে যাব তখনো এখানে আমার সমর্থক অনেক বন্ধু থাকবে, তারা আমাকে ভারতেও সাহায্য করবে। তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

মিশনারীদের আক্রমণ প্রয়াস দেখে যতক্ষণ তোমরা চীৎকার চেঁচামেচি করবে, আর কিছু করতে না পেরে কেবল লাফালাফি করবে ততক্ষণ আমি তোমাদের বিদ্রূপ করতেই থাকব; তোমরা নিতান্ত কচি খোকা ছাড়া আর কিছু নও।·· বুড়ো খোকাদের জন্য স্বামী আর কী করতে পারে !!···

জানি বৎস জানি, আমাকে এসে তোমাদের গড়ে পিটে মানুষ বানাতে হবে। জানি ভারত শুধু নারী আর নপুংসকে অধ্যুষিত। কাজে কাজেই অস্থির হয়ো না। ওখানে কাজ করতে হলে আমার রসদ সংগ্রহ করা চাই। আমি কতগুলি জড়বুদ্ধি লোকের হাতে গিয়ে পড়তে চাই না। তোমাদের ভাবিত হবার কারণ নেই, তোমরা যত সামান্যই পার করে যাও। আমাকে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একলাই সবটা করতে হবে।·· "কাপুরুষেরা এই আত্মার সমীপবর্তী হতে পারে না।" আমার জন্য তোমাদের ভীত হবার প্রয়োজন নেই। প্রভু আছেন আমার সঙ্গে, তোমরা শুধু যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে সক্ষম সেইটি আমাকে দেখাও। তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব। কে আমার সম্পর্কে কী বলল তাই নিয়ে আমাকে আর জ্বালাতন করো না। কোন মূর্খ আমার কী বিচার করবে তার জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে নেই। তোমরা খোকারা জান না, মহৎ ধৈর্য, মহৎ সাহস এবং মহৎ প্রয়াসের দ্বারাই মহৎ সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়।···আমার মনে হয় কিডির মন মাঝে মাঝেই ডিগবাজি খাচ্ছে।···

মহৎ কাজ সাহসী পুরুষের দ্বারাই সম্ভব, কাপুরুষদের দ্বারা নয়। তোমরা যারা অবিশ্বাসী তারা বরাবরের জন্য জেনে নাও, আমি প্রভুর হস্তেই সমর্পিত। যতক্ষণ আমি শুদ্ধ থাকব, তাঁর সেবক থাকব ততক্ষণ কেউ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।···দেশ ও জাতির জন্য কিছু একটা কর, তারা তাহলে তোমাদের সাহায্য করবে, দেশ ও জাতি তখন তোমাদের দিকেই থাকবে। সাহসী হও, সাহসে নির্ভর কর! মানুষ তো একবারই মরে। আমার শিষ্যরা যেন কখনো কাপুরুষ না হয়।

ভালোবাসা সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫২]

(মিসেস উইলিয়াম স্টার্জেসকে লেখা)

থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্ক
২৯ (জুলাই ?), ১৮৯৫

মা,

আপনার সময় শুভ হোক, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ৫০ ডলার পাঠিয়েছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ; টাকাটা অনেক কাজে লেগেছে।

এখানে আমাদের বেশ ভালোই কাটছে। সেই ডেট্রয়েট থেকে দুজন মহিলা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। তারা অতি শুদ্ধাচারী এবং অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। আমি থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড থেকে ডেট্রয়েট এবং সেখান থেকে চিকাগো যাচ্ছি।

নিউ ইয়র্কে আমাদের ক্লাশ চলছে, আমি উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও ওরা খুব সাহসের সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেছে।

ভালো কথা, ডেট্রয়েট থেকে যে দুজন মহিলা এসেছেন তারাও ক্লাসে ছিলেন, দুঃখের বিষয় তারা শয়তানের বাচ্ছা দেখে বেজায় ভয় পেয়েছেন। তাদের বলা হয়েছিল ফুটন্ত অ্যালকোহলে ছিটেমাত্র নুন ছেড়ে দিতে, তাতে যদি দেখা যায় যে কালো কালো কিছু থিতিয়ে আছে তাহলেই বুঝতে হবে ভেজাল আছে আর সেই ভেজালই শয়তানের বাচ্ছা। দুজনে অতিরিক্ত ভয়ই পেয়েছিলেন। বলা হয় যে এই শয়তানের বাচ্চা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে আছে। আপনার অনুপস্থিতিতে দাদার লেগেট নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে আছেন, তার কাছ থেকে এ পর্যন্ত কোনো সংবাদ পাইনি। অবশ্য দুঃখের গতি বইতে দেওয়া ভালো, সেই হেতু আমি আর তাঁকে বিরক্ত করি না।

সমুদ্রে আণ্ট জো জো-র সময়টা নিশ্চয় খুব খারাপ যাচ্ছে। অবশ্য সব ভালো যার শেষ ভালো।

খুকীরা জার্মানীতে নিশ্চয় ফূর্তিতে আছে। [হলিস্টার ও আলবার্টা] তাদের প্রতি আমার জাহাজভর্তি ভালোবাসা।

এখানকার আমরা সকলে আপনাকে ভালোবাসা জানাই; আপনার জীবন যেন আগামী বহু পুরুষের মানুষের কাছে আলোকবর্তিকার ন্যায় হয় সেই প্রার্থনা করি।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

[৫৩]

(মিসেস বেটী স্টার্জেসকে লেখা)

C/o মিস ডুচার
থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্ক
জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় মাতা,

ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয় নিউ ইয়র্কে এসেছেন, আশা করি এখন গরমটা ওখানে খুব বেশী নয়।

এখানে আমাদের দারুণ ভালো কাটছে। ম্যারী লুইস কাল এসেছে। এ পর্যন্ত যারা এল তাদের ধরে এখন এখানে আমরা সাতজন আছি।

সারা পৃথিবীর ঘুম যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। দিনের বেলা অন্ততঃ দু ঘণ্টা ঘুমুই, আর রাত্রিতে ত' সর্বক্ষণ একটা কাষ্ঠখণ্ডের মতো ঘুমিয়ে পড়ে থাকি। মনে

হয়, এ হল নিউ ইয়র্কের সেই নিদ্রাহীনতার প্রতিক্রিয়া। একটু আধটু লেখাপড়া সকালে করছি, আর প্রতি সকালে প্রাতরাশের পর একটি ক্লাস নিচ্ছি। আহারাদি একেবারে নিরামিষ, বেশ খানিকটা করে উপবাসও করছি।

সঙ্কল্প করেছি, যাবার আগে কয়েক পাউণ্ড মেদ কমিয়ে ফেলবই। এই জায়গাটা মেথডিস্টদের, এখানে অগস্ট মাসে তাদের ক্যাম্প মিটিং বসবে। জায়গাটি অতি মনোরম, কিন্তু আমার আশঙ্কা মরশুমের সময় এখানে খুব ভীড় হয়ে যাবে।

আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যে জো জো-র মাছি-কামড়ানো অসুখটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। মা·· কোথায়? এর পর তাঁর কাছে চিঠি লিখলে তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন।

পারসিতে যে সময়টা খুব আমোদে কেটেছে তার কথা সর্বদাই আমার মনে পড়ে, আর সেজন্য সব সময় আমি মিঃ লেগেটকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর সঙ্গে আমি ইউরোপে যেতে সক্ষম হব। এরপর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে আমার অফুরন্ত ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তাঁর ন্যায় লোকের প্রেমেই পৃথিবী উৎকৃষ্টতর হয়ে উঠে।

আপনি কি আপনার সেই বন্ধু, মিসেস ডোরার (মস্ত একটি জার্মান নাম) সঙ্গে রয়েছেন? তিনি অত্যন্ত মহৎ হৃদয়া, প্রকৃতই মহাত্মা। তাঁকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানাবেন।

আমি এখন একটি অদ্ভুত নিদ্রালু মন্থর সুখী মেজাজে রয়েছি, খুব যে খারাপ লাগছে তা নয়। ম্যারী লুইস নিউ ইয়র্ক থেকে একটি ছোট কচ্ছপ নিয়ে এসেছিল, তার প্রিয়পাত্র সেটি। এখানে এসে সেটি তার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পেয়ে আপন স্বভাবও ফিরে পেয়েছে। তারপর দেখা গেল বহু অধ্যবসায়ে গড়াগড়ি করে বহু ওলট পালট খেয়ে সে ম্যারী লুইসের আদর-সোহাগকে ফেলে চলে গেছে। ম্যারী প্রথমটায় দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু এমন প্রবলভাবে আমরা স্বাধীনতার গুণ ব্যাখ্যা করলাম যে তার ফলে তাকে খুব তাড়াতাড়িই সামলে উঠতে হয়েছে।

ঈশ্বর আপনার এবং আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন, এই আমার সতত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

জো জো বার্চ গাছের বাকলের বইখানা পাঠায় নি। আমি যেখানা পাঠিয়েছিলাম তা পেয়ে মিসেস বুল অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।

ভারত থেকে অনেকগুলি সুন্দর চিঠি এসেছে। সেখানে সব ঠিক আছে। অপর দিকে খোকাখুকুদের—"পরদেশগত প্রকৃত নিষ্পাপ শিশুদের" আমার ভালোবাসা জানাবেন।

বি

[৫৪]

(মিঃ এফ লেগেটকে লেখা)

C/o মিস ডুচার
থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্ক, এন. ওয়াই
৭ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

নিউ ইয়র্ক আপনার খুবই ভালো লাগছে দেখছি। পত্রাঘাতে আপনার এই ভাবাচ্ছন্নতা ভেঙে দিলাম বলে মাফ করবেন।

মিস ম্যাকলয়েড এবং মিসেস স্টার্জেসের কাছ থেকে দুখানা সুন্দর পত্র পেয়েছি। তারা সুন্দর দুখানা বার্চ বাকলের বইও পাঠিয়েছে। আমি সংস্কৃত পাঠ এবং অনুবাদ দিয়ে তা ভরতি করে দিয়েছি, আজ ডাকে তা পাঠিয়ে দেব।

শুনছি, মিসেস ভোরা [মিসেস ভোরা রথস্লেসবার্গার, একজন রহস্য-বিশ্বাসী ; মিস ম্যাকলয়েড এবং মিসেস স্টার্জেসকে তিনিই স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন] মহাত্মা ঢংয়ে কিছু চমকপ্রদ খেলা দেখাচ্ছেন।

পারসি [নিউ হ্যাম্পশায়ারে মিঃ লেগেটের ক্যাম্প। ওখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্কে গিয়েছিলেন] থেকে বেরুবার পর থেকে আমি অপ্রত্যাশিত নানাস্থান থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছি লণ্ডনে আসবার, লণ্ডনে আসবার জন্য আমারও আগ্রহ প্রচুর।

লণ্ডনে কাজ করবার এই সুযোগ আমি হারাতে চাই না। আপনার আমন্ত্রণ, তার সঙ্গে আবার লণ্ডনের আমন্ত্রণ আসলে অধিকতর কাজে দেবতার আহ্বান—সে আমি জানি।

এই সারা মাসটা এখানে থাকব, শুধু অগস্ট মাসের কোনো এক সময় দিন কয়েকের জন্য আমায় চিকাগো যেতে হবে।

অস্থির হবেন না ফাদার লেগেট ; প্রেম সম্পর্কে যখন নিশ্চিত তখন এইটি তো প্রত্যাশার শ্রেষ্ঠ সময়।

ঈশ্বর চিরকাল আপনার কল্যাণ করুন, সর্বসুখ আপনারই হোক চিরকাল, আপনি তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

স্নেহপ্রেম বদ্ধ আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৫৫]

(খেতড়ীর মহারাজাকে লেখা)

ইউ. এস. এ
৯ জুলাই, ১৮৯৫

…আমার ভারতে ফিরে আসার প্রসঙ্গ : ব্যাপারটা, আপনাকে বলি—মহাশয়, আপনি ভালোই জানেন, আমার অধ্যবসায় অটল। এই দেশে আমি একটি বীজ বপন করেছি; তা থেকে একটি চারা হয়েছে, খুব শীঘ্রই তা বৃক্ষে পরিণত হবে আশা করি। আমার কয়েকশত অনুগামী আছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী এখানে তৈরী করব। তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে আমি ভারতে ফিরে যাব। খ্রীস্টান পাদ্রীরা যত বেশী বিরোধিতা করবে তত বেশী আমার দৃঢ়তা দেখা দেবে—এ দেশে আমি একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবই। ··ইতিপূর্বেই লণ্ডনে আমার কিছু সংখ্যক বন্ধু পাওয়া গেছে। অগস্ট মাসের শেষভাগে আমি যাচ্ছি সেখানে।…যে করেই হোক শীতকালটা ত' অংশত লণ্ডনে অংশত নিউ ইয়র্কে কাটাতে হবে। তারপর ভারতে যেতে পারব বলে মনে হয়। প্রভু যদি দয়া করেন তবে এখানে এই শীত ঋতুর পরে কাজ চালাবার জন্য অনেক লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি কাজকেই তিনটি স্তর পার হয়ে চলতে হবে: হাসি মস্করা, প্রত্যক্ষ বিরোধিতা, তারপর স্বীকৃতি। যে লোকই তার সময় সীমার চেয়ে অগ্রদৃষ্টি সম্পন্ন হবে তাকে অন্যরা ভুল বুঝবেই। অতএব বিরোধিতা এবং নির্যাতন আসে আসুক, আমাকে শুধু স্থিরচিত্ত এবং শুদ্ধমনা হয়ে থাকতে হবে, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস রাখতে হবে, তাহলেই ঐসব বিলীন হয়ে যাবে।…

বিবেকানন্দ

[৫৬]

(ফ্রান্সিস লেগেটকে লেখা)

C/o মিস ডুচার
থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্ক, এন. ওয়াই.
৩১ জুলাই, ৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

এর আগে আপনাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু তা ঠিক ঠিক ডাকে দেওয়া হয়নি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তাই আর একখানা চিঠি লিখছি।

১৪ তারিখের আগে আমি যথাসময়ে হাজির থাকব। যেভাবে হোক ১১ তারিখের পূর্বে আমাকে নিউ ইয়র্কে আসতেই হবে। অতএব তৈরী হয়ে নেবার সময় যথেষ্টই পাওয়া যাবে।

আমি আপনার সঙ্গে প্যারিসে যাব। আপনার সঙ্গে আমার যাবার প্রধান উদ্দেশ্যই হল আপনার বিবাহে উপস্থিত থাকা। তারপর আপনি যখন সফরে বেরিয়ে যাবেন তখন আমি যাব লণ্ডনে। এই ব্যবস্থা।

আপনার প্রতি এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমার চিরস্থায়ী ভালোবাসা ও আশীর্বাদের পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

আপনার সন্তানসম
বিবেকানন্দ

[৫৭]

ইউ. এস. এ.
অগস্ট, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

এই চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছুবে আমি তখন প্যারিসে।...এই বছর আমি কাজ করেছি প্রচুর, আগামী বছরও আরো প্রচুর করব বলে আশা করি। মিশনারী-দের নিয়ে একদম মাথা ঘামিয়ো না। তারা চীৎকার করবে সেটাই স্বাভাবিক। রুজি রোজগার কমে যাচ্ছে দেখলে কে না কাঁদে? গত দুই বছরে মিশনারী তহবিলে বড় ফাঁক দেখা দিয়েছে, আর তা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। আমি অবশ্য মিশনারীদের সাফল্য কামনা করি। বৎস, যতদিন ঈশ্বরে প্রেম থাকবে, গুরুর প্রতি ভালোবাসা থাকবে, সত্যের প্রতি বিশ্বাস অবিচল থাকবে, ততদিন কোনো কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। এর কোনো একটি হ্রাস পেলেই বিপদ। তোমার মন্তব্যটি ঠিক: আমার আইডিয়া ভারত অপেক্ষা পশ্চিমে বেশী কার্যকর হবে।...ভারত আমার জন্য যতটুকু করেছে আমি ভারতের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী করেছি।...সত্যের প্রতি আমার বিশ্বাস অগাধ; যেখানেই যাই প্রভু আমাকে বহু বহু কর্মী জুটিয়ে দেন—তারা...শিষ্যদের মতো নয়—তারা তাদের গুরুর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। সত্য আমার দেবতা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার দেশ। আমি কর্তব্যে বিশ্বাস করি না। কর্তব্য, সংসারী মানুষের অভিশাপ, সন্ন্যাসীর নয়। কর্তব্য একটা ভাঁওতা মাত্র। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়েছে; এই দেহ কোথায় যাবে কি যাবে না তা নিয়ে আমার কি মাথাব্যথা? তোমরা আমাকে বরাবর সাহায্য করেছ। প্রভু তোমাদের পুরস্কৃত করবেন। ভারত বা আমেরিকা থেকে আমি কোনো প্রশংসা যাচ্ঞা করিনি, ঐ বুদ্বুদের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই-ও। আমি ঈশ্বরের সন্তান, সত্য শিক্ষা দেওয়া আমার ব্রত। যিনি আমাকে সত্য দান করেছেন তিনিই আমাকে পৃথিবীর সাহসী শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তমদের মধ্য থেকে সহকর্মী সংগ্রহ করে দেবেন। তোমরা হিন্দুরা কয়েক বছরের মধ্যেই দেখতে পাবে প্রভু পশ্চিম দেশে কতখানি কী করেন। তোমরা হলে প্রাচীনকালের ইহুদীদের

ন্যায়—চাড়ির মধ্যে কুকুর—নিজে খাবে না পরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্ম বলে কিছু নেই, তোমাদের ঈশ্বর হলেন রসুই ঘর, আর তোমাদের বাইবেল হাঁড়ি কড়াই। মাত্র তোমরা কয়েকজন আছ সাহসী ছেলে। লেগে থাকো, বৎস, আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ কাপুরুষ নেই।...বড় কাজ মহৎ কাজ কি কখনো মসৃণগতিতে চলতে পারে? সব হবে সময়ে, ধৈর্যগুণে এবং অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির জোরে। অনেক কথা বলতে পারতাম যা শুনে তোমার হৃদয় নেচে উঠত, কিন্তু বলব না। আমি চাই লোহার মতো শক্ত হৃদয় এবং সংকল্প, যা কখনো কেঁপে উঠতে জানে না। লেগে থাকো। প্রভু তামার মঙ্গল করুন।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫৮]

থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ড পার্ক,
অগস্ট, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

...মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে এবার আর একখানা পত্র। তা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। দেখবেন আগে হতেই কেমন যোগাড়যন্ত্র চলছে। এই এবং এর সঙ্গে মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণ—সবটা মিলে দেবতার ডাক বলে কি আপনার মনে হয় না? আমার ত তাই মনে হয়, তাই আমি এই আহ্বান মেনে চলব। অগস্ট মাসের শেষে মিঃ লেগেটের সঙ্গে যাচ্ছি প্যারিসে, তারপর লণ্ডনে যাব।

আমার গুরুভাইদের জন্য এবং আমার কাজের জন্য যৎসামান্যই করা সম্ভব, উপস্থিত সেই সাহায্যটুকুই আপনার কাছে প্রার্থনা করব। আমি আমার নিজের পরিজনের প্রতি কর্তব্য মোটের ওপর ভালোভাবেই পালন করেছি। এখন পালন করব পৃথিবীর প্রতি আমার কর্তব্য, যে আমাকে এই দেহ দিয়েছে—সেই দেশের প্রতি আমার কর্তব্য. যে আমাকে দিয়েছে আমার আইডিয়া, সেই মানব সমাজের প্রতি আমার কর্তব্য, যে মানবসমাজ আমাকে তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে উঠতে দিয়েছে!

যত বুড়ো হচ্ছি তত আমি হিন্দুদের আইডিয়ার অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করছি: মানুষই সব থেকে মহত্তম ও বৃহত্তম। মহমেডানরাও তাই বলে থাকে। দেবদূতদের আল্লাহ্ বলেছিলেন আদমের কাছে প্রণতঃ হতে। ইবলিশ সেই আজ্ঞা পালন করেনি। তাই সে হল শয়তান। এই পৃথিবী সকল স্বর্গের চেয়েও উচ্চতর; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এইটিই মহত্তম বিদ্যালয়; মঙ্গল বা বৃহস্পতি গ্রহের লোক আমাদের চেয়ে উন্নত হতেই পারে না, তারা তো আমাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে না। তথাকথিত উন্নততর তারাই যারা গতায়ু হয়েছে, তারাওমানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, কেবল অন্য দেহ ধারণ করেছে—এই মাত্র। সত্য বটে তারা অনেক সূক্ষ্মতর, তবু একথাও সত্য যে তাদেরও মনুষ্য দেহ, তাতে হস্ত পদাদি সবই

আছে। তারা এই পৃথিবীরই অন্য আকাশে বাস করে, সম্পূর্ণ অদৃশ্যও নয় একেবারে। আমাদেরই মতো তারাও চিন্তা করতে পারে, তাদেরও চেতনা এবং আর সব কিছুই আছে। অতএব তারাও মানুষ, দেবগণও মানুষ এবং দেবদূতরাও। কিন্তু মানুষই হন ভগবান; তাই তাদেরও, পরিণামে ভগবান হবার জন্যই, মানুষ হতে হয়।...

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৫৯]

(মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে লেখা)

ওঁ তৎ সৎ

হোটেল কন্টিনেণ্টাল
৩, রু কাস্টিল রেঁা, প্যারিস
২৬ অগস্ট, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

গত পরশু এখানে এসেছি। এই দেশে এসেছি একজন আমেরিকান বন্ধুর অতিথি হয়ে; আগামী সপ্তাহে এখানে তার বিবাহ।

সে পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার এখানে থাকতে হবে। তারপর লণ্ডনে আসবার সুযোগ পাব।

আপনার সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দের জন্য সাগ্রহে কাল গুণছি।

চির সৎ আশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৬০]

প্যারিস
৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

...মিশনারীদের ওসব আজে বাজে কথাবার্তাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ দেখে আমি খুব বিস্মিত হচ্ছি।...ভারতের লোকেরা যদি চায় যে আমি কেবলমাত্র হিন্দুর খাদ্যই খাব তাহলে তারা যেন একজন পাচক এবং তার ভরণ-পোষণের মতো টাকা পাঠিয়ে দেয়। আসল সাহায্যের কাণাকড়িটিও না দিয়ে এসব অর্থহীন মাতব্বরি করা দেখে আমার হাসি পায়। অপরপক্ষে মিশনারীরা যদি বলে আমি সন্ন্যাসীর দুটি ব্রত—দারিদ্র্য এবং সততা—ভঙ্গ করেছি, তাহলে তাদের মুখের ওপর বলে দিও তারা প্রকাণ্ড মিথ্যুক।

মিশনারী হিউমের কাছে চিঠি লিখতে পার, তাকে সোজা জিজ্ঞেস কর আমার মধ্যে ঠিক কোন অপকর্মের পরিচয় সে পেয়েছে, কিংবা তাকে যারা ওরকম সংবাদ দিয়েছে তাদের নাম দিক, জিজ্ঞেস কর—ওসব খবর শোনা কথা না নিজের জানা; তাহলেই সব মিটবে, সমস্ত ব্যাপার তাহলেই ফাঁস হয়ে যাবে।…

আমার কথা বলি, মনে রাখবে আমি কারও হুকুম মেনে চলি না। আমি আমার জীবনের ব্রত কী জানি, আমার মধ্যে কোনো জাতি দম্ভ নেই; আমি যেমন ভারতের তেমনই সমগ্র বিশ্বের, এ বিষয়েও কোনো ভাঁওতাবাজি নেই। যতটা পেয়েছি আমি তোমাদের সাহায্য করেছি। এবার তোমরাই নিজেদের সাহায্য কর। আমার ওপর কোন্ দেশের বিশেষ দাবি থাকতে পারে? তোমরা সব অবিশ্বাসী নাস্তিক, অর্থহীন বাজে কথা আর বোলো না।

আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, যে টাকা পেয়েছি তার সবটাই পাঠিয়ে দিয়েছি কলকাতায় এবং মাদ্রাজে; এই সব করবার পর আমিই কিনা হুকুম সহ্য করব! তোমাদের লজ্জা করে না? তাদের কাছে আমার ঋণটা কী? তাদের নিন্দা বা প্রশংসায় আমি কি গ্রাহ্য করি? বৎস, আমি একজন অনন্য মানুষ, তুমিও আমাকে এখন পর্যন্ত বুঝতে পারনি। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও; যদি না পার তবে ক্ষান্ত হও; কিন্তু তোমাদের আবোল তাবোল দিয়ে আমার ওপর মাতব্বরি করার চেষ্টা কোরো না। আমার পশ্চাতে একটি শক্তি দেখতে পাই, তা মানুষের থেকে, দেবতার থেকে, শয়তানের থেকে মহত্তর। কারও সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি সারা জীবন অন্যকেই সাহায্য করে এসেছি।…দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য তারা সামান্য কয়েকটা টাকা তুলতে পারে না। তার ওপর আবার তাদের যত বাজে কথা, তারা খবরদারি করতে চায় সেই লোকের ওপর যার জন্য তারা কিছুই করে নি, অথচ তাদের জন্য যে যথাসাধ্য করেছে! পৃথিবী এমনই অকৃতজ্ঞ!

শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে যে রকম বর্ণ-বিদ্বেষী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হৃদয়হীন, ভণ্ড, নাস্তিক কাপুরুষ দেখা যায় আমি তাদের মতো জীবন যাপন করে তাদেরই মতো মরব বলে জন্ম গ্রহণ করেছি বলতে চাও নাকি? কাপুরুষতাকে আমি ঘৃণা করি; কাপুরুষতা কিংবা অসার রাজনীতির বিষয়ে আমার একেবারে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমি কোনোরকম রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। সংসারে দেবতা এবং সত্যই একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।

আগামী কাল আমি লণ্ডন যাচ্ছি।…

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬১]

লণ্ডন
২৪ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

…ইতিপূর্বেই প্রথম অভিভাষণ সমাপ্ত করেছি, "স্ট্যাণ্ডার্ড" কাগজের নোটিস থেকেই বুঝতে পারবে কত ভালোভাবে লোকে তা গ্রহণ করেছে। "স্ট্যাণ্ডার্ড" অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী রক্ষণশীল পত্রিকা। আমি লণ্ডনে একমাস থাকব, তারপর যাব আমেরিকা, আগামী গ্রীষ্মকালে আবার এখানে ফিরে আসব। এখন পর্যন্ত ত ইংল্যাণ্ডে বীজ বেশ ভালোভাবেই বপন করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ।…

সাহস অবলম্বন কর এবং কাজ চালিয়ে যাও। ধৈর্য এবং একটানা কাজ—তাই একমাত্র উপায়। কাজ করে চল; মনে রাখবে—ধৈর্য ও পবিত্রতা, আর সাহস ও একটানা কাজ।…যতক্ষণ তুমি শুদ্ধ থাকবে, আপন মূলনীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে ততক্ষণ কিছুতেই ব্যর্থ হতে পার না।—মা তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না, সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করবে তুমিই।

ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬২]

লণ্ডন
১৮ নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

…ইংল্যাণ্ডে আমার কাজ সত্যিই চমৎকার। নিজেই তাতে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। ইংরেজরা খবরের কাগজে বেশী সোরগোল তোলে না, নীরবে কাজ করে। আমি নিশ্চিত, আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে কাজ বেশী হবে। দলের পর দল আসে, অত লোককে জায়গা দিতে পারি না; মেঝের ওপরই তারা বসে পড়ে, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে। আমি তাদের বলি—কল্পনা করে নিন ভারতের আকাশ তলে বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় বসেছেন; আইডিয়াটি তাদের সকলের খুব ভালো লাগে। আগামী সপ্তাহে আমাকে চলে যেতে হবে, তাতে এরা অত্যন্ত দুঃখিত। কারও কারও মতে আমি এত শীঘ্র চলে গেলে এখানে কাজের ক্ষতি হবে। আমার অবশ্য তা মনে হয় না। আমি মানুষ বা বস্তুর ওপর নির্ভর করি না। আমি শুধু প্রভুর ওপরই নির্ভর করি—আর তিনিই আমার মারফৎ কাজ করেন।

…প্রত্যেককে সন্তুষ্ট রাখ, কিন্তু ভণ্ডামি কোরো না, কাপুরুষ হয়ো না। শুদ্ধ চিত্ত এবং মনোবল নিয়ে আপন আইডিয়ার প্রতি বিশ্বস্ত থাক, আজ তোমার পথে যে বাধা বিপত্তিই দেখা দিক না কেন, পরিণামে বিশ্ব তোমার কথা শুনবেই।…

বাঙ্গালীরা যেমন বলে, আমার এখন মরবারও সময় নেই। আমি কাজ আর কাজ করেই চলেছি, নিজের অন্ন সংস্থান করছি এবং নিজের দেশকেও সাহায্য করছি; সবটাই একাকী; আর এই সব কিছু করেও শত্রুমিত্র সকলের সমালোচনাই পাচ্ছি! যাই হোক, তোমরা ত ছেলেমানুষমাত্র, সমস্ত কিছু আমাকেই সহ্য করতে হবে। কলকাতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি, লণ্ডনে কাজের জন্য তাকে রেখে যাব। আর একজন আবশ্যক আমেরিকার জন্য। আমি আমার নিজের লোক চাই। সমস্ত আধ্যাত্মিক বিকাশের বনিয়াদ হল গুরুভক্তি।

…অবিশ্রান্ত কাজ করে করে আমি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার যেরকম কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সেরকম করতে হলে অন্য যে কোনো হিন্দু মরেই যেত। …আমি ভারতে যেতে চাই একটি লম্বা বিশ্রামের জন্য।…

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫৩]

২২৮ ওয়েস্ট, ৩৯নং স্ট্রিট,
নিউ ইয়র্ক
২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিংগা,

…ধৈর্য ধর এবং আমৃত্যু বিশ্বস্ত থাক। নিজেদের মধ্যে লড়াই কোরো না। টাকা কড়ি লেনদেনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সৎ থাক।…আমাদের এখনো অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস সততা এবং ভক্তি আছে, ততদিন সব বিষয়েই উন্নতি হবে।

…(বৈদিক) সূত্রগুলি অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবে, প্রাচ্যবিদ্‌গণের প্রতি কোনো মনোযোগ দেবার দরকার নেই। আমাদের শাস্ত্রাবলীর কিছুই তারা বোঝে না। শুষ্ক ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে দর্শন বা ধর্ম বুঝতে পারা সম্ভব নয়।…যেমন ধর ঋগ্‌বেদের "আনীদ-অবাতম্"-এর অনুবাদ করা হয়েছে— "তিনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না নিয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন"। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে মুখ্য প্রাণের কথা বলা হয়েছে। আর 'অবাতম্' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবিচলিত ভাবে অর্থাৎ স্পন্দনহীন ভাবে। এর দ্বারা কল্প প্রারম্ভে প্রাণের অর্থাৎ সর্বব্যাপী বিশ্ব-নিখিলের শক্তির স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে:—ভাষ্যকারদের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মুনিঋষিদের চিন্তাধারা অনুসারে ব্যাখ্যা কর, তথাকথিত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতানুসারে নয়। তারা কী জানে?

…সাহসী হও, নির্ভীক হও, তাহলেই পথ পরিষ্কার হবে।… মনে রেখো, থিয়সফিস্টদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখার দরকার নেই। তোমরা সকলে যদি আমার পাশে দাঁড়াও, যদি ধৈর্য না হারাও, তবে তোমাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমরা আরো মহৎ কাজ করতে পারব। বৎস, মহৎ কাজ হবে ইংল্যাণ্ডে, ক্রমে ক্রমে।

আমার বোধ হয় তুমি মাঝে মঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়, আর ভয় হয় তুমি থিয়েসফিস্টদের পাল্লায় পড়তে প্রলুব্ধ হও। মনে রেখো, গুরুভক্তই জগৎ জয় করে,—ইতিহাসের সাক্ষ্য এইটিই।...বিশ্বাসের জোরেই মানুষ সিংহের মতো বলশালী হয়। আমাকে কত বিপুল কাজ করতে হয় সেই কথাটা সব সময় মনে রেখো। কখনো কখনো একদিনে দুটি কি তিনটি বক্তৃতাও করতে হয়—এই ভাবেই সব বাধা বিপত্তি ঠেলে আমাকে অগ্রসর হতে হয়—অতি কঠোর কাজ; অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেউ হলে মারা যেত।

বিশ্বাস এবং মনোবল নিয়ে লেগে থাক; সত্যনিষ্ঠ, সৎ এবং পবিত্র হও—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ কোরো না। ঈর্ষা আমাদের জাতির অভিশাপ।

তোমাকে এবং ওখানে আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালোবাসা জানাচ্ছি।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

[৬৪]

২২৮ ডব্লু, ৩৯ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

প্রিয় বোন,

আমার কোনো চিঠি এখনো পাওনি জেনে খুব আশ্চর্য হলাম। তোমার চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে চিঠি দিয়েছি, নিউ ইয়র্কে আমি যে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছি তার কয়েকটি পুস্তিকাও পাঠিয়েছি। রবিবারে রবিবারে যে পাবলিক লেকচার দিয়ে থাকি তা শর্টহ্যাণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরে ছাপানো হয়। এইরূপ তিনটি বক্তৃতা নিয়ে দুখানা পুস্তিকা হয়েছে, তারই কয়েকখানা কপি তোমাকে পাঠিয়েছি। আরো দুই সপ্তাহ আমি নিউ ইয়র্কে থাকব, তারপর ডেট্রয়েটে, সেখান থেকে আবার সপ্তাহ দুয়েকের জন্য ফিরে আসব বোস্টনে।

নিরন্তর কাজের চাপে এই বছর আমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছি। এই শীতকালে একটি রাত্রিতেও আমি ভালো করে ঘুমুই নি। নিশ্চয় জানি যে, অতিরিক্ত কাজ করছি, এখনো ইংল্যাণ্ডে আমার মস্ত বড় কাজ বাকী আছে।

এই সবের মধ্য দিয়েই আমাকে যেতে হবে, তারপর আশা আছে ভারতে ফিরব, এবং বাকী জীবনটা সেখানে বিশ্রাম করব। বিশ্বসংসারের জন্য যথাসাধ্য করবার চেষ্টা অন্ততঃ করেছি, ফলের ভার প্রভুর ওপর ছেড়ে দিলাম। এখন আমি বিশ্রামের জন্য লালায়িত। আশা করি কিছু বিশ্রাম পাব এবং ভারতের লোকেরা আমাকে ছেড়ে দেবে। বেশ কয়েক বছরের জন্য যদি বোবা হয়ে যেতে পারতাম, যদি

আর একদম কথা বলতে না হত! পৃথিবীর এইসব লড়াই এইসব সংগ্রাম আমার আদৌ পোষায় না। আমার স্বভাবই স্বপ্নপ্রবণ, অবসর বিলাসী। আমি জন্ম আদর্শ-বাদী, স্বপ্নের সংসারেই বাস করতে পারি; বাস্তব ঘটনার স্পর্শমাত্রে আমার স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটে এবং তা আমাকে অসুখী করে তোলে। কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

তোমাদের চার বোনের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এদেশে আমার যা কিছু আছে সে তোমাদেরই দৌলতে। তোমরা চিরসুখী হও, চিরকল্যাণী হও। আমি যেখানেই থাকি, গভীরতম কৃতজ্ঞতা এবং ঐকান্তিক ভালোবাসার সঙ্গে তোমাদের কথা মনে আমার থাকবে। সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের মিছিল। আমার অভিলাষ সম্পূর্ণ সচেতন-ভাবে স্বপ্ন দেখা, আর কিছু নয়। সকলের প্রতি—মিস্টার যোসেফাইনের প্রতি আমার ভালোবাসা।

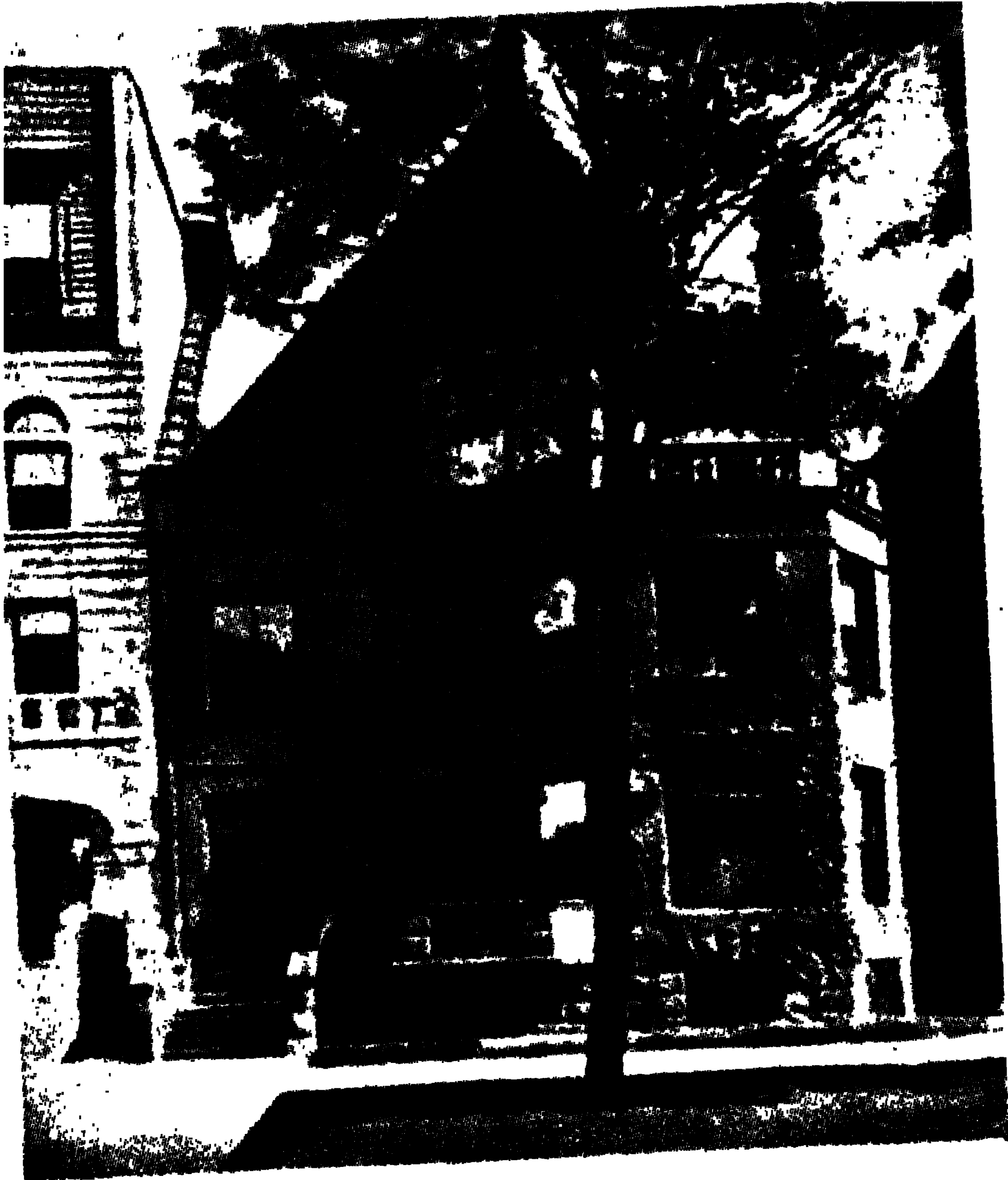
তোমার চির স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ



অধ্যাপক জে. এইচ. বাইট



শ্রীমতী বাইট



চিকাগোয় হেল পরিবারের বাসগৃহ
১৮৯৪'এ স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান কর্মকেন্দ্র।

বিবেকবাণী

১। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

২। জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?

৩। ...প্রাচ্যে যেটার অভাব ভয়ঙ্কর, তা ধর্ম নয়, ধর্ম তাদের প্রচুর আছে—ভারতের কোটি কোটি দুঃস্থ মানুষ তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে চাইছে শুধু রুটি। তারা আমাদের কাছে রুটি চাইছে, আর আমরা তাদের পাথর দিচ্ছি। অনাহারী মানুষকে ধর্ম দেখানো বা দর্শনশাস্ত্র বোঝানো তাদের অপমান করা।

৪। ধর্মে জাতিভেদের স্থান নেই, জাতিভেদ একটি সামাজিক ব্যবস্থা।

৫। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এদের ভয়াবহ উত্তরসূরী ধর্মোন্মাদনা বহুকাল ধরে এই সুন্দর পৃথিবীকে অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসার দ্বারা পূর্ণ করেছে, বার বার মানুষের রক্তে সিক্ত করেছে, সভ্যতাকে বিনষ্ট করেছে এবং সমগ্র জাতিকে উৎক্ষিপ্ত করেছে হতাশার কূপে। এইসব ভয়ঙ্কর দানবগুলি যদি না থাকত, মানব সমাজ অনেক বেশী উন্নত হতে পারত। তবে এদের মৃত্যুদিন সমাগত;...যে ঘণ্টা বেজে উঠেছে, তা সকল প্রকারের ধর্মোন্মাদনা, তরবারি অথবা লেখনী মাধ্যমে সব রকমের অত্যাচার এবং একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবমান মানব সকলের অন্তর্গত অসদ্ভাবের মৃত্যু-ঘণ্টা হিসেবে বেজে উঠুক।

৬। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।

৭। তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।

৮। "প্রাচীন হিন্দুধর্ম যেখানে 'এক'কেই সৎ এবং বহুকে অসৎ মনে করে, বুদ্ধ কি সেক্ষেত্রে এই শিক্ষাই দেননি যে বহু সৎ ও 'আমি' বা অহং অসৎ"? এর উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আর রামকৃষ্ণ পরমহংস ও আমি এর সঙ্গে আরও যা যোগ করেছি তা হল, 'বহু' এবং 'এক' বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই মনের অনুভূত একই পরম সত্য।"

৯। "পৃথিবী আজ যা চায় তা হল বিশ জন নরনারী—যারা ঐ সামনের রাস্তায় নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারে ও বলতে পারে যে ঈশ্বর ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই।

কে যাবে ? ভয় কেন ? এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে অন্য সব কিছুর মূল্য কি ? আর তা যদি সত্য না হয় তাহলে আমাদের জীবনে আর কি রইল !"

১০। "মানুষের দেবত্বকে যদি কেউ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে তার কাজ কতই না স্বচ্ছন্দ হত! একমাত্র লোকের চোখ খুলে দেওয়া ছাড়া তার করণীয় আর কিছু নেই।"

১১। "পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা !"—তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে সাংসারিক জ্ঞান দিলে তিনি সক্রোধে বুঝিয়ে দিলেন : "এই জন্যেই পাশ্চাত্যের মানুষ কোন দিন কোন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। যদি তোমরা কখনও কিছু করে থাক তা করেছেন মুষ্টিমেয় জনকয়েক ক্যাথলিক সন্ত যাঁদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। পরিকল্পনাকারীরা কখনোই ধর্ম প্রচার করেন নি।"

১২। "পাশ্চাত্য সমাজ-জীবন যেন এক হাসির কলরোল। কিন্তু গভীরে তা আর্ত বিলাপ। আর তার শেষ পরিণাম হল চাপা কান্না! যত কৌতুক, যত চপলতা, সবই ওপর ওপর। আসলে তা শোকাবহ সুতীব্র আবেগে ভরা। আর এদেশে বাইরে থেকে জীবন দুঃখময়, বিষণ্ণ, কিন্তু তার অন্তস্থলে আছে নিশ্চিন্ততা ও উল্লাস।

"আমাদের একটি মত হল যে নিখিল জগৎ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ—শুধু কৌতুকের জন্যে। এবং অবতারেরা যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন ও মর্ত্যজীবন যাপন করেছেন তা 'বিশুদ্ধ কৌতুকবশত'। লীলা—সবই লীলা! খ্রীষ্ট কেন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন—শুধুই লীলা! আর জীবনের ক্ষেত্রেও সেই কথা। ঈশ্বরের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও। বল, 'এ সব লীলা, সবই লীলা'। 'তুমি' কি কিছু কর ?"

১৩। প্লেটোর 'আইডিয়া বিষয়ক মতবাদের' (Theory of Ideas) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন : "আর তবেই বুঝতে পারছ, এ সমস্ত আর কিছুই নয়, একমাত্র যা বাস্তব এবং পূর্ণাঙ্গ—সেই মহৎ চিন্তাবলীর অতি দুর্বল অভিব্যক্তি মাত্র। কোথাও না কোথাও এক আদর্শ 'তুমি' আছে, আর এ হচ্ছে তাকে প্রকাশ করার প্রয়াস। এই প্রয়াস এখনও নানাভাবে লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আছে। তবু এগিয়ে চল। কোন না কোন দিন তুমি পরম আদর্শের ব্যাখ্যা করতে পারবে।"

১৪ একবার তাঁর এক শিষ্যার একটি মন্তব্য শোনামাত্র স্বামীজী সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। এই শিষ্যাটি মনে করতেন যে জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করার চেয়ে, অভীষ্ট লক্ষ্য-সাধনে সহায়তা করতে বারবার এই জীবনে ফিরে আসাই শ্রেয়। স্বামীজী বললেন : "এর কারণ তুমি অগ্রগতির ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারনি। কোন বস্তু বা বিষয় যে আরও ভাল হয় তা নয়। তারা যেমন আছে তেমনই থাকে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে আরও ভাল হই আমরা।"

১৫। আলমোড়াতে একবার এক বয়স্ক ব্যক্তি এলেন—মুখে মধুর দুর্বলতার ভাব—প্রশ্ন করলেন কর্ম বিষয়ে। তাঁর জিজ্ঞাস্য : "যাদের কর্ম হল সবলকে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করতে দেখা, তাদের কি করা উচিত?" স্বামীজী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন : "কেন ! নিঃসন্দেহে শক্তিমানকে আঘাত করা ! এই কর্মে আপনি আপনার ভূমিকা বিস্মৃত হচ্ছেন। বিদ্রোহ করার অধিকার আপনার সর্বদা আছে !"

১৬। স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হল "ন্যায়ের সমর্থনে মৃত্যুবরণের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত না আমাদের গীতার উপদেশ গ্রহণ করে কখনও যেন চিত্তবিকার না ঘটে তা-ই শেখা উচিত?" "আমি অবিকারী হওয়ার পক্ষে"···ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ নীরব থেকে স্বামীজী বললেন : "—সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে। গৃহস্থের পক্ষে আত্মরক্ষা করা উচিত।"

১৭। "একথা মনে করা ভুল যে সুখলাভ সব মানুষের লক্ষ্য। এমন বহু লোক আছেন যাঁরা দুঃখের সন্ধান করার জন্যেই জন্মেছেন।"

১৮। "রামকৃষ্ণ পরমহংসই একমাত্র মানুষ যাঁর একথা বলার সাহস ছিল যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে তাদের নিজেদের ভাষায় !"

১৯। "কালীকে আমি কি ঘৃণাই না করতুম !"—কালীতত্ত্ব গ্রহণের আগে তাঁর সংশয়াচ্ছন্ন দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন।—"তার সঙ্গে কালীর যাবতীয় বিধি-বিধান থেকেও ! আমার ছ'বছরের প্রতিরোধের মূল ছিল এই—যে আমি তাঁকে স্বীকার করব না ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমায় মেনে নিতেই হল। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে কালীর কাছে উৎসর্গ করেছেন। এখন আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যা করি না কেন তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন ও তিনি যা চান আমাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেন। তবু কি দীর্ঘকাল ধরেই না আমি যুঝেছিলুম ! দেখ, রামকৃষ্ণদেবকে আমি ভালবাসতুম আর আমাকে বেঁধে রেখেছিল এটাই ! আমি তাঁর বিস্ময়কর পবিত্রতা দেখেছিলুম, অনুভব করেছিলুম তাঁর আশ্চর্য ভালবাসা···তাঁর বিরাটত্ব তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। সে বোধ এসেছিল পরে, আমি যখন হার মানলুম তখন। সে সময়ে আমি তাঁকে ভাবতুম এক খ্যাপা শিশু—যে সর্বদাই নানা কাল্পনিক দৃশ্য ইত্যাদি দেখছে। আর, তারপর আমাকেও কালীকে মেনে নিতে হল !"

২০। "না, সে এক গুহ্য বিষয় যা আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিয়েছিল, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যাবে। সে সময়টা ছিল আমার নানা ঘোর দুর্ভাগ্যের দিন। 'মা' দেখলেন এই একটি সুযোগ···কালী আমাকে তাঁর গোলাম করে নিলেন। তাঁর ঠিক এই কথাগুলিই ছিল 'তুই আমার গোলাম,' ·· আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতে আমাকে সমর্পণ করলেন···আশ্চর্য ! এই কাজ করার পর তিনি মাত্র দুবছর বেঁচে ছিলেন, আর তার অধিকাংশ সময়ই

তিনি যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। ছ'মাসের বেশি তাঁর স্বাস্থ্য বা ঔজ্জ্বল্য ছিল না।"

"জান, গুরুনানকও এই রকম ছিলেন—খুঁজছিলেন তাঁর একমাত্র শিষ্যকে যাঁকে তিনি তাঁর শক্তি দান করে যাবেন। তিনি নিজের পরিবারের সকলকে উপেক্ষা করেছিলেন—তাঁর সন্তানদের তাঁর কাছে কোনই মূল্য ছিল না—অবশেষে দেখা মিলল সেই বালকের—যাঁকে তিনি তা দিয়ে গেলেন। আর তারপর তিনি মরতে পারলেন।

"ভাবীকাল কি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কালীর অবতার আখ্যা দেবে? হ্যাঁ, আমি মনে করি এতে কোন সন্দেহই নেই যে কালী নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে রামকৃষ্ণের দেহ তৈরী করে নিয়েছিলেন।

"দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না যে কোনখানে এক বিরাট শক্তি আছে যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে মনে করে ও কালী এবং মা নামে নিজেকে অভিহিত করে।···আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি···কিন্তু সর্বদা এই রকমই কি দেখা যায় না? এ কথা কি সত্য নয় যে দেহের অসংখ্য জীবকোষ ব্যক্তির আকার গড়ে তোলে; একটি নয়, বহু মস্তিষ্ক-কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করে অখণ্ড চৈতন্য?··· বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য! ঠিক তাই! আর ব্রহ্মের বেলাতেই বা তা অন্যরকম হবে কেন? তা ব্রহ্ম। তা এক, কিন্তু তবু···তবু···তা আবার বহু দেবতাও!"

২১। "যত আমার বয়স বাড়ছে আমার তত মনে হচ্ছে পৌরুষের মধ্যে সবকিছু আছে। এই আমার নতুন বাণী।"

২২। নরমাংস ভোজন সম্বন্ধে ইউরোপের কোন একজন এমনভাবে উল্লেখ করেছিলেন যাতে মনে হবে তা যেন কোন কোন সমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য ছিল: "তা কখনোই সত্য নয়! ধর্মীয় বলি অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে যুদ্ধে ছাড়া কোন জাতি কখনোই নরমাংস খায়নি। বুঝতে পারছ না কেন, সঙ্ঘলিপ্সু জীবের ধারা এ নয়? তা হলে তা যে সমাজ-জীবনের মূলেই আঘাত করবে!"

২৩। "যৌনপ্রেম ও সৃষ্টিকামনা! অধিকাংশ ধর্মের মূলে রয়েছে এই দুটি। ভারতবর্ষে এদের বৈষ্ণবধর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে, পশ্চিমে বলা হয় খ্রীষ্টধর্ম। কত অল্প লোকই না মৃত্যু অথবা কালীকে পূজা করতে সাহসী হয়েছে। এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি, আলিঙ্গন করি ভয়ংকরকে তা ভয়ংকর এইজন্যেই! আমরা তাকে সহনীয় করতে চাই-না। যন্ত্রণাকে যেন গ্রহণ করতে পারি যন্ত্রণার জন্যেই!"

২৪। বৌদ্ধধর্মের তিনটি আবর্তনকাল ছিল: বিধানের পাঁচ'শ বছর, প্রতিমাপূজার পাচশ' বছর এবং তন্ত্রের পাঁচশ' বছর। তোমরা ভেব না নিজস্ব সম্প্রদায়ের মন্দির ও পুরোহিত বিশিষ্ট বৌদ্ধধর্ম নামে কোন ধর্ম ভারতবর্ষে ছিল। এ জিনিষ সর্বদা ছিল হিন্দুধর্মে। একবার শুধু বুদ্ধের প্রভাব সর্বময় হয়ে উঠেছিল ও তা-ই—জাতিকে মঠধর্মী করে তুলেছিল।

২৫। "রক্ষণশীলের সামগ্রিক আদর্শ—আত্মনিবেদন। তোমাদের আদর্শ হচ্ছে সংগ্রাম। তার পরিণাম এই হয়েছে যে, জীবনকে যদি কেউ উপভোগ করতে পারে তা আমরা—তোমরা কখনো তা পার না। তোমরা নিত্যই চেষ্টা করে চলেছ তোমাদের জীবনকে আরো ভাল করতে, কিন্তু অভীষ্ট পরিবর্তনের লক্ষ্যভাগের এক ভাগও কাজে পরিণত হওয়ার আগেই তোমাদের মৃত্যু হয়। 'করতে থাকা' পাশ্চাত্যের আদর্শ, প্রাচ্যের আদর্শ দুঃখ সহ্য করা। কাজ করা ও দুঃখ সহ্য করার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটলে তবেই পূর্ণ জীবন হয়। কিন্তু তা কখনও হওয়া সম্ভব নয়।

"আমাদের মতবাদে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, কোন মানুষেরই সমস্ত কামনা তৃপ্ত হতে পারে না। জীবনকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এটা সুখকর নয়, তাহলেও তা আলোক ও শক্তির বিন্দু উন্মোচিত করে। আমাদের মধ্যে যারা সংস্কারপন্থী তারা শুধু এর মন্দটাই দেখে ও তা বর্জন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এর যে প্রতিকল্প তারা স্থির করে তা আগেরটির মতই মন্দ ও এই নতুন রীতি শক্তির কেন্দ্রগুলিতে কাজ করতে পুরোনোটির মতই দীর্ঘ সময় নেয়।

"আমাদের যা পরিহার করতে হবে তা হল স্বার্থপরতা। আমি দেখেছি যে যখনই আমি নিজের জীবনে কোন ভুল করেছি—সব সময়েই তার কারণ হল আমার হিসেবের মধ্যে 'অহং' এসে গেছে। 'অহং' জড়িত না থাকলেই আমার সিদ্ধান্ত সোজা তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পেরেছে।

"অহং না থাকলে কোন ধর্মমত থাকত না, মানুষ যদি কিছুই নিজের জন্যে না চাইত, তোমরা কি মনে কর—এত সব প্রার্থনা, উপাসনা তার থাকত? না! কদাচিৎ হয়তো সুন্দর কোন ভূদৃশ্য বা আর কিছু দেখে মানুষ একটু স্তুতি করত, এ ছাড়া ঈশ্বরের কথা সে কখনো চিন্তাই করত না। আর ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের থাকা উচিত—শুধুই স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা জানানো। হায়, যদি আমরা অহং-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম!

"যখন তোমরা ভাব, সংগ্রাম করা উন্নতির লক্ষণ—তোমরা তখন সম্পূর্ণ ভুল কর। মোটেই তা নয়। উন্নতির চিহ্ন হচ্ছে আত্মভূত করে নেওয়া। এই আত্মীকরণে হিন্দুধর্মের প্রতিভা অসাধারণ। আমরা কোনদিনই সংগ্রামকে মূল্য দিইনি। অবশ্য মাঝে মাঝে আমরা গৃহরক্ষার জন্যে আঘাত হেনেছি। তা ন্যায়সংগত। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ করাকে আমরা গণ্যই করিনি। প্রত্যেককেই এ কথা শিখতে হয়েছে। নবাগত জাতিরা দুর্বার গতিতে ছুটে আসুক। শেষে তারা সকলেই হিন্দুধর্মে লীন হয়ে যাবে।"

২৬। "সগুণ ঈশ্বর কেবল মানবেরই নয়—যাবতীয় আত্মার সমষ্টি। সমষ্টির ইচ্ছাকে কোন কিছুই প্রতিহত করতে পারে না। যাকে আমরা নিয়তি বলি, তা হল

এই। আমরা যখন শিব, কালী ইত্যাদি বলি তখন আমরা এই কথাটিই বোঝাতে চাই।"

২৭। "ভয়ংকরের উপাসনা কর। উপাসনা কর মৃত্যুর! অন্য সবই ব্যর্থ। সব সংগ্রাম বৃথা! এই হল শেষ শিক্ষা। কিন্তু তা কাপুরুষের মৃত্যুরতি নয়, নয় শক্তিহীনের প্রেম বা আত্মহনন। তা শক্তিমানের স্বাগতবাণী—যিনি সমস্ত কিছুর গভীরে গিয়ে যাচাই করেছেন ও উপলব্ধি করেছেন যে এর কোন বিকল্প নেই।"

২৮। "যারা তাদের কুসংস্কার আমার জাতির কাছে আবার ফিরিয়ে আনছে আমি তাদের বিরোধী। মিশরী পুরাতত্ত্ববিদের মিশরের প্রতি অনুরাগের মত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করা সহজ, আর এই আকর্ষণ পুরোপুরি স্বার্থপর। বইয়ের ভারতবর্ষ, অধ্যয়নের, স্বপ্নের ভারতবর্ষকে আবার দেখার আকাঙ্খা হতে পারে। কিন্তু আমার আশা—এই যুগের বিশিষ্ট গুণগুলির দ্বারা, কেবল স্বাভাবিক পথে নববলে বলীয়ান সেই ভারতবর্ষের ভাল দিকগুলি আবার দেখব। এই নতুন অবস্থার অগ্রগতি যেন ভেতর থেকে আসে।

"তাই আমি শুধু উপনিষদই প্রচার করে থাকি। তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে যে আমি উপনিষদ ছাড়া আর কিছুই উদ্ধৃত করি না। আর উপনিষদের মধ্যে যা আছে:তা হল শক্তি। বেদান্ত ও অন্য সব কিছুরই সারবস্তু ঐ একটি কথা—শক্তি। বুদ্ধের শিক্ষা ছিল প্রতিরোধহীনতা বা অহিংসা। কিন্তু আমার মনে হয় উপনিষদ ঐ একই জিনিষ শিক্ষা দেওয়ার আরও ভাল উপায়। কারণ অহিংসার মধ্যে আছে প্রচণ্ড এক দুর্বলতা। প্রতিরোধ-ভাবনা জন্মায় দুর্বলতা থেকে। এক বিন্দু সাগরজলকে শাস্তি দেওয়া বা তার ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা আমাদের মনে হবে না। তা আমাদের কাছে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কিন্তু একটা মশার কাছে তা অত্যন্ত গুরুতর। আমাদের সমস্ত আঘাতকেই এমনিভাবে অগ্রাহ্য করতে হবে। শক্তি ও নির্ভয়! আমার নিজের আদর্শ সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিহত সেই সাধুটি যিনি বুকে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে এই বলে মৌনভঙ্গ করেছিলেন 'তুমিও তিনি'।"

"এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, 'এই ভাবনা-রীতিতে রামকৃষ্ণের স্থান কি? তিনি হচ্ছেন লক্ষ্যে পৌছোনোর উপায়—এক আশ্চর্য চেতনাহীন উপায়! তিনি নিজেকে বুঝতে পারেননি। সাগরপারের এক বিচিত্র মানুষ—এ ছাড়া ইংলণ্ড বা ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি সেই মহাজীবন যাপন করে গেছেন। আমি তার তাৎপর্য বুঝতে পারি। কখনও তিনি কারোর সম্বন্ধে কোন নিন্দার কথা উচ্চারণ করেননি। একবার আমি বীভৎস আচারের এক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তিন ঘণ্টা ক্রুদ্ধ সমালোচনা করছিলুম——তিনি শান্ত হয়ে সব শুনলেন। আমার কথা শেষ হলে বৃদ্ধ মানুষটি

বললেন : 'হয়তো প্রত্যেক বাড়িতেই একটি করে মেথর ঢোকার পেছনের দরজা আছে—এও সেইরকম ধরে নাও '

"এখনও পর্যন্ত আমাদের ভারতীয় ধর্মের প্রধান দোষ হল যে তা দুটি মাত্র কথা জানে—আত্মত্যাগ ও মুক্তি! এখানে শুধু মুক্তি! গৃহস্থের জন্যে কিছু নেই।

"কিন্তু এরাই সেই সব মানুষ যাদের আমি সাহায্য করতে চাই। সব আত্মাই কি এক রকম নয়? সকলের লক্ষ্যও কি এক নয়?

"আর, তাই শিক্ষার মধ্যে দিয়েই জাতিকে শক্তি দিতে হবে।"

২৯। পুরাণ হচ্ছে মহান আদর্শগুলিকে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে হিন্দুধর্মের প্রয়াস। ভারতবর্ষে একটি মন এই প্রয়োজনের কথা আগে ভাবতে পেরেছিল—কৃষ্ণের। সম্ভবত তিনিই পৃথিবীর মহত্তম মানব।

ভারতবর্ষে প্রতি যুগে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি করে চক্র দেখা যায়—চরম আত্মনিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে চরম অমিতাচার পর্যন্ত বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি স্তর এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আবার ঐ একই সময়ে একটি আধ্যাত্মিক চক্রও সর্বদাই গড়ে উঠতে থাকে যাতে বোঝা যায়, উদ্দেশ্যের সাধন হিসেবে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রিয়ের বিনাশ পর্যন্ত—লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রত্যেকটি ধাপেই ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটছে। এইভাবে সর্বদাই যেন একটি অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের পরিপূরক দুটি বিপরীত চক্র আবর্তিত হচ্ছে।

"হ্যাঁ।" বৈষ্ণবধর্ম বলে—"বাবা, মা, ভাই স্বামী বা সন্তানের প্রতি এই যে প্রচণ্ড ভালবাসা—এ সমস্তই সংগত। এ সবই ঠিক শুধু তুমি যদি মনে করতে পার যে কৃষ্ণ তোমার সন্তান ও তোমার শিশুসন্তানকে খেতে দিয়ে তুমি কৃষ্ণকেই খাওয়াচ্ছ।" "ইন্দ্রিয় সংযম কর। ইন্দ্রিয়কে দমন কর"—বেদান্তের এই ঘোষণার বিপরীত ছিল চৈতন্যের এই উদাত্ত আহ্বান—"ইন্দ্রিয় দিয়েই ভগবানের উপাসনা কর।"

"ভারতবর্ষকে আমি তরুণ ও জীবন্ত এক সত্তা মনে করি। ইউরোপও তরুণ এবং প্রাণময়। এই দুইয়ের একটিও ক্রমবিকাশের এমন কোন পর্যায়ে পৌঁছোয়নি যাতে আমরা এদের নিয়ম-বিধির নির্ভয়ে সমালোচনা করতে পারি। এরা যেন দুটি মহান পরীক্ষা—যার কোনটিই এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। ভারতবর্ষে আমাদের রয়েছে সামাজিক সাম্যবাদ—তার চারধারে রশ্মি বিকীর্ণ করছে অদ্বৈতের আলো, যার অর্থ হল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আর ইউরোপে তোমরা হচ্ছ সমাজগতভাবে ব্যক্তিতাবাদী। কিন্তু তোমাদের চিন্তাধারা দ্বৈতবাদী, যাকে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ বলা যায়। এইভাবে একটিতে আছে ব্যক্তিতাবাদী চিন্তাধারা সুরক্ষিত নানা সামাজিক বিধিবিধান ও অন্যটিতে সাম্যবাদী-ভাবনার বেড়া দিয়ে ঘেরা ব্যক্তিতাবাদী বিধান সমষ্টি।

"এখন আমাদের উচিত ভারতীয় এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেভাবে চলছে,

সেইভাবেই তাতে সহায়তা করা। এখন যে অবস্থা আছে—তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে উন্নতির চেষ্টা না করলে সমস্ত আন্দোলনই ঐ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যর্থ হয়ে যাবে। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি ইউরোপে আমি বিয়ে করাকে বিয়ে না করার মতই শ্রদ্ধা করি। এ কথা কখনও ভুলোনা যে, গুণ দিয়ে যেমন, তেমনি তার দোষ দিয়েও মানুষ মহান ও পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই জন্তেই কোন জাতির স্বকীয় চরিত্র বিলোপ করতে চাওয়া ঠিক নয়—যদিও জানি, সে জাতির চরিত্র যে দোষে পূর্ণ এমন কথা প্রমাণ করা শক্ত হবে না।

৩০। "তোমরা সব সময়েই বলতে পার—প্রতিমা ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিমা এমন ভুল চিন্তা তোমাদের ছাড়তে হবে।"

৩১। একবার কোন উপলক্ষ্যে স্বামীজী হটেন্‌টটদের বস্তুরতি* বা অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তির নিন্দা করতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললেন: "বস্তুরতি কি আমি জানি না"। তখন বস্তুকে পর্যায়ক্রমে পূজা করা, প্রহার করা ও ধন্যবাদ জানানের বীভৎস এক ছবি দ্রুত তাঁর সামনে তুলে ধরা হল।—"আমি তাই করি!" তিনি বলে উঠলেন। "বুঝতে পারছ না"—মুহূর্তকাল পরে তিনি দীনদরিদ্রের প্রতি যে অন্যায় করা হয়, তার বিরুদ্ধে উষ্মার সঙ্গে বলে চললেন—"তোমরা বুঝছ না কেন যে এতে বস্তুরতি কিছু নেই। হায়! তোমাদের মন ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে গেছে। তোমরা অনুভব করতে পার না যে শিশুই ঠিক! শিশু সর্বত্র ব্যক্তিকে দেখে। শিশুর সেই দেখার শক্তি, জ্ঞান আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। কিন্তু শেষে উচ্চতর জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আবার তা ফিরে পাই। শিলা, লাঠি, গাছ—যাবতীয় বস্তুর সঙ্গেই শিশু এক প্রাণময় শক্তির যোগ স্থাপন করে। আর সত্যিই কি তাদের অন্তরালে কোন এক প্রাণময় শক্তি নেই? এ তো বস্তুরতি নয়, এ হল প্রতীকতা।** এটা দেখতে পাও না?"

৩২। একদিন তিনি সত্যভামার যজ্ঞের গল্প বলছিলেন। "প্রাচীন হিন্দুধর্ম"—তিনি বলতে লাগলেন—"শ্রুতি বা শব্দকেই সবচেয়ে বড় মনে করেছে। 'বস্তু' হল—প্রাগ্‌বিদ্যমান ও শাশ্বত ধারণার (idea) অতি ক্ষীণ এক অভিব্যক্তি মাত্র! আর সেইজন্যেই ঈশ্বরের নামই সব ও সনাতন মানসে ঈশ্বর নিজে, সেই ধারণার শুধু বিষয় বা মূর্তিরূপ। ব্যক্তি 'তুমি'র চেয়ে তোমার নাম সীমাহীনভাবে পূর্ণতর। তাই কি বলছ, সে সম্বন্ধে সাবধান!"

৩৩। "এমন কি গ্রীক দেবতাদেরও উপাসনা করতে আমি প্রস্তুত নই, তার কারণ, তাঁরা মানব জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন! শুধু তাঁদেরই পূজা করা উচিত যাঁরা

---

*Fetishism

**Symbolism

আমাদের মতো কিন্তু মহত্তর। দেবতা ও আমার মধ্যের তারতম্য যেন কেবল মাত্রাগত হয়।"

৩৪। "একটি পাথর পড়ে কীটকে পিষ্ট করে ফেলল। এই দেখে আমরা অনুমান করে নিই পাথর পড়লেই পোকামাকড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারটিকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার কাজে লাগাই কেন? কেউ কেউ বলবেন···পূর্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু ধরা যাক এরকম ঘটনা প্রথম ঘটল! একটি শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেল—সে কেঁদে উঠবে। তাহলে কি বলব অতীত জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা কাজ করছে? কিন্তু তার প্রয়োগ ভবিষ্যতে হল কেন? এর কারণ, বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে একটা পারস্পরিক বাস্তব সম্পর্ক—একটা ব্যাপকতা রয়েছে। আমাদের শুধু দেখা দরকার যে বস্তুর গুণ বা ধর্ম যেন দৃষ্টান্তটিকে ছাড়িয়ে অতিব্যাপ্ত না হয় বা আবার অব্যাপ্তি দোষও না ঘটে। মানুষের যা কিছু জ্ঞান তা নির্ভর করে এই বিচার-ক্ষমতার ওপর।"

"হেত্বাভাস (fallacy) সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নিজেই একটি প্রমাণ হতে পারে যদি তার সাধন-প্রণালী ও সেই উপলব্ধির নিরবচ্ছিন্নতা—এ সমস্তই যথাযথভাবে বজায় রাখা যায়। রোগ বা ভাবাবেগ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে। সেইজন্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও অনুমিতির (inference) অন্যতম পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে দেখ, মানুষের যাবতীয় জ্ঞানই অনিশ্চিত ও তা ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব। প্রকৃত সাক্ষী কাকে বলব? প্রকৃত সাক্ষী তিনিই—যাঁর কাছে যখন কিছু বলা হয়, তাঁর কাছে তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে ওঠে। এই কারণেই বেদ সত্য, কারণ তাতে যোগ্য অধিকারীর সাক্ষ্য আছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কি কারুর একচেটিয়া? না। ঋষি, আর্য, ম্লেচ্ছ—সকলেরই তা আছে।

"আধুনিক বাংলা মনে করে, প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিরই এক ব্যাপার-বিশেষ এবং সাদৃশ্য বা উপমিতি* ও ন্যায়-সমতা** হল মন্দ অনুমান। তাহলে যথার্থ প্রমাণ হল মাত্র দুটি—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং অনুমান।

"একদল লোক, দেখতে পাবে, বাহ্য প্রকাশকেই অগ্রাধিকার দেয়; আর এক দল—মনোগত ভাবনাকে। কোন্‌টা আগে—পাখি আগে তারপর ডিম, না ডিম আগে তারপর পাখি? তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল? এ এমন এক সমস্যা যার সমাধান নেই। এ কথা বাদ দাও! মায়া থেকে উদ্ধার পাও।

৩৫। "পৃথিবীই যদি লোপ পায় তা নিয়ে আমি ঘামাব কেন? আমার দর্শন অনুযায়ী, তুমি জান, তা হলে খুব ভাল হয়। কিন্তু আসলে আমার যা

* Analogy

** Parity of reasoning

প্রতিকূল শেষকালে তা-ই আমার পক্ষে হয়ে যায়। আমি কি কালীর সৈন্য নই ?”

৩৬। “এ কথা সত্যি, আমি বিশ্বাস করি যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু আমি নিজেও তো তাই। সেইভাবে অনুপ্রাণিত তুমি—তোমার শিষ্যেরাও তাই হবে, তাদের পর তাদের শিষ্যেরাও তাই হবে—আর এইভাবে চলবে কালের শেষ সীমা পর্যন্ত !

“বুঝতে পারছ না কেন, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে তত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা আবদ্ধ থাকার যুগ চলে গেছে। ভালোর জন্যে হোক বা মন্দের জন্যেই হোক, সেদিন চিরতরে মুছে গেছে—আর তা ফিরে আসবে না। ভবিষ্যতে, সত্যের দরজা পৃথিবীর সকলের জন্যে খোলা রাখতে হবে।”

৩৭। “বুদ্ধ সর্বনাশা ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে সমস্ত পৃথিবীকে উপনিষদের উচ্চভূমিতে তোলা যাবে। আর স্বার্থবুদ্ধি সব নষ্ট করে দিলে। কৃষ্ণ ছিলেন আরও প্রজ্ঞাবান, কারণ তিনি বেশি কূটনীতিজ্ঞ। কিন্তু বুদ্ধ কোন আপোস করবেন না। আমাদের আগের পৃথিবী আপোস করার জন্যে এমনকি অবতারকেও ধ্বংস হতে দেখেছে—দেখেছে তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলতে, বিলুপ্ত হয়ে যেতে ! কিন্তু মুহূর্তকালের জন্যে আপোস করলে বুদ্ধ নিজের জীবনে সারা পৃথিবীতে ঈশ্বররূপে পূজিত হতে পারতেন। আর তাঁর শুধু উত্তর ছিল এই—বুদ্ধত্ব হচ্ছে সিদ্ধিলাভ, তা কোন ব্যক্তি নয়। সত্যিই, পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ—পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃতিস্থ মানুষ !”

৩৮। পাশ্চাত্য দেশে লোকে স্বামীজীকে বলেছিল, বুদ্ধ যদি ক্রুশ-বিদ্ধ হতেন তাহলে তাঁর মাহাত্ম্য আরও মর্মস্পর্শী হত ! “ক্রুশ-বিদ্ধ” করাকে স্বামীজী “রোমীয় বর্বরতা” এই নিন্দিত আখ্যা দিলেন এবং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বললেন : “নীচতম ও সবচেয়ে জান্তব আসক্তি হল কর্মের প্রতি আসক্তি। সেইজন্যে পৃথিবী চিরকালই মহাকাব্যকে ভালবাসবে। সৌভাগ্যবশত ভারত কখনও ‘দুরারোহ অতলগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়া’ মিল্টনের জন্ম দেয়নি। এ সবের বদলে ভারত গ্রহণ করেছে ব্রাউনিংয়ের দুছত্র কবিতা।” তাঁর মতে রোমানদের যা আকৃষ্ট করেছে তা হল ঘটনাটির মহাকাব্যময় বলিষ্ঠতা। এই ক্রুশ-মৃত্যুই খ্রীষ্টধর্মকে রোমীয় জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। “হ্যাঁ, হ্যাঁ”—তিনি আবার বললেন, “তোমরা পশ্চিমীরা চাও কাজ। জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ সাধারণ ঘটনাতেও যে কাব্যসুষমা আছে তোমরা এখনও তা উপলব্ধি করতে পারনি। তরুণী মা তার মৃত শিশুপুত্রকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে এল—সেই গল্পটির চেয়ে বেশি সৌন্দর্য আর কি হতে পারে ? কিংবা ছাগলের সেই কাহিনী ! বুঝতে পারছ, মহাসন্ন্যাস ভারতবর্ষে নতুন কিছু নয়।… কিন্তু, ‘নির্বাণের পরে’… …এর কাব্যগুণ লক্ষ্য কর !

“বৃষ্টি ভেজা রাত। তিনি এলেন রাখালের কুঁড়েঘরের কাছে…ফোঁটা ফোঁটা

বৃষ্টি-ঝরে পড়া ছাদের তলায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টি পড়ছে প্রবল ধারায়···বাতাস বইছে জোরে।

কুটিরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে এক ঝলকে রাখাল দেখলে একটি মুখ। সে ভাবল: 'ওহো গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী! ঐখানেই থাক। তোমার পক্ষে ঐ তো ভালো জায়গা! আর তারপর গাইতে আরম্ভ করল:

'আমার যত গবাদি পশু ফিরে এসেছে মাঠ থেকে···আগুন জ্বলছে তপ্ত, উজ্জ্বল। আমার স্ত্রী রয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে·· আমার শিশু সন্তানেরা মধুর ঘুমে ডুবে আছে···তাহলে মেঘের দল! যদি চাও, আজ রাত্রিতে ধারাবর্ষণ কর!'

"বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন: 'আমার মন সংযত, সংহৃত আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম, আমার চিত্ত অবিচল। তাহলে মেঘের দল, যদি চাও, আজ রাত্রিতে ধারাবর্ষণ কর!'

"রাখাল আবার গাইলে: 'মাঠের ধান কাটা সারা, গোলায় খড় তোলা শেষ। নদী জলে ভরা, পথঘাট সব ভাল। তাহলে মেঘের দল, যদি চাও আজ রাত্রিতে ধারাবর্ষণ কর।'

"এইভাবে গান চলতে লাগত···শেষকালে অনুশোচনা ও বিস্ময়ে রাখাল উঠে এল ঘরের বাইরে ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

"কিংবা সেই নাপিতের কাহিনীর চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে?
'পুণ্যজীবন তিনি—আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেলেন,
চলে গেলেন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে; নাপিত আমি!
আমি ছুটে গেলুম, কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়ালেন, অপেক্ষা করলেন আমার জন্যে
অপেক্ষা করলেন আমার জন্যে, নাপিত আমি!
আমি বললুম: 'প্রভু, তোমার সঙ্গে আমি কি কথা বলতে পারি?
তিনি বললেন—'পার'!
তিনি বললেন: 'পার'! আমাকে—নাপিত আমি!
আমি জিজ্ঞাসা করলুম: 'নির্বাণ কি আমার মত লোকের জন্যেও'?
আর তিনি বললেন: 'হ্যাঁ'!
নির্বাণ আমার জন্যেও—নাপিত আমি!
আমি বললুম—'প্রভু, আমি কি পারি তোমার অনুগমন করতে?'
তিনি বললেন 'নিশ্চয় পার!'
আমিও পারি তাঁর অনুগমন করতে, নাপিত আমি!
আমি বললুম—'প্রভু, আমি কি পারি তোমার কাছে থাকতে?
তিনি বললেন: 'পার!'
আমাকেও তিনি বললেন—কাছে থাকতে পার—দীন নাপিত আমি!"

৩৭। "বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে বৈষম্যের একটি প্রধান কথা হল—বৌদ্ধধর্ম যখন বলেছে 'এ সবই মায়া বলে জান'; হিন্দুধর্ম বলে: 'উপলব্ধি কর যে মায়ার

মধ্যেই আছে পরম সত্য'। এই উপলব্ধি কেমন করে ঘটাতে হবে সে বিষয়ে হিন্দুধর্ম আগে থেকে কোন কঠোর বিধান নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন একমাত্র সন্ন্যাসজীবনের মাধ্যমেই পালন করা সম্ভব। হিন্দুধর্মে জীবনের যে কোন অবস্থাতেই তা সফল করা যায়। সবই সেই "এক"—"সত্যে"র কাছে যাওয়ার বিভিন্ন পথ। ধর্মবিশ্বাসের পরম ও মহত্তম যত উক্তি আছে—তার একটি বলানো হয়েছে কসাইয়ের মুখ দিয়ে। সে এক বিবাহিতা নারীর আদেশে একজন সন্ন্যাসীকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিল। তাই দেখি, বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্ম কিন্তু সন্ন্যাসের মহিমা স্বীকার করেও দৈনন্দিন কর্তব্যের প্রতি—তা সে যা-ই হোক না কেন, একনিষ্ঠ থাকারই ধর্ম থেকে গেছে এবং মনে করেছে যে এর মধ্যে দিয়েই মানুষ ঈশ্বর লাভ করতে পারে।"

৪০। "দলের নিয়মাবলী তৈরী কর ও তোমাদের চিন্তাকে নির্দিষ্ট রূপ দাও।"—স্বামীজী নারীর সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ-প্রসঙ্গে বললেন। "আর সম্ভব হলে তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার একটু জায়গা রেখ। কিন্তু এ কথা মনে রেখ যে সারা পৃথিবীতে কোন সময়ে আধ ডজনের বেশি লোককে এর জন্যে তৈরী পাবে না। সম্প্রদায় নিশ্চয় থাকবে কিন্তু সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে ওঠারও যেন উপায় থাকে। তোমাদের নিজেদের যন্ত্র নিজেদেরই গড়ে নিতে হবে। আইন কর—কিন্তু এমনভাবে কর যাতে কেউ যদি আইনের উর্ধ্বে উঠতে পারে তখন সে যেন আইনকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। আমাদের মৌলিকতা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সমন্বয়-সাধন। সন্ন্যাস-জীবনেও তা করা সম্ভব।"

৪১। "দুটি ভিন্ন জাতি মিশে এক হয়ে যায় ও তার মধ্যে থেকে তখন আর একটি বিশিষ্ট জাতিরূপ উদ্ভূত হয়। সেই নতুন জাতি তখন নিজেকে অন্যের সঙ্গে মিশ্রণ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। আর এইখানেই জাতিপ্রথার শুরু। আপেলের কথাই ভাব। সবচেয়ে ভাল জাতের আপেলের উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন জাতির সংকরের ফলে। কিন্তু একবার মিশ্রণ হয়ে গেলে আমরা সেই শ্রেণীটিকে একেবারে নির্ভেজাল রেখে দিতে চাই।"

৪২। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"দেবতা-পূজায় প্রতিমা নিশ্চয় থাকবে কিন্তু তোমরা তা বদলে নিতে পার। কালীকে সব সময়ে যে একই ভঙ্গীতে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। তাঁকে নতুন নতুন ভাবে আঁকার কথা ভাবতে তোমার মেয়েদের উৎসাহ দাও। সরস্বতীর একশ' রকম রূপ কল্পনা কর। মেয়েরা নিজেদের ভাবনাকে মূর্তিরূপ দিক, ছবিতে ফুটিয়ে তুলুক!

"ঠাকুর-ঘরে বেদীর সব চেয়ে নীচের ধাপের কলসটি যেন সর্বদা জলভরা থাকে ও বিরাট তামিল ঘৃতদীপগুলি যেন সবসময়ে জ্বলে। এ ছাড়াও অবিরাম

ভজন-পূজনের যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কোন কিছুই এর চেয়ে বেশি হিন্দুভাবনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না।

"কিন্তু সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান যেন বৈদিক হয়। পূজার সময় বৈদিক অগ্নি জ্বালানোর জন্যে একটি বেদবিধি-অনুযায়ী বেদী থাকা উচিত ও হোমে যোগ দেওয়ার জন্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন উপস্থিত থাকে। এ একটি এমন অনুষ্ঠান যা সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

"নানারকমের জীবজন্তু চারপাশে রেখ। গোরু দিয়েই তার সুন্দর সূচনা হতে পারে কিন্তু তোমাদের কুকুর, বিড়াল, পাখি ইত্যাদিও যেন থাকে। এদের খাওয়ানো ও দেখাশোনা করার জন্যে ছেলেমেয়েদের একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিও।

"তারপর আছে জ্ঞান-যজ্ঞ। এটিই সকলের চেয়ে সুন্দর। তোমরা কি জান, ভারতবর্ষে শুধু বেদই নয়, প্রতিটি গ্রন্থ—ইংরিজি বা ইসলাম গ্রন্থও পবিত্র? সমস্ত বই পবিত্র।

"পুরোনো শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত কর! আশ্রমের মেয়েদের ক্ষীর দিয়ে ফল গড়তে শেখাও। শিল্পসম্মত রান্না, সেলাইয়ের পাঠ দাও। তারা ছবি আঁকা, ছবি তোলা, কাগজ কেটে নানা নক্‌শা তৈরী করা, সোনারূপোর কারুকাজ, সূচী-শিল্প শিখুক। লক্ষ্য রাখ প্রত্যেকটি মেয়ে যেন এমন কিছু জানে যাতে দরকার হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

"আর, দেখো, যেন মানুষকে কখনও ভুলে যেও না। লোকহিতব্রতী মানব-পূজার ভাবনা ভারতবর্ষের মর্মমূলে, কিন্তু তা কখনও উপযুক্তভাবে নির্দিষ্ট মূর্তি পায়নি। তোমার ছাত্রীরা তাকে পরিণত রূপ দিক। তাকে কাব্য করে তোল, শিল্প করে তোল। রোজ স্নানের পর ও খাওয়ার আগে তারা যদি পায়ের তলায় বসে ভিখিরির পূজো করে তাহলে তা তাদের একাধারে মন ও হাতের চমৎকার ব্যবহারিক শিক্ষা হয়ে উঠবে। আবার ধর কোন কোন দিন পূজো হবে শিশুদের—তোমাদের নিজেদেরই ছাত্রছাত্রীদের। কিংবা তোমরা অন্য কারোর বাচ্চাদের নিয়ে এলে ও তাদের সেবাযত্ন করলে খাওয়ালে! মাতাজী* আমাকে কি বলেছিলেন জান? তিনি বলেছিলেন: 'স্বামীজি! আমার কোন সম্বল নেই। কিন্তু আমি পূজা করি এই পুণ্যাত্মাদের ও তারাই আমাকে মুক্তি এনে দেবে।' বুঝতে পারছ, কুমারী-পূজা করে তিনি মনে করতেন যে তিনি উমার আরাধনা করছেন। আর, কোন বিদ্যালয় আরম্ভ করার পক্ষে এ এক অতি সুন্দর কল্পনা!"

৪২। "পাশ্চাত্যের কাছে বিবাহ-চিন্তার মধ্যে আইনগত বন্ধনের অতীত সব কিছু পড়ে। ভারতবর্ষে সে ক্ষেত্রে বিয়ের অর্থ হল দুটি নরনারীকে সমাজ এক গ্রন্থিতে বেঁধে দিয়েছে—অনন্তকালের জন্যে। জন্মজন্মান্তরে এরা দুজন দুজনকে বিয়ে করতে বাধ্য, তাদের ইচ্ছা থাক বা না থাক। স্বামী-স্ত্রীর একজন আর

*তপস্বিনী মাতাজী কলকাতার মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী।

এক জনের সমস্ত পুণ্যের অর্ধাংশভাগী। যদি দেখা যায়, একজন এ জীবনে নৈরাশ্যজনকভাবে অনেক পেছনে পড়ে আছে—তাহলে আর একজনের কাজ হল অপেক্ষা করে থাকা ও প্রহর গোনা, যতক্ষণ না তার জীবনসঙ্গী তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারছে।

৪৩। "পাশ্চাত্যের লোকেদের মুখে আমি যখন এত বেশি ব্যক্ত-চৈতন্যের কথা বলতে শুনলুম তখন যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। ব্যক্ত-চৈতন্য? কি দাম ব্যক্ত-চৈতন্যের! মগ্ন-চৈতন্যের অতলস্পর্শী গভীরতা ও অতিচৈতন্যের মহিমার উচ্চ শিখরের তুলনায় ব্যক্তচৈতন্য কতই না অকিঞ্চিৎকর! এ বিষয়ে আমি কখনোই বিভ্রান্ত হতে পারি না, কেননা আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেছি তিনি দশ মিনিটের মধ্যে মগ্নচৈতন্য থেকে মানুষের সমগ্র অতীত জীবনের কথা বুঝে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ এবং অন্তর্নিহিত শক্তি নির্ণয় করে দিয়েছেন।

৪৪। "এ সমস্ত (আলৌকিক দর্শন ইত্যাদি) হচ্ছে গৌণ বিষয়। এগুলি আসল যোগ নয়। এসব ক্ষমতার যদি কিছু উপযোগিতা থাকে তা হল এর দ্বারা আমাদের উক্তির সত্যতা পরোক্ষভাবে হয়তো কিছুটা প্রমাণিত হয়। স্থূল বস্তু-সত্তার অন্তরালে আরও সে কিছু আছে—তারই একটুখানি আভাস এর মধ্যে দিয়ে আমরা পাই। কিন্তু যারা এ সব নিয়ে সময় নষ্ট করে তারা গুরুতর বিপদ ডেকে আনে।

"মনোগত এই সব ব্যাপারকে আমরা 'সীমান্ত'-সমস্যা" নাম দিতে পারি। এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাতে কোন নিশ্চয়তা বা স্থিরতা নেই। সেইজন্যেই এদের আমি 'সীমান্ত-সমস্যা' বলেছি। সীমারেখা সব সময়েই সরে যায়।"

৪৫। "অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মা আসে না যায়ও না ও বিশ্বজগতের সমস্ত পরিমণ্ডল বা স্তর আকাশ এবং প্রাণেরই বহু বিচিত্র সৃষ্টি। এ কথার তাৎপর্য: সবচেয়ে নীচে বা সবচেয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট হচ্ছে সৌরলোক—দৃশ্যমান জগৎ এর অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রাকৃতিক শক্তিরূপে প্রাণ এবং আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থরূপে প্রতীত হয়। পরবর্তী স্তর চান্দ্রলোক—যা সৌরলোককে পরিবেষ্টিত করে আছে। এ কিন্তু মোটেই চন্দ্র নয়, এ হল দেবতাদের বাসভূমি অর্থাৎ এখানে মনোগত শক্তিরূপে প্রাণের ও তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম কণিকারূপে আকাশের অভিব্যক্তি ঘটে। এই স্তরকে অতিক্রম করে বৈদ্যুত-লোক অর্থাৎ এমন এক অবস্থা যা আকাশ থেকে অবিচ্ছেদ্য ও বিদ্যুৎ-শক্তি, শক্তি না পদার্থ বলা শক্ত। এর পর ব্রহ্মলোক—যেখানে প্রাণ বা আকাশ কিছুই নেই কিন্তু দুই-ই আদিম কর্মশক্তি—মনোবস্তুতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানে প্রাণ বা আকাশ কোনটিই না থাকায়, জীব সমস্ত বিশ্বকে মহৎ বা মনের সমষ্টি বা যোগফলরূপে ধারণা করে। এর অভিব্যক্তি ঘটে 'পুরুষ'রূপে—এক বিমূর্ত, সর্বজনীন আত্মা,

কিন্তু তা পরম নয় কারণ তখনও সেখানে বহুত্ব আছে। এখান থেকেই অবশেষে জীব যা চরম—সেই অদ্বৈতকে পায়। অদ্বৈতবাদ বলে যে এ সমস্তই হল নানা দৃশ্য যা একের পর এক জীবের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে ও জীবের যাওয়া বা আসা কিছুই নেই এবং একইভাবে বর্তমান দৃশ্যও অভিক্ষিপ্ত বা আরোপিত। সৃষ্টি ও প্রলয়ও একই ক্রমানুসারে ঘটবে শুধু একটির অর্থ পিছু হটা অন্যটির বেরিয়ে আসা।

"এখন কথা হল যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি যখন তার নিজের জগতকেই শুধু দেখতে পায়, তাহলে সেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে তার নিজের বন্ধনের ফলেই ও তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতেরও বিলয় ঘটে, যদিও অন্য যারা বদ্ধ তাদের কাছে তার অস্তিত্ব থেকে যায়। জগৎ হচ্ছে নাম ও রূপ নিয়ে। সমুদ্রের ঢেউ ততক্ষণই ঢেউ যতক্ষণ তা নাম ও রূপে বদ্ধ। ঢেউ যদি মিলিয়ে যায় তখন তা সমুদ্রই এবং ঐ নাম-রূপও তৎক্ষণাৎ চিরতরে হারিয়ে যায়। এতে বোঝা যায় যে ঢেউয়ের নাম-রূপ জল ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়—যে জল আবার ঢেউয়ে পরিণত হয়েছে ঐ নাম-রূপের জন্যেই। কিন্তু তাই বলে ঐ নামও রূপ মাত্রই কিন্তু ঢেউ ছিল না। জলে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যু ঘটে কিন্তু অন্য ঢেউয়ের সঙ্গে সংবদ্ধ অন্য নাম ও রূপ বেঁচে থাকে। এই নাম ও রূপকেই মায়া বলা হয় এবং জল হল ব্রহ্ম। ঢেউ কিন্তু সমস্তক্ষণই জল ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না কিন্তু যতক্ষণ তা ঢেউ ততক্ষণ তার নাম ও রূপ ছিল। আবার এই নাম ও রূপ এক মুহূর্তের জন্যেও কিন্তু ঢেউ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না, যদিও ঢেউ জলরূপে অনন্তকাল ধরে নাম এবং রূপের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু নাম ও রূপকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তাই তা আছে এমন কথাও বলা যায় না। তবু তা শূন্যতাও নয়। একেই বলে মায়া।"

৪৬। "বুদ্ধের চাকরদের চাকর যারা, আমি তাদের চাকর। তাঁর মতো আর কে ছিলেন?—সেই প্রভু যিনি নিজের জন্যে কখনও কোন কাজ করেননি—যাঁর হৃদয় সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছে! তিনি ছিলেন এমনই করুণাময় যে তিনি—রাজকুমার ও ভিক্ষু—ছোট্ট একটি ছাগলকে বাঁচাতে জীবন দিতে প্রস্তুত। এমনই প্রেমময় যে বাঘিনীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—অন্ত্যজের আতিথ্যে নিজেকে নিবেদন করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন তাকে। আমি যখন বালক তিনি আমার ঘরে এসেছিলেন। আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলুম। কারণ আমি জানতুম তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।"

৪৭। "তিনি (শুকদেব) আদর্শ পরমহংস। মানুষের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন সেই লোক অস্তিত্ব, জ্ঞান ও পরম আনন্দের অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দের অখণ্ড সমুদ্র থেকে অঞ্জলি ভরে পান করার অধিকার যিনি পেয়েছিলেন। ঐ সমুদ্রের তটে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের বজ্রনির্ঘোষ শুনেই অধিকাংশ মুনি

ঋষিদের দেহান্তর ঘটে। অল্প লোকেই তার আভাস পায়—আরও কম লোক পারে তার আস্বাদ নিতে। কিন্তু তিনি আনন্দের সাগর থেকে পান করেছিলেন।"

৪৮। "আত্মনিবেদন ছাড়া ভক্তির কি কল্পনা করা যায়?"

৪৯। "আমরা না দুঃখ, না সুখ—কোনটিরই পূজা করি না। দুঃখ-সুখের মধ্যে দিয়ে আমরা তাকেই পেতে চাই যা এই দুইয়েরই অতীত।"

৫০। শংকরাচার্য বেদের ছন্দ—জাতীয় সুরটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। সত্যি, আমি সর্বদাই কল্পনা করি যে তাঁর ছেলেবেলায় তিনি আমার মত দিব্য সব দর্শন পেতেন ও আমাদের প্রাচীন সংগীত তিনি ঐ ভাবে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। যে ভাবেই হোক—বেদ ও উপনিষদের সৌন্দর্যের স্পন্দন অনুভব করা ছাড়া তাঁর সারা জীবনের কাজ আর কিছুই ছিল না।

৫১। "যদিও মায়ের ভালবাসা কোন কোন দিক দিয়ে আরও বড়, তাহলেও সমস্ত পৃথিবী নরনারীর প্রেমকে ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কের প্রতিরূপ বলে গ্রহণ করে। আর কোন সম্পর্কের এমন বিপুল ঊর্ধ্বীকরণের ক্ষমতা নেই। প্রিয়তমকে যা কল্পনা করা যায়—তিনি সত্যিই তাই হয়ে ওঠেন। এই ভালবাসা তার দয়িতকে রূপান্তরিত করে দেয়।"

৫২। "জনক হওয়া কি এত সহজ—সিংহাসনের ওপর পরিপূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে বসে থাকা, সম্পদ, যশ, স্ত্রী, পুত্র সব কিছুই অকিঞ্চিৎকর ভাবা?। পশ্চিমে লোকের পর লোক আমায় বলেছে যে তারা এই অবস্থায় পৌঁছোতে পেরেছে। কিন্তু আমি শুধু তাদের এইটুকুই বলতে পারলুম 'ভারতে এমন মহাপুরুষ তো কই জন্মান না!' "

৫৩। "নিজেকে বলতে, তোমার ছেলেমেয়েদের শেখাতে কখনও ভুলো না যে—একটি জোনাকি ও আলোকচ্ছটাময় সূর্যের মধ্যে, অসীম সমুদ্র ও ছোট্ট একটি পুকুরের মধ্যে, একটি সর্ষে-বীজ ও মেরুপর্বতের মধ্যে যে পার্থক্য—গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যেও সেই পার্থক্য।

"আর সমস্তই ভয়ে পরিপূর্ণ, একমাত্র সন্ন্যাসই নির্ভয়।

"প্রতারক সাধুরা ও যাঁরা নিজেদের ব্রত রক্ষা করতে অপারগ হয়েছেন তাঁরাও ধন্য—কেননা তাঁরাও আদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ও তাই কিছু পরিমাণে অন্তত: অন্যদের সাফল্যের কারণ হয়েছেন। আমরা যেন নিজেদের আদর্শকে—কখন—কখনও না বিস্মৃত হই!"

৫৪। "বহতা নদী নির্মল, নির্মল সেই ভিক্ষু যিনি চলেন।"

৫৫। "যে সন্ন্যাসী পাওয়ার কামনায় সোনার চিন্তা করেন তিনি আত্মহত্যা করছেন।"

৪৬। "মহম্মদ বা বুদ্ধ যদি ধার্মিক হয়ে থাকেন—তাতে আমার কি? তাতে কি আমার ভালো কিংবা মন্দ হওয়ার কিছু বদলে যাবে? আমাদের নিজেদের জন্যেই, নিজেদের দায়িত্বে ভাল হতে হবে।"

৪৭। "তোমরা—এ দেশের লোক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারাবার ভয়ে এত শঙ্কিত! অথচ এখনও তোমরা ব্যক্তিই নও! যখন তোমরা তোমাদের পূর্ণ স্বভাব উপলব্ধি করবে তখনই তোমরা যথার্থ ব্যক্তি-সত্তা অর্জন করবে। তার আগে নয়। আর একটা কথা আমি এদেশে অনবরতই শুনছি তা হল, প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। তোমরা কি জান না— পৃথিবীতে যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা প্রকৃতিকে জয় করে? যে কোন উন্নতিই করি না কেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করতে হবে।"

৪৮। "ভারতবর্ষে আমাকে অনেকে বলে যে আমার সাধারণ লোককে অদ্বৈত বেদান্ত শেখানো উচিত নয়। তার উত্তরে আমি বলি যে আমি একটি শিশুকেও তা বুঝিয়ে দিতে পারি। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করার পক্ষে কোন বয়সকেই—কম বলা যায় না।"

৪৯। "যত কম পড় ততই ভাল। গীতা ও বেদান্তের অন্য সব গ্রন্থ পড়। এইটুকুই তোমাদের দরকার। শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থার সমস্তটাই ভুল। কি করে চিন্তা করতে হয় তা জানার আগেই তথ্যের ভারে মনকে ভারাক্রান্ত করা হচ্ছে। প্রথমে শেখাতে হবে চিত্ত-সংযম। আমি যদি আবার নতুন করে শিক্ষা লাভ করতে পারতুম ও এ বিষয়ে আমার মতামত গ্রাহ্য হত, তাহলে সবচেয়ে আগে আমি নিজের মনকে দমন করতে শিখতুম, তারপর যদি ইচ্ছে হত তাহলে তথ্য সংগ্রহ করতুম। আমাদের শিখতে অনেক সময় লাগে তার কারণ আমরা ইচ্ছেমত নিজেদের মনকে একাগ্র করতে পারি না।"

৫০। "দুঃসময় যদি আসে তাতে কি হয়েছে? ঘড়ির পেণ্ডুলাম অন্য দিকে নিশ্চয় দুলবে। কিন্তু তাতে আরো ভাল কিছু হবে তা নয়। তাকে থামিয়ে দিতে হবে।"

৫১। হতভাগ্যরা! মতলববাজ বদমায়েস পুরুতরা যা কিছু শিখিয়ে দেয় এরা তাই অনুসরণ করে এবং তেমনি ভাবে নিজেদের অধঃপতিত করে। যত রাজ্যের তুকতাক আর ভাঁড়ামিকেই- এই সব পুরুত ঠাকুরেরা বেদ এবং হিন্দুধর্মের পরাকাষ্ঠা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। (আর মজার কথা হল, এই সব শয়তানের দল কিংবা তাদের পূর্ব পুরুষেরা গত ৪০০ প্রজন্মের মধ্যেও বেদগ্রন্থের একটি খণ্ড চোখেও দেখেনি।) কলিযুগের এই ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের হাত থেকে ঈশ্বর এই মানুষগুলিকে রক্ষা করুন।

৫২। .. প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠরাও এই পৃথিবীতে নানা ঝামেলায় কষ্ট পান, নানা বিপত্তি দেখা দেয় তাঁদের জীবনে। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগে। কিন্তু

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাটিও বুঝি যে এখানকার প্রতিটি জিনিসের অন্তর্বস্তু নিষ্পাপ ; বহিঃস্থলের তরঙ্গভঙ্গ যেমনই হোক না কেন গভীর প্রদেশে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি অনন্ত প্রেম ও পবিত্রতার অখণ্ড বনিয়াদ। যতদিন না আমরা এই মূলের সন্ধান পাই ততদিনই আমাদের যাতনা। তারপর একবার সেই অখণ্ড শান্তির পরিমণ্ডলে উপনীত হতে পারলে কোথায় লাগে বাত্যার হুঙ্কার আর ঝঞ্ঝার রোষ! ওসব আর গ্রাহ্যই হয় না। যুগপ্রাচীন শিলাখণ্ডের ওপর নির্মিত গৃহ কখনো কম্পমান হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যার সমগ্র জীবন অন্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে সেই আপনার ন্যায় একজন সৎ নিঃস্বার্থ এবং পুণ্যাত্মা ইতিপূর্বেই ঐ দৃঢ়তার বনিয়াদে উপনীত হয়েছেন, যাকে গীতায় স্বয়ং ভগবান আখ্যা দিয়েছেন "ব্রাহ্মণ-নির্বাণ" বলে।

৬৩। আমাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী ক্রোধ একটি ঘোর পাপ, সে ক্রোধ যদি "ন্যায়সঙ্গত" হয় তবুও। প্রত্যেকেরই উচিত তার নিজ ধর্ম অনুসরণ করা। আমি তো কখনো "ধর্মীয় ক্রোধ" আর "সাধারণ ক্রোধের" মধ্যে "ধর্মানুসারী হত্যাকাণ্ড" এবং "সাধারণ হত্যাকাণ্ড"র মধ্যে, "ধর্মসঙ্গত কুৎসাকীর্তন ও অধার্মিক কুৎসাকীর্তন"-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না। ও রকম "নৈতিক" পার্থক্য যেন আমাদের দেশ ও জাতির নীতিবোধের মধ্যে কোনো স্থান না পায়।

৬৪। কোন ঘটনার ব্যাখ্যা যদি তার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে বাইরে তার কারণ খুঁজে বেড়ানো অর্থহীন। জগৎ যদি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে, তাহলে বাইরে ব্যাখ্যা খোঁজা নিরর্থক। মানুষের জীবনে এমন কিছু কি তোমরা দেখছ, যা সেই মানুষের নিজের শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না? তাই গ্রহ-নক্ষত্র বা জগতের অন্য কিছুর কাছে যাবার কি দরকার? আমার নিজের কর্মই আমার বর্তমান অবস্থার যথোচিত ব্যাখ্যা।

৬৫। …আর একটি কথা। ভারতবর্ষকে আমি নিঃসন্দেহে ভালবাসি। কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হচ্ছে। আমাদের কাছে ভারতবর্ষই বা কী, ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকাই বা কী? আমরা সেই দেবতারই সেবক, অজ্ঞানরা যাকে মানব বলে। গাছের শিকড়ে জল দিলে সমস্ত গাছটাকেই জল দেওয়া হয় না?

৬৬। কিছু লোক আছে নেতৃত্ব পেলে যাদের কাজ হয় সর্বোত্তম। প্রত্যেকেই নেতৃত্ব দেবার জন্য জন্মলাভ করে না। সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি "পরিচালনা করেন শিশুর" মতো। শিশু আপাতদৃষ্টিতে সকলের ওপর নির্ভরশীল, আসলে কিন্তু সে বাড়ির রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণা অনুযায়ী এইটিই গূঢ় রহস্য। .. অনুভব করে অনেকেই, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে অল্প কয়েকজন মাত্র। অপরের প্রতি ভালোবাসা গুণানুরাগ এবং সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা দ্বারাই

একটি বিশেষ ব্যক্তি আইডিয়া প্রচারে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করে।...

৬৭। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে পুরোপুরি নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার জীবন সুরু করতে হবে। তুমি বই পড়তে পার, লেকচার শুনতে পার, অজস্র কথা বলতে পার, কিন্তু অভিজ্ঞতাই আসল শিক্ষক, মানুষের চোখ খুলে দিতে পারে অভিজ্ঞতাই। বাস্তব অভিজ্ঞতাই সর্বোত্তম। আমরা শিক্ষা লাভ করছি-ই, হাসি ও অশ্রুর বিনিময়ে শিক্ষা লাভ করছি। কেন তা জানি না, কিন্তু দেখি তাই ঘটে; আর তাই যথেষ্ট।

৬৮। এসো, মানুষ হও। যে সব পুরোহিত সর্বদাই প্রগতির বিরুদ্ধে, তাদের লাথি মেরে দূর করে দাও। কারণ ওরা কখনও শোধরাবে না, কখনও ওদের মন বড় হবে না। ওরা শত শত বর্ষের কুসংস্কার ও পীড়নের বংশধর। সর্বাগ্রে এই যাজকবৃত্তি নির্মূল কর। এসো, মানুষ হও। সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরেটাকে দেখো। দেখো কী ভাবে সমস্ত জাতি এগিয়ে চলেছে। তোমরা মানুষকে ভালবাসো কি? তোমরা তোমাদের দেশকে ভালবাসো কি? তাহলে এসো আমরা আরো উন্নত ও আরো ভালো বিষয়গুলোর জন্য সংগ্রাম করি। পেছনে তাকিও না, অতি প্রিয়জন ও স্বজনকে কাঁদতে দেখলেও না। পেছনে নয়, শুধু সামনে তাকাও!

৬৯। হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচু জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও;

মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর আমায় মানুষ কর।' আর এভাবে সমস্ত দেশটা নীচতা, ভীরুতা, অজ্ঞতা বা শিক্ষাহীনতার সর্বশেষ প্রান্ত বা গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এ সব লোকেদের জাগাতে হবে, তুলে নিতে হবে, আত্মবিশ্বাস, আশা ও আশ্বাস বাণী শোনাতে হবে তাঁদের। আর বলতে হবে তাদের 'তোমরাও আমাদেরই মত মানুষ এবং আমাদেরই মত সকল অধিকার আছে তোমাদেরও।'

১০। ঐ যারা চাষীভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট-জাতি তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ কোরে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না…হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ…ইরান ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি ?…কে ভাবে একথা, স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন, তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটচে ; আর যাদের রুধির স্রোতে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে ? লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কর্মবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ;—আমাদের গরীবেরা ঘরে-দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নেই ?…হে ভারতের চির পদদলিত শ্রমজীবিগণ! তোমাদের প্রণাম করি।

১১। আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই তোমরা 'ডম্মম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চ বর্ণেরা কি বেঁচে আছ ? তোমরা হচ্ছ দশহাজার "মমি" যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়াম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা ভারতের উচ্চ-বর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎলোপ্‌ লুপ্‌। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী করছ কেন ? ভূত-ভারত-শরীরের রক্ত মাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না ? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব পুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের

অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে! বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যত ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিক, তোমার মাণিক্যের আংটি, ফেলে দাও এদের মধ্যে। যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখ; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কটি জীমূতস্যন্দী, ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যত ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি: 'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।

যতদিন কোটি কোটি লোক বুভুক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে বাস করবে ততদিন প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বলব বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, কারণ এই দরিদ্র সাধারণের স্বার্থের বিনিময়েই এরা প্রত্যেকে লেখাপড়া শিখেছে, অথচ তাদের প্রতি কারও বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেবার অবকাশ নেই! দরিদ্র মানুষদের পিষ্ট করে যারা সব অর্থ সম্পদ অর্জন করেছে এবং সেই সুবাদে যারা বেশভূষার পারিপাট্যে গর্ব করে বেড়ায় তাদের আমি জঘন্য আখ্যা দেব; বিশ কোটি যে মানুষ আজ নিতান্ত ক্ষুধার্ত বর্বর ছাড়া কিছু নয় তাদের জন্য এই সব লোক যতদিন কিছু করবে ততদিন তাদের অন্য কোনো আখ্যা দেওয়া চলে না। ভাই সব, আমরা দরিদ্র, আমরা তুচ্ছ নগণ্য, কিন্তু সর্বোত্তমের হাতে সর্বকালে এই রকম নগণ্যরাই তো হাতিয়ার হয়ে এসেছে।

আমেরিকার সংবাদপত্রের রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ

মানুষের দেবত্ব
[ADA RECORD, FEB. 28, 1894]

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, সন্ধ্যায় মানুষের দেবত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনতে অপেরায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

তিনি বলেন যে মানুষের দেহ এবং বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে যে আত্মার অবস্থান সেই নিরাকার আত্মায় বিশ্বাসই সমস্ত ধর্মের মূলকথা। এই আত্মাই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। একে একে স্বামীজী তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন। বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্য একটি বিষয়ের উপর। মানুষের মন পরিবর্তনশীল বলেই মরণশীল। মৃত্যু আসলে এক পরিবর্তন মাত্র।

আত্মা মনকে একটি আধার হিসাবে ব্যবহার করে এবং এই মনের মাধ্যমেই দেহকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। আত্মাকে তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করা প্রয়োজন। মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ বিশুদ্ধ ও পবিত্র, কিন্তু তা তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রত্যেক হিন্দু তার প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। অধিকাংশ হিন্দুই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম একথা প্রচার করা হিন্দুদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। বক্তা আরও বলেন: "আত্মাই আমার প্রকৃত স্বরূপ, আমি কোন পদার্থ বিশেষ নই। পাশ্চাত্যের ধর্মীয় বিশ্বাসে এই আশা পোষণ করা হয় যে দৈহিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব। আমাদের ধারণা, এরকম সম্ভাবনা একেবারেই নেই। মোক্ষের পরিবর্তে আমরা আত্মার মুক্তির কথা বলে থাকি।"

মূল বক্তৃতা আধঘণ্টা চলেছিল। তবে সভার সভাপতি জানান যে বক্তৃতা শেষে বক্তা যে কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। সে সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন এবং সে সুযোগের যথেচ্ছ সদব্যবহারও করা হয়েছে। প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক, চিকিৎসক, দার্শনিক, সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, সাধু, দুষ্কৃতকারী প্রভৃতি সকলেই। কিছু প্রশ্ন লিখিত ভাবে করা হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নকর্তাই উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব বক্তা অমায়িক-ভাবে দিয়েছেন, এবং বেশীর ভাগ অহেতুক প্রশ্নকারীরা হাস্যাস্পদ প্রমাণিত হয়েছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ চলার পর, বক্তা বিশ্রাম প্রার্থনা করেন। তখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। অনেক প্রশ্ন তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর উত্তরগুলি থেকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুবিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা কিন্তু অতিরিক্ত ধারণা করতে পারি। হিন্দুরা অবতার তত্ত্বে বিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ভগবান কৃষ্ণের কথা বলে থাকেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, উত্তর ভারতে, এক কুমারীর গর্ভে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হয়। এই উপাখ্যানের সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত খ্রীষ্টের জন্ম ইতিহাসের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে হিন্দু দেবতাটির মৃত্যু হয়েছিল এক দুর্ঘটনায়। হিন্দুরা আত্মার বিবর্তন ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁদের ধারণা যে মানুষের আত্মা পূর্বজন্মে পাখি, মাছ বা অন্য কোন জীবদেহে অবস্থান করে এবং মানুষের মৃত্যুর পর দেহান্তরে প্রবেশ করে থাকে। পৃথিবীতে আসার আগে

এইসব আত্মা কোথায় ছিল এ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে এসব আত্মা তখন অন্যান্য জগতে বিচরণ করত। আত্মাই হল সমস্ত অস্তিত্বের চিরন্তন ভিত্তি। অতীতে এমন কোন সময় ছিল না যখন ঈশ্বর বিরাজমান ছিলেন না। সুতরাং কোন এক সময় সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না, একথা মনে করাও ভুল। বৌদ্ধরা কোন দেবতা বিশেষে বিশ্বাসী নন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে তিনি বৌদ্ধ নন। খ্রীষ্ট যে অর্থে পূজিত হন মহম্মদের পূজা সে অর্থে করা হয় না। মহম্মদ খ্রীষ্টকে স্বীকার করেছিলেন, তবে খ্রীষ্টের দেবত্বকে নয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ নির্বাচনের মাধ্যমে নয়। ঈশ্বর স্রষ্টা, এবং প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টি।

পাপের শাস্তি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেলে। আমাদের কার্যবিধি আত্মার দ্বারা পরিচালিত নয় বলেই অপবিত্র। আমাদের আত্মাই পবিত্র ও শুদ্ধ। আত্মার কোন বিশ্রামাগার নেই। জড়বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্যও এর নেই। মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে সে আসলে আত্মা বা নিরাকার বস্তুবিশেষ তখনই তার পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। ধর্ম আত্মিক প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার তারতম্যের জন্যই একটি মানুষ অপর একজনের তুলনায় অধিক পবিত্র হতে পারে। উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা উপলব্ধি করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে তাঁর ধর্ম কোন প্রচারে বিশ্বাসী নয়। প্রেমের জন্যই ভগবৎ প্রেম এবং নিঃস্বার্থভাবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতেই হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয়। প্রাচ্যের লোকেরা অত্যন্ত কঠোর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত, কারণ বিশ্রাম হল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অঙ্গ। হিন্দুরা তাঁদের দুর্বলতার জন্য ঈশ্বরকে দোষী করেন না। ইদানীং সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ
[BAY CITY DAILY TRIBUNE, MARCH 21, 1894]

বহু বির্তকিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মত একজন স্বনামধন্য অতিথি গতকাল বে সিটিতে এসেছিলেন। দুপুর নাগাদ তিনি ডেট্রয়েট থেকে এসে পৌছন। ওখানে তিনি সেনেটর পামারের অতিথি ছিলেন। এখানে পৌছেই তিনি ফ্রেজার হাউস অভিমুখে রওনা হন। সেখানে ট্রিবিউন পত্রিকার এক সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশের বিষয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক কথা বলেন এবং এদেশ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও ব্যক্ত করেন। প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরে তিনি আমেরিকায় এসেছেন এবং ফিরবেন অতলান্ত মহাসাগর ঘুরে। তিনি বলেন: "আমেরিকা এক বিরাট দেশ। কিন্তু এখানে আমি থাকতে চাই না। কারণ আমেরিকানদের চিন্তাধারা অত্যন্ত অর্থ-কেন্দ্রিক। টাকাকে তারা সবকিছুর উর্ধ্বে ঠাঁই দেয়। আপনাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। আপনাদের জাত যখন আমাদের জাতের মত প্রবীণ হবে

তখন আপনারাও অনেক বেশী জ্ঞানী হবেন। চিকাগো আমার খুব ভালো লাগে। ডেট্রয়েটও সুন্দর।"

কদিন তিনি আমেরিকায় থাকতে চান এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "আমি জানি না। চেষ্টা করছি আপনাদের দেশের অধিকাংশ ঘুরে দেখবার। এরপর আমি পূর্ব দিকে যাবো এবং কিছুদিন বোষ্টন ও নিউ ইয়র্ক শহরে থাকবো। আমি বোষ্টন ঘুরেছি তবে থাকি নি। আমেরিকা দেখা হলে আমি ইউরোপ যাবো। ইউরোপ সম্বন্ধে আমার প্রবল উৎসাহ রয়েছে। কখনও ওখানে যাই নি।"

নিজের সম্বন্ধে প্রাচ্যবাসীটি জানান যে তাঁর বয়স তিরিশ বছর। কলকাতায় তাঁর জন্ম এবং ওখানকার এক কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন। কর্মোপলক্ষে তাঁকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয় এবং সব সময়েই তিনি দেশের অতিথি। "ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৮ কোটী ৫০ লক্ষ (285,000,000) এর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক আছেন প্রায় ৬ কোটী ৫০ লক্ষ (65,000,000) বাকি সবই হিন্দু। মাত্র ৬ লক্ষ খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন, এদের মধ্যে অন্ততঃ আড়াই লক্ষ হলেন ক্যাথলিক। হিন্দুরা সাধারণতঃ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে না, তারা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট। কেউ কেউ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে। প্রত্যেক লোকের নিজস্ব বিশ্বাস থাকুক হিন্দুধর্ম এই কামনা করে। আমরা বুদ্ধিমান জাতি তাই রক্তপাতে বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষে অসৎ লোকও আছে এবং আমেরিকার মত সেখানেও তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ। মানুষ দেবদূত তুল্য হবে এ আশা করা ধৃষ্টতা।" আজ রাতে বিবেকানন্দ সাগিন-অতে (Saginaw) বক্তৃতা দেবেন।

গতরাতের ভাষণ

গত সন্ধ্যেয় ভাষণ শুরু হবার সময় অপেরা হাউসের নীচের তলা বেশ ভালো রকম জনাকীর্ণ ছিল। ঠিক সোয়া আটটায় স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতামঞ্চে এলেন, তাঁর পরনে সুন্দর প্রাচ্য-পোশাক। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে ডক্টর সি. টি. নিউকার্ক তাঁকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বক্তৃতার প্রথমভাগে স্বামীজী ভারতের বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা দিলেন এবং আত্মার দেহান্তর গমন নিয়ে আলোচনা করলেন। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে বক্তা বলেন যে 'শক্তি অক্ষয়' এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি এবং আত্মার পুনর্জন্মবাদের ভিত্তি একই। পুনর্জন্মবাদের প্রথম প্রবক্তা একজন ভারতীয় দার্শনিক। তাঁরা সৃষ্টি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। সৃষ্টির অর্থ শূন্য থেকে কোন কিছুর উদ্ভাবন। কিন্তু তা অসম্ভব। সৃষ্টির কোন আদিপর্ব নেই, যেমন সময়ের কোন শুরু নেই। ঈশ্বর এবং সৃষ্টি হল দুটি রেখা—যার কোন আদি অন্ত নেই, তুলনা নেই। সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুদের তত্ত্ব হল : "এর অস্তিত্ব আগেও ছিল, পরবর্তী ক্ষেত্রেও থাকবে।" শাস্তির অর্থ প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। এই হল কর্ম ফল। বর্তমান পরিস্থিতিই জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। ঈশ্বর শাস্তি দেন একথা

হিন্দুরা বিশ্বাস করে না। স্বামীজী বলেন: "যারা ক্রুদ্ধ হয় তাদের আপনারা নিন্দা করেন এবং ক্রোধশূন্য লোকেদের প্রশংসা করে থাকেন। অথচ এদেশের হাজার হাজার লোকের অভিযোগ যে ঈশ্বর অত্যন্ত ক্রোধী। রোম আগুনে ভস্মীভূত হবার সময় নিরো বেহালা বাজিয়েছিল, তাই সবাই তার নিন্দা করে অথচ এদেশের বহুসংখ্যক লোক আজ ঈশ্বরকে একই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন" পাপমুক্ত হবার কোন তত্ত্ব হিন্দুধর্মে নেই। যীশুই প্রথম এ ধরনের তত্ত্ব প্রচার করেন। প্রত্যেক নারী পুরুষের মধ্যেই দৈবসত্তা রয়েছে, কিন্তু তা যেন এক আবরণে ঢাকা রয়েছে, ধর্মের কাজ এই আবরণ উন্মোচন। এই আবরণ উন্মোচনকে খ্রীষ্টানরা বলেন মুক্তি হিন্দুরা বলেন মোক্ষলাভ। ঈশ্বর এই বিশ্বসৃষ্টির স্রষ্টা, রক্ষক এবং ধ্বংসকর্তা।

এরপর বক্তা নিজ দেশীয় ধর্মমতগুলির যথার্থতা প্রমাণ করতে উদ্যোগী হন। তিনি বলেন যে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় পদ্ধতিগুলি যে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থগুলি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রমাণ মেলে। ভারতবর্ষের কাছে পাশ্চাত্যের সহিষ্ণুতা শিক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে।

অন্যান্য যেসব প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন এবং পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করেন সেগুলি যথাক্রমে হল: খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সম্প্রদায়, প্রেসাবাইটেরিয়ান চার্চের অত্যুৎসাহী ও অসহিষ্ণু মনোভাব, এদেশের অর্থপূজা, এবং পুরোহিতগোষ্ঠী। তার মতে পুরোহিতরা ধর্মব্যবসায় নেমেছেন কারণ এ থেকে তাঁদের অর্থপ্রাপ্তি হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন যে অর্থের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হলে এই সব পুরোহিতরা ধর্মব্যবসায় কতক্ষণ টিঁকে থাকতেন? ভারতবর্ষের জাতিপ্রথা দক্ষিণের সভ্যতা, মন সম্পর্কিত আমাদের সাধারণ জ্ঞান, এবং অন্যান্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বক্তা তার ভাষণ শেষ করেন।

ধর্মীয় সংহতি

[SAGINAW EVENING NEWS, MARCH 22nd, 1894]

বহু আলোচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতরাতে সংগীত আকাদেমীতে ধর্মীয় সংহতি বিষয়ে সীমিত কিন্তু উৎসাহী এক জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল প্রাচ্যের পোশাক এবং তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানানো হয়। শ্রদ্ধেয় রাউল্যাণ্ড কনর অত্যন্ত মর্যাদাসহকারে বক্তার পরিচয় দিলেন। ভাষণের প্রাথমিক পর্যায়ে বক্তা ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের ব্যাখ্যা দেন এবং আত্মার পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম অনুপ্রবেশকারী আর্যরা ভারতীয় জনসাধারণকে বিলুপ্ত করতে চেষ্টা করেনি। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কোন নতুন দেশে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর যে ধরনের নিপীড়ন চালায়, সে রকম কোন অসঙ্গত প্রচেষ্টা না করে আর্যরা বরং স্থানীয় বর্বরদের সভ্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। ওদেশে যারা স্নান করে না এবং মৃত পশু-মাংস ভক্ষণ করে, হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করে। উত্তর-ভারতীয়রা কখনও নিজেদের সামাজিক প্রথাগুলিকে দক্ষিণীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে

চায়নি, বরং দক্ষিণ ভারতীয়রা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতীয়দের বহু প্রথার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে কিছুসংখ্যক লোকের অস্তিত্ব আছে যারা বহু যুগ আগে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। স্পেনীয়রা সিংহলে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তন করে। স্পেনীয়রা ভেবেছিল যে ঈশ্বর তাদের বিধর্মীদের হত্যা করতে এবং তাদের মন্দির ধ্বংস করতে আদেশ দিয়েছেন।

যদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম না থাকত তাহলে কোন বিশেষ ধর্মই টিঁকে থাকতে পারত না। খ্রীষ্টানরা তাদের নিজেদের ধর্ম অবলম্বন করে থাকতে চায়। হিন্দুরা চায় নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকতে। যে সব ধর্মের নিজস্ব গ্রন্থাদি রয়েছে তাদের অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে। খ্রীষ্টানরা কেন ইহুদীদের ধর্মান্তরিত করতে পারে নি? কেন পার্শীরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নি অথবা মুসলিমরা? কেন চীন, জাপানের উপর খ্রীষ্ট-ধর্ম রেখাপাত করতে পারে নি। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রচারিত ধর্ম। তারা প্রায় এর দ্বিগুণ সংখ্যক লোককে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছে বিনা রক্তপাতে। মহম্মদের অনুগামীরা কিছুদিন অসম্ভব জোর জুলুম চালিয়েছে। আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনটি বহুপ্রচারিত ধর্মমতের মধ্যে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। তাদেরও প্রতিপত্তি ছিল কোন এক সময়। প্রায় প্রতিদিনই দেখবেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলি খুনোখুনি করে নতুন দেশ জয় করে চলেছে। কোন ধর্মপ্রচারকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে? কেন এই রক্ত পিপাসু দেশগুলি এমন একটি ধর্মের ধ্বজা তুলে বেড়াচ্ছে যে ধর্মমত যীশুখ্রীষ্ট প্রবর্তন করেননি? ইহুদী এবং আরবরাই খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক। তাদেরই খ্রীষ্টানরা বিতাড়িত করেছে! যাচাই করে দেখা গেছে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা নগণ্য।

কটু মন্তব্য করতে বক্তা চাননি, তবে তিনি শুধু অন্যদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টানদের সঠিক স্বরূপটুকু দেখাতে চেয়েছেন। যে সব ধর্মযাজকরা নরকের অগ্নিকুণ্ডের কথা বলে বেড়ায় তাদের লোকে ভয় পায়। বারংবার মুসলমানরা ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, আজ তাদের চিহ্ন কোথায়? সব ধর্মের দৃষ্টিই এক আধ্যাত্মিক সত্তার উপস্থিতিটুকু পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এর বাইরে কোন কিছু দেখার ক্ষমতা কোন ধর্মেরই নেই। প্রত্যেক ধর্মেরই একটি মূল সত্য এবং এক আপাত বাতাবরণ থাকে, এই আবরণের অন্তরালে থাকে আসল মাণিক্যটি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস অথবা ইহুদী ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অবস্থাভেদে আধারের রূপ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু মূল সত্য অপরি-বর্তিতই থাকে। সারসত্তা সর্বত্রই এক হওয়ার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেরাই এই সারাংশটুকুই গ্রহণ করেন। ঝিনুক তেমন আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু তার ভেতরেই থাকে মুক্তা। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অংশ ধর্মান্তরিত হবার আগে খ্রীষ্টধর্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে। এই হল প্রাকৃতিক নিয়ম। পৃথিবীর বিশাল ধর্মীয় ঐকতানের মাঝ থেকে একটি বাদ্যযন্ত্রকে আলাদা করে কি লাভ? তার চেয়ে সেই মহাসংগীত অব্যাহত থাকুক না। বক্তা পবিত্র হবার আহ্বান জানালেন, কুসংস্কার ছেড়ে প্রকৃতির অনুপম ঐকতান উপলব্ধি করতে বল্লেন। কুসংস্কারের কাছে ধর্ম পরাজিত হয়। সমস্ত ধর্মের সারবস্তু এক হওয়ার জন্য সকল ধর্মই মঙ্গলকর। প্রত্যেক মানুষকেই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে, কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা মিলিতভাবে সৃষ্টি করবে একটি সামগ্রিক

সত্তা। এ মুহূর্তে এই চমৎকার শর্তের অস্তিত্ব আছে। কারণ ধর্মের এই সুন্দর কাঠামোতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কিছুই না কিছু অবদান রয়েছে।

প্রতিক্ষেত্রেই স্বামীজী তাঁর দেশের বিভিন্ন ধর্মমতের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় ব্যবস্থা যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে গৃহীত একথা প্রমাণ করা গেছে। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রে যে সব নৈতিক আদর্শ ও শুদ্ধতার কথা বলা হয়েছে তিনি সেগুলির কিছুটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। সেই সঙ্গে এ কথাও জানান যে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বৌদ্ধরা ছিলেন অদ্বৈতবাদী। বুদ্ধের মতবাদের মূল বিষয় ছিল: "সৎ হও, শুদ্ধ হও, নীতিবান হও।"

সুদূর ভারত থেকে
[SAGINAW COURIOR-HERALD, MARCH 22, 1894]

গত সন্ধ্যায় ভিনসেণ্ট হোটেলের বৈঠকখানায় একজন সুঠাম সুপুরুষ ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখা গেল। তাঁর শ্যামবর্ণ মুক্তার মত ঝকঝকে তাঁর দাঁতের সারিকে আরও উজ্জ্বল করেছিল। চওড়া কপালের নীচে তাঁর চোখ দুটি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছিল। ভদ্রলোক হলেন হিন্দু ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধ ইংরাজী বলছিলেন এবং কিছুটা বিদেশী উচ্চারণ, তাঁর কথোপকথনকে আরও সুন্দর করেছিল। ডেট্রয়েটের সংবাদপত্রগুলির পাঠকরা জানেন যে বিবেকানন্দ ঐ শহরে অনেকবার ভাষণ দিয়েছেন এবং খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনা করে তিনি কিছু ব্যক্তির বিরাগ ভাজনও হয়েছেন। আকাদেমী অভিমুখে যাত্রার প্রাক্‌কালে কোরিয়ার হেরাল্ডের সাংবাদিক এই জ্ঞানী বৌদ্ধের (?) সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। আকাদেমীতে তিনি ভাষণ দেবেন। কথাপ্রসঙ্গে কানন্দ জানান যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নৈতিক দৃঢ়তার অভাব দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। অবশ্য তিনি বলেন যে সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের মধ্যেই ভালো মন্দের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর একটি বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে আমেরিকান চরিত্রের পরিপন্থী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি আমাদের রীতিনীতিগুলি পর্যবেক্ষণ করছেন কিনা। এর উত্তরে তিনি বলেন: "না, আমি ধর্মপ্রচারক মাত্র।" এ থেকে বোঝা যায় যে তাঁর মধ্যে সঙ্কীর্ণতা এবং অহেতুক ঔৎসুক্য একেবারেই নেই। মনে হল, ধর্মীয় বিষয়ে সুপণ্ডিত এই বৌদ্ধ (?) প্রচারকের কাছে ঐ দুটি শব্দ সম্পূর্ণ অপরিচিত।

হোটেল থেকে আকাদেমীর দূরত্ব একপাও না। আটটার সময় রাউল্যাণ্ড কনর অল্পসংখ্যক শ্রোতার সঙ্গে বক্তার পরিচয় করালেন। বক্তা লাল কোমরবন্ধে বাঁধা কমলারঙের একটি লম্বা আলখাল্লা পরেছিলেন। তাঁর মাথায় প্যাঁচানো পাগড়ীটি ছিল সম্ভবতঃ একটি ছোট শাল।

প্রথমেই বক্তা জানালেন যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আসেন নি এবং অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করা একজন বৌদ্ধের পক্ষে নীতিবিগর্হিত। তিনি বলেন তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু 'সকল ধর্মের ঐক্য'। কানন্দ জানান যে অতীতে বহু ধর্মমত সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

তিনি বলেন ভারতবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ- হল বৌদ্ধ [হিন্দু] এবং বাকী তৃতীয়াংশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, একথা বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে না বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টানরা ইহ জগতে কোন লোককে পাঁচ মিনিটের জন্য ক্ষমা করে পরজগতে তার অনন্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে। বুদ্ধই প্রথম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করেছিলেন। এইটিই অধুনা বৌদ্ধ বিশ্বাসের সারতত্ত্ব। খ্রীষ্টানরাও একমত প্রচার করে কিন্তু তাদের কাজের সঙ্গে তাদের মতবাদের কোন যোগসূত্র নেই।

উদাহরণস্বরূপ তিনি দক্ষিণ আমেরিকার নিগ্রোদের কথা বলেন। কোন হোটেলে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক গাড়ীতে ভ্রমণের অধিকারও তাদের নেই। কোন কৃষ্টিবান লোক তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। তিনি জানান যে কিছুদিন দক্ষিণ আমোরকায় তিনি ছিলেন কাজেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছেন।

হিন্দু ভায়েদের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা

[NORTHAMPTON DAILY HERALD, APRIL 16, 1894]

এ ধরনের মন্তব্য করার কারণ হল স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন যে সমুদ্রপারে আমাদের প্রতিবেশী, এমন কি অতি দূরের মানুষটিও, আমাদের নিকট আত্মীয়। পার্থক্য শুধু বর্ণের, ভাষার, রীতিনীতি এবং ধর্মের। ১৪ই এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যেয় সিটি হলে এই সুভাষী হিন্দু সন্ন্যাসীটি তাঁর ভাষণের মুখবন্ধ দিতে গিয়ে হিন্দু এবং অন্যান্য জাতের উৎপত্তির এক ঐতিহাসিক বিবরণ দিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে বিভিন্ন জাতের পারস্পরিক সম্বন্ধ একটি অতি সাধারণ সত্য, যদিও অনেকে তা জানেন না অথবা স্বীকার করতে চান না।

এরপর হিন্দু রীতিনীতি প্রসঙ্গে যে সহজ আলোচন হয়, তার ধরন ছিল অনেকটা সুশ্রাব্য ঘরোয়া কথাবার্তার মত। এই বাকপটু লোকটি অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। বিষয়টি সম্পর্কে কিছু সংখ্যক শ্রোতার সহজাত ঔৎসুক্য ছিল, কেউ কেউ এ ব্যাপারে বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। বক্তা এবং তাঁর চিন্তধারা সম্পর্কে দুদলই অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এর একাধিক কারণ রয়েছে এবং সবগুলি এখানে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বর্ণনাগুলিকে দীর্ঘতর না করার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বক্তা হতাশ করেছেন। আমেরিকার বক্তৃতামঞ্চে এটি অবশ্য যথেষ্ট বড় বক্তৃতা। তবুও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই সম্প্রদায়ের রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি অল্প কয়েকটি কথাই বলেছেন। এই সুপ্রাচীন জাতের গার্হস্থ্য জীবন, সমাজ জীবন, ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে তাদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছুই সাগ্রহে শুনতে পারতাম। এ সবই মানবেতিহাসের যে কোন সাধারণ ছাত্রের কাছে অত্যন্ত আর্কষণীয় বিষয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে সাধারণ লোকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

হিন্দু জীবন প্রণালী প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতে বক্তা একটি হিন্দু বালকের জন্ম, তার শিক্ষাজীবন, তার বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। এ বিষয়ে আমরা অনেক কিছু শোনার আশা করেছিলাম কিন্তু বক্তা অধিকাংশ সময়ই তাঁর মূল বক্তব্য থেকে সরে এসে সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে হিন্দু রীতিনীত ও ধারণার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাভাষীদের রীতিনীতি ও ধারণার তুলনামূলক আলোচনা করেন। সিদ্ধান্তগুলি সবক্ষেত্রেই তার নিজের জাতির অনুকূলে জমা পড়েছে। যদিও যথেষ্ট বিনয়, দরদ এবং চিত্তাকর্ষক ভাবে তিনি সেগুলি ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি সুপরিচিত তাঁরা অন্ততঃ বেশ কিছু বিষয়ে বক্তাকে দু একটি কঠিন প্রশ্ন করতে পারতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি হিন্দু নারীত্বের ধারণা প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা দিলেন। হিন্দুরা তাদের মহিলাদের চিরকাল দেবীজ্ঞানে পূজা করে, সম্মান জানায় এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তাদের আনুগত্য স্বীকার করে। এ জাতীয় জিনিস সবচেয়ে নিষ্ঠাবান মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিঃস্বার্থপর আমেরিকান পিতা, পুত্র, স্বামীর পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এ রকম ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নকর্তা জানতে চাইতে পারতেন যে, বেশীর ভাগ হিন্দু তাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাদের ক্ষেত্রে এই সুন্দর তত্ত্বকে কতটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন।

ফললাভের লোভ, জাতীয় জীবনে বিলাসমুখীতা, স্বার্থচিন্তা, অর্থকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি প্রভৃতি যে বিষয়গুলি আজ শ্বেতকায় ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের কলঙ্কিত করছে এবং নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনছে, এ সব কিছুকেই অত্যন্ত সঙ্গত-কারণে বক্তা মৃদু, সংযত কণ্ঠে ভৎ'সনা করেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর, এবং দৃপ্ত অগ্নিক্ষরা বাচনভঙ্গীতে তাঁর চিন্তা বিমূর্ত হয়েছিল। মনে হয়েছে আমরা যেন সেই ত্রিকালদর্শীর কণ্ঠেই শুনছি: "তুমি সেই মানুষ।" কিন্তু যখন এই সদ্‌বংশজাত, সুশিক্ষিত, রুচিবান হিন্দু ভদ্রলোকটি কোন অসতর্ক মুহূর্তে তার মূল বক্তব্য ভুলে প্রমাণ করতে চান যে তাঁর জাতির আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণমনা, নঙর্থক, উদাসীন আত্মোৎকর্ষ সাধনে বিমগ্ন ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের তুলনায় মহান; তখন তিনি বাস্তব পরিস্থিতির অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মূল্যায়ন করেন। কিছু সংখ্যক অর্থলোভী, অদূরদর্শী খ্রীষ্টানদের কিছু মারাত্মক ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে খ্রীষ্টধর্ম অনেক বেশী কর্মমুখী, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, আত্মবিমুখ। এই ধর্মই পৃথিবীর নয় দশমাংশ নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেছে।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে দেখা এবং তাঁর ভাষণ শোনার সুযোগ মনে হয় কোন সুন্দর মানসিকতাসম্পন্ন আমেরিকানেরই নষ্ট করা উচিত নয়। কারণ আমাদের তুলনায় অতি প্রাচীন একটি জাতির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির তিনি এক শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় উত্তরসাধক। হিন্দুজাতির ইতিহাস যে কোন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সুপাঠ্য। রবিবার [১৫ই এপ্রিল] বিকালে এই মহামান্য হিন্দু সন্ন্যাসীটি স্মিথ কলেজের ছাত্রদের সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় ভাষণ দিলেন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং

মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব এ দুটি ছিল তাঁর ভাষণের বিষয়। প্রত্যেক শ্রোতার কাছে পাওয়া বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে এই ভাষণ তাদের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। বক্তার সামগ্রিক চিন্তাধারায় প্রকৃত ধর্মভাবোদ্ভূত এক বিরাট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের রীতিনীতি

[BOSTON HERALD, MAY 15, 1894]

টাইলার স্ট্রীট ডে নার্সারীর সাহায্যার্থে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতকাল এসোসিয়েশন হলে এক ভাষণ দেন। এই সভায় প্রচুর মহিলা সমাগম হয়েছিল। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতবর্ষের ধর্ম' [প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষের রীতিনীতি]' বোস্টন শহরে এই হিন্দু সন্ন্যাসীটি এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। গতবছর চিকাগোতেও তাঁকে নিয়ে হৈচৈ সুরু হয়েছিল। তাঁর মার্জিত, সৎ, বিনয়ী ব্যবহারের বিনিময়ে তিনি অনেকের বন্ধুত্বলাভ করেছেন।

হিন্দুরা সাধারণতঃ বিবাহ করে না, তার কারণ এই নয় যে তারা নারীবিদ্বেষী। কারণ হল, হিন্দুধর্মে নারীদের দেবীজ্ঞানে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই মায়ের অস্তিত্ব রয়েছে এই শিক্ষা হিন্দুরা পেয়ে থাকে, কাজেই কোন ব্যক্তিই তার মাকে বিবাহ করতে চায় না। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বর হলেন জগন্মাতা। বিবেকানন্দ বলেন যে ঈশ্বরকে হিন্দুরা পৃথক কোন স্বর্গীয় সত্তা হিসাবে দেখে না, ঈশ্বর তাদের কাছে মাতৃস্বরূপা। বিবাহ তাদের কাছে অপবিত্রতার নামান্তর। কোন হিন্দু বিবাহ করে, ধর্মাচরণে তার স্ত্রীর কাছ থেকে সাহায্য পাবার জন্যে।

"আপনাদের ধারণা আমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্ জাতি তার নারীদের লাঞ্ছনা করে নি? ইউরোপ বা আমেরিকায় শুধু অর্থের লোভেও লোকে বিয়ে করে। বিয়ের পর স্ত্রীর অর্থ আত্মসাৎ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। বিপরীত ভাবে ভারতবর্ষের কোন মহিলা অর্থের প্রয়োজনে বিয়ে করলে তার সন্তান-সন্ততি দাস হিসাবে পরিগণিত হয়, আমাদের বিধি এরকমই। কোন ধনীলোক বিয়ে করলে তার যাবতীয় অর্থ স্ত্রীর কাছে হস্তান্তরিত হয়। এর ফলে অর্থরক্ষিকা এই স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা লোকটির হয় না।

"আপনাদের মতে আমরা বর্বর, অশিক্ষিত, অমার্জিত। এ ধরনের অভিযোগ আপনারা করেন রুচিবোধের অভাব থেকে, আমরা তা দেখে মুখ লুকিয়ে হাসি। আমাদের মতে, অর্থ নয়, মানুষের গুণ ও তার বংশপরিচয়ই তাকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত করে। যে কোন পরিমাণের অর্থই ভারতবর্ষে আপনাদের কাজে লাগবে না। সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে দরিদ্রতম ব্যক্তি ধনীশ্রেষ্ঠর সমকক্ষ হতে পারে, এমনই সুন্দর এ ব্যবস্থা। অর্থ পৃথিবীর যত অনর্থের মূল। এর জোরেই খ্রীষ্টানরা একে অপরে ঘাড়ে পা দিতে পেরেছে। অর্থগৃধ্নুদের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, লোভের উৎপত্তি হয়। কর্মের রথচক্র এখানে এক বিষম কোলাহল সৃষ্টি করেছে। জাতিপ্রথা এই দূষিত পরিবেশ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এর ফলে একজন মানুষের পক্ষে অল্প

আয়ে জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় এবং সমস্ত লোকের কর্মসংস্থানও হয়ে থাকে। জাতিভুক্ত লোক তার আত্মা সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ পায়, এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই অবকাশ অত্যন্ত কাঙ্ক্ষনীয়।

"ব্রাহ্মণরা জন্মসূত্রেই ঈশ্বরের পূজারী, এবং যে যত বেশী উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক হয়, তার ক্ষেত্রে সামাজিক বিধি নিষেধের পরিমাণও তত বেশী। জাতিপ্রথা আমাদের জাতের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং এর অসুবিধাও যেমন প্রচুর, সুবিধাও তেমন অনেক।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির বর্ণনা বিবেকানন্দ দিলেন। বিশেষতঃ বল্লেন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, এর ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা মোট কুড়ি হাজার।

তিনি আরও বলেন: "আমার ধর্মকে বিচার করার সময় আপনারা ধরে নেন যে আপনাদের ধর্ম নিখুঁত এবং আমাদের ধর্মমত সঠিক নয়, যখন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করেন, তখন আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে সব অমিল সেসবকটি বিষয়েই আমরা অশিক্ষিত বলে আপনারা মনে করেন। এ ধরনের মনোভাব নিরর্থক।"

শিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তা জানালেন যে, ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিতরা অধ্যাপনা করে এবং অল্প শিক্ষিতরা পৌরোহিত্য করে থাকে।

ভারতবর্ষের ধর্ম

[BOSTON HERALD, 17 MAY, 1894]

ওয়ার্ড সিকস্টিন ডে নার্সারীর সাহায্যকল্পে গতকাল বিকালে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এসোসিয়েশান হলে 'ভারতীয় ধর্ম' প্রসঙ্গে ভাষণ দিলেন। এই সভায় বিরাট জনসমাগম হয়েছিল।

বক্তা প্রথমে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বলেন। এই মুসলমানরা হলেন মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। মুসলমানরা ওল্ড ও নিউ দুটি টেস্টামেন্টকেই মেনে নিয়েছে, কিন্তু যীশুকে তারা দৈববাণী প্রচারক ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দিতে নারাজ। তাদের কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না, যদিও তারা কোরান পাঠ করে থাকে।

পার্সী সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ্-আভেস্তা (Zend-Avesta)। এরা দুজন বিবাদমান দেবতায় বিশ্বাসী: প্রথমজন হলেন শুভ দেবতা আরমুৎ (Armuzd) এবং দ্বিতীয়জন অশুভ দেবতা আহ্রিমান। তারা বিশ্বাস করে যে শুভই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। তাদের নৈতিক বিধানে শুভ কাজ, সুচিন্তা এবং সৎ বাক্যের কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। ব্যক্তিবিশেষকে হিন্দুরা জাতিপ্রথার অন্তর্ভুক্ত করেছিল কিন্তু প্রত্যেককে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রথার একটি অংশবিশেষ ছিল কোন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বা দৈবজ্ঞকে খুঁজে বার করে তার অধ্যাত্ম চিন্তার অনুপ্রেরণা লাভ করা।

হিন্দু ধর্মমত মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত: দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং

অদ্বৈতবাদী। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ব্যক্তি এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে উন্নীত হয়ে থাকে।

তিনটি দলই ঈশ্বরের বিশ্বাসী। কিন্তু দ্বৈতবাদীদের মত হল ঈশ্বর ও মানুষ পৃথক সত্তা। অপর পক্ষে অদ্বৈতবাদীরা ঘোষণা করেন যে সমগ্র বিশ্বে একটি অদ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই অদ্বিতীয় সত্তা ঈশ্বরও নন, আত্মাও নন, এ-দুয়েরও উর্ধ্বে অন্য কিছু। হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বক্তা বেদ থেকে উদ্ধৃত করেন এবং বলেন যে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে হলে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন।

শুধু ধর্মগ্রন্থ, বা প্রচার পুস্তিকা দিয়ে ধর্মাচরণ হয় না, এর জন্য প্রয়োজন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থিত ঐশ্বরিক, অমর সত্যগুলি খুঁজে বার করা। বেদে বলা হয়েছে: "আমি যাহাকে পছন্দ করি, সেই ব্যক্তিই দৈবজ্ঞ হইয়া থাকে।" দৈবজ্ঞ বা মহাজ্ঞানী হওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

জৈন সম্প্রদায়ের এক বিবরণ দিয়ে বক্তা তাঁর ভাষণ শেষ করেন। এই জৈনরা অবলা প্রাণীদের প্রভূত দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে। এদের নৈতিক নিয়মের সারসংক্ষেপ হল: "অপরকে আঘাত না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং মতবাদ

[HARVARD CRIMSON, 17 MAY, 1894]

হার্ভার্ড ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গত সন্ধ্যায় সেভার হলে (Sever Hall) এক ভাষণ দিলেন। ভাষণটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বক্তার মধুর, স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর এবং সংযত, একাগ্র বাচনভঙ্গী প্রতিটি শব্দের মাধুর্য বৃদ্ধি করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মমত রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ ঈশ্বরকে ব্যক্তি সত্তা হিসাবে মেনে নেয় আবার কারও মতে ঈশ্বর ও বিশ্ব-প্রকৃতি অভিন্ন। কিন্তু ধর্মমত যাই হোক না কেন, কোন হিন্দুই কখনও বলে না যে তার অনুসৃত পথই একমাত্র সঠিক, এবং অন্যান্যদের বিশ্বাস ভ্রান্ত। হিন্দুরা মনে করে যে ঈশ্বর উপলব্ধির একাধিক পথ রয়েছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধার্মিক তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িক কলহের উর্ধ্বে বিরাজ করেন। ভারতবাসী তখনই কোন লোককে ধার্মিক আখ্যা দেয় যখন সে ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে তিনি নিরাকার আত্মা মাত্র, প্রকৃতপক্ষে বিদেহী।

ভারতীয় অর্থে সন্ন্যাসী হতে গেলে দেহ ভাবনা পরিত্যাগ করে, অন্য মানুষকেও বিদেহী আত্মা হিসাবে গণ্য করতে হয়। সেজন্য যোগী পুরুষরা কখনও বিবাহ করতে পারেন না। যোগী হবার আগে ব্যক্তিবিশেষকে পবিত্রতা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের শপথ নিতে হয়। কোন অর্থ তিনি নিজের কাছে সঞ্চিত রাখতে পারেন না। অথবা অর্থগ্রহণও করতে পারেন না। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে প্রথমেই সন্ন্যাসীকে একটি কুশপুত্তলিকা (কুশপুত্তলি) দাহ করতে হয়। এই পুত্তলিদাহের অর্থ সন্ন্যাস গ্রহণের আগে যে দেহ নাম ও গোত্র সন্ন্যাসীর পরিচয় ছিল তাকে বিনষ্ট করা। তখন সে ব্যক্তি

নতুন নামে পরিচিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে, ধর্মপ্রচার করে। কিন্তু যাই করুক না কেন, শ্রমের বিনিময়ে সে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না।

কম তত্ত্ব, আরও বেশী আহার্য

[BALTIMORE AMERICAN, OCTOBER 15, 1894.]

গত রাতে লাইসিয়ুম থিয়েটারে ভ্রমান ভ্রাতৃবর্গের আয়োজিত প্রথম দফা আলোচনায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল: "গতিশীল ধর্ম।"

ভারতীয় মহাসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশেষ বক্তা ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং তাঁর ভাষণ শ্রোতারা মনযোগ সহকারে শুনেছে। তাঁর ইংরেজী ভাষা ব্যবহার ও বলার ধরন ছিল অতি চমৎকার। তাঁর উচ্চারণে কিছু বিদেশী টান রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভাষণ সহজবোধ্যই হয়েছিল। স্বদেশী যে পোশাক তিনি পরেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। তিনি বলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী বক্তারা যা বলে গেছেন তারপর যৎসামান্য বলার অবকাশই তাঁর আছে তবে তার সঙ্গে তিনি বিশেষ কিছু যোগ করতে চান। তিনি বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছেন, বহু লোকের কাছে ধর্ম প্রচার করেছেন। এ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ধর্ম মত বিশেষে অবস্থার হেরফের সামান্যই হয়। প্রয়োজন হল বাস্তবানুগ কাজ। ধারণাগুলিকে যদি বাস্তবায়িত না করা যায় তাহলে মানুষের উপর তিনি আস্থা হারাবেন। সারা বিশ্বজুড়ে আর্তনাদ উঠেছে, "কথা নয়, খাবার দাও।" ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক পাঠানো সঠিক হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এর বিরোধিতা তিনি করবেন না, কিন্তু তাঁর ধারণা, কমসংখ্যক প্রচারক পাঠিয়ে বদলে যদি আরও অর্থ পাঠানো যেত তাহলে তা অধিক সুফলদায়ী হত। ধর্মীয় তত্ত্ব ভারতের প্রচুর আছে। কিন্তু সেই ধর্মমতের সঙ্গে জীবনকে একীভূত করাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজন। নতুন করে কোন মত গ্রহণ অনাবশ্যক।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদের মত ভারতবাসীও প্রার্থনা করা শিখেছে, কিন্তু মুখের প্রার্থনাই সব কিছু নয়, চাই আন্তরিকতা। তিনি বলেন "পৃথিবীতে খুব কমসংখ্যক লোকই সৎকাজ করতে আগ্রহী। অন্যরা দর্শক মাত্র, হাততালি দেয় আর মনে ভাবে তারা নিজেরাই বিরাট কিছু করে ফেলেছে। জীবনের অর্থ প্রেম এবং মানুষ যখন পরোপকার করা থেকে বিরত হয়, তখনই তার আত্মিক (মানসিক) মৃত্যু ঘটে।"

আগামী রবিবার সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লাইসিয়ুমে সান্ধ্যকালীন ভাষণ দেবেন।

[SUN, OCTOBER 15, 1894]

অবিচলিত দৃঢ়তা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গত সন্ধ্যায় বক্তৃতামঞ্চে বসেছিলেন, তাঁর ভাষণদানের সময়ের অপেক্ষায়। তারপর তাঁর ভাবান্তর হল তিনি এক বলিষ্ঠ

আবেগময় ভাষণ দিলেন। ভারন্যুম ভ্রাতৃবৃন্দের অনুসরণে তিনি বলেন যে পৃথিবীর অপর প্রান্তের মানুষ হিসাবে তাঁর পরিচয়টুকু দেওয়া ছাড়া নতুন কিছু তাঁর বলার নেই।

"অনেক তত্ত্ব আমাদের রয়েছে। আমরা এখন চাই এই তত্ত্বগুলিকে বাস্তবায়িত করতে। ভারতবর্ষে প্রেরিত খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে আমি বলবো সবই ঠিক আছে। কিন্তু আমরা চাই আরও আর্থিক সাহায্য, এবং আরও কমসংখ্যক ধর্মপ্রচারক। প্রচুর ধর্মমত ভারতবর্ষের রয়েছে। এই তত্ত্বগুলির রূপদানের জন্য সঙ্গতির প্রয়োজন।

"প্রার্থনা অনেক ভাবে করা যেতে পারে। মুখে প্রার্থনা করার তুলনায় হাত তুলে প্রার্থনা করা অনেক উন্নতমানের। সমস্ত ধর্মই শিক্ষা দেয় ভায়ের উপকার করতে। ভালো কাজ করা এমন কিছু আহামরি ব্যাপার নয়—এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই জীবনধারণের জন্য প্রস্ফুটিত হয় এবং মৃত্যুর আগে সঙ্কুচিত হয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। নিঃস্বার্থ পরোপকার করুন। এই আদর্শ ত্যাগ করলেই সঙ্কোচন ও মৃত্যুর সম্ভাবনা উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম

[MORNING HERALD, OCTOBER 22, 1894]

'গতিময় ধর্মের' বিষয়ে ক্রমান ভ্রাতৃবৃন্দের আয়োজিত ক্রমিক অধিবেশনের দ্বিতীয়টিতে প্রচুর ভীড় হয়েছিল। লাইসিয়ুম থিয়েটারে [বাল্টিমোর] যে ধরনের বিরাট জনসমাবেশ দেখা গিয়েছিল, গতরাতের সমাবেশও প্রায় সেরকমই ছিল। পুরোপুরি তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ দিলেন যথাক্রমে রেভারেণ্ড হিরম ক্রমান, রেভারেণ্ড ওয়ালটার ক্রমান ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী রেভারেণ্ড স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তারা সবাই মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন, এঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড বিবেকানন্দ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর পরনে ছিল একটি হলুদ পাগড়ী, কোমরবন্ধে বাঁধা লালরঙের আলখাল্লা। এই বিচিত্র পোশাক তাঁর শারীরিক শোভা আরও বৃদ্ধি করে লোককে অধিক কৌতূহলী করেছে। মনে হল তাঁর ব্যক্তিত্বই সে সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ। সহজ, সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি ভাষণ দিলেন। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত লাতিন গোষ্ঠীর যে কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তির মতই তিনি নিখুঁতভাবে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার ও উচ্চারণ করেছেন। তাঁর ভাষণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল।

মহাসন্ন্যাসীর ভাষণ

"খ্রীষ্ট-জন্মের ছশ'বছর আগে যে ধর্মমত বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তার কেন্দ্র বিন্দু ছিল মানবাত্মার প্রকৃতি সম্পর্কিত চিরন্তন আলোচনা। ধর্মীয় ত্রুটি বিচ্যুতির একমাত্র সমাধান ছিল পশুবলি এবং ঐ জাতীয় প্রথা।

এমন সময় জন্ম হল এক সন্ন্যাসীর [?]। ইনি ছিলেন সেই সব অগ্রদূতদের একজন যাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি শুধু নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করলেন না, এক

ধর্মীয় পুনর্গঠনের পথপ্রদর্শন করলেন। তিনি মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতে তিনটি নতুন আবিষ্কারের কথা বলা হল: প্রথমতঃ, অশুভের অস্তিত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই অশুভের সুনিশ্চিত কোন কারণ বিদ্যমান। সে কারণ হল প্রত্যেক মানুষ অপরের তুলনায় অধিক ক্ষমতাবান হতে চায়। একমাত্র নিঃস্বার্থপরতাই এই অশুভ মনোবৃত্তির বিনাশ ঘটাতে পারে। তৃতীয়তঃ নিঃস্বার্থপরতাই অশুভ দূরীকরণের পথ। শক্তি দিয়ে এই গ্লানি মোচন করা যায় না। ময়লা দিয়ে ময়লা পরিষ্কার হয় না, ঘৃণা কখনও ঘৃণা দূর করতে পারে না।

এই ছিল তাঁর ধর্মের মূলকথা। সামাজিক নিয়ম নীতির জোরে মানুষকে পরোপকারে ব্রতী হতে বাধ্য করা হলে কোন সুফলই পাওয়া যায় না। চালাকি দিয়ে চালাকির উচ্ছেদ করে অথবা শক্তি দিয়ে শক্তির উৎপাটন করে কোন উপকার মেলে না। একমাত্র উপায় হল নিঃস্বার্থপর নরনারী তৈরী করা। বর্তমান সমস্যা দূরীকরণের জন্য নিয়ম রচনা করা চলে, কিন্তু সেগুলি কোন কাজে লাগে না।

বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ইত্যাদি ধর্মীয় তত্ত্ব নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হত, কিন্তু কাজ করা হত সামান্যই। বুদ্ধ গুরুত্ব দিলেন কতগুলি মৌলিক সত্যের উপর। তিনি বল্লেন আমাদের নিষ্পাপ ও পবিত্র হতে হবে এবং অন্যদের পবিত্র করার ব্যাপারেও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে মানুষকে কাজে নামতে হবে, অপরকে সাহায্য করতে হবে। মানুষ নিজের জীবন ও সত্তাকে অন্যের মধ্যে খুঁজে পাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পরোপকারের মাধ্যমেই আমরা আত্মোপকার করতে পারি। তাঁর ধারণা ছিল পৃথিবীতে কাজের তুলনায় কথা বেশি বলা হয়।

এখন ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য কিছু সংখ্যক বৌদ্ধের দরকার। এদেশেও মাত্র একজন বৌদ্ধই ভালো কাজ করতে পারবেন।

আমাদের পিতামহের ধর্মে যখন অতিমাত্রায় তত্ত্ব বিশ্বাস ও যুক্তিসঙ্গত সংস্কারের প্রবণতা দেখা দেয় তখনই পরিবর্তনের প্রয়োজন। এ ধরণের তত্ত্বই অমঙ্গলকর হয় এবং এগুলির পারিমার্জনের প্রয়োজন।"

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের শেষে ঘন ঘন স্বতঃস্ফূর্ত করতালি শোনা গেল।

[BALTIMORE AMERICAN, OCTOBER 22, 1894]

'গতিশীল ধর্ম' প্রসঙ্গে ভ্রুমান ভ্রাতৃবৃন্দের পরিচালিত ক্রমিক অধিবেশনের দ্বিতীয়টি গতরাত্রে লাইসিয়াম (Lyceum) থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল। প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বামী বিবেকানন্দ মুখ্য ভাষণ দিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন এবং বুদ্ধের জন্ম সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে যেসব ধর্মীয় বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল সে কথাও বললেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে যেসব সামাজিক বৈষম্য ছিল সেগুলির নজির পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, "খ্রীষ্টজন্মের ছ'শবছর আগে ভারতবর্ষের পুরোহিত সম্প্রদায় ভারতবাসীর উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। উচ্চশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল সাধারণ মানুষ।

মানবজাতির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী যার অনুগামী সেই বৌদ্ধধর্ম কোন সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এই ধর্ম ছিল পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিকৃতিগুলির পরিমার্জন। সম্ভবতঃ বুদ্ধই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি মানবজাতির শুভকামনায় ব্যক্তি স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। মানুষের চরম দুঃখদুর্দশার প্রতিষেধক খুঁজে বার করতে তিনি গৃহত্যাগী হন, জীবনের সমস্ত বিলাস বিসর্জন করেন। যেসময় সাধারণ মানুষ ও পুরোহিত সম্প্রদায় ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যস্ত, ঠিক সে সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন সম্পূর্ণ অবহেলিত একটি অতি সত্যকথা যে মানুষের দুঃখ, দুর্দশা এখনও ঘোচে নি। এই দুর্দশার কারণ আমাদের স্বার্থপরতা, আমরা সকলে একে অন্যকে ছাড়িয়ে উপরে উঠতে চাই। যে মুহূর্তে স্বার্থপরতা বিলুপ্ত হচ্ছে সে মুহূর্তে সমস্ত অশুভ সম্ভাবনা দূরীভূত হবে। আইনকানুন প্রবর্তন করে কখন অসৎ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে দূর করা চলে না। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়ে আসছে। আঘাত দিয়ে আঘাত মোচন চলে না। অশুভ দূর করার একমাত্র উপায় হল নিঃস্বার্থপরতা। আমাদের উচিত আরও বিষদ-আইনকানুন প্রবর্তন না করে লোককে আইন মেনে চলতে শিক্ষা দেওয়া। বৌদ্ধধর্মও ছিল পৃথিবীর প্রথম প্রচারিত ধর্ম, কিন্তু বুদ্ধ অন্য ধর্মের বিরোধিতা না করতে উপদেশ দিতেন। সম্প্রদায়গুলি অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কল্যাণময় দিকগুলির ক্ষতি করছে।

সবধর্মই মঙ্গলময়

[WASHINGTON POST, OCTOBER 29, 1894]

পিপলস্ চার্চের যাজক ডক্টর কেণ্টের আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ চার্চেই গতকাল ভাষণ দিলেন। তাঁর সকালের ভাষণ প্রায় ধর্মোপদেশের সমতুলা। এই ভাষণে ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং গোঁড়া সম্প্রদায়কে কিছুটা নতুনভাবেই বোঝানো হয় যে প্রত্যেক ধর্মের মূলেই শুভের অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে সমস্ত ভাষার মতই সমস্ত ধর্ম একই সূত্র থেকে উৎসারিত এবং আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সব ধর্মেই ভালো যতক্ষণ তাদের প্রাচীনপন্থী মনোভাব এবং গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখা যায়। বিকেলের ভাষণটি ছিল আর্যজাতি সম্পর্কিত। তিনি বিভিন্ন সমগোত্রীয় জাতির ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণের তুলনামূলক বিচার করে বোঝালেন সংস্কৃত থেকেই এসবের উৎপত্তি। অধিবেশনের পর 'পোস্ট' পত্রিকার জনৈক সাংবাদিককে শ্রীকানন্দ বলেন, "কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা নেই। আমি একজন দর্শক মাত্র এবং যতদূর সম্ভব মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টা করি। আমার মতে সমস্ত ধর্মই মঙ্গলকর। জীবনের জটিল রহস্যগুলি সম্বন্ধে আর পাঁচজনের মতই কল্পনা করা ছাড়া অন্য কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।

ধর্মীয় প্রসঙ্গে যেসব যুক্তিতর্কের সম্মুখীন আমরা হই, আমার ধারণা, সেসব বিষয়ের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা একমাত্র পুনর্জন্মবাদই দিতে পারে। আমি অবশ্য কোন

মতবাদ হিসাবে এটিকে চালাতে চাইছি না। এটি তত্ত্ব ছাড়া কিছুই নয়, এবং একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এ বিষয়ের কোন প্রমাণ দেওয়াচলে না। ঐ প্রমাণও তার কাছেই গ্রহণযোগ্য যিনি সেটির অধিকারী। আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য যেমন আমার কাছে নেই তেমনই আমার অভিজ্ঞতার মূল্যও আপনি দেবেন না। আমি অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করি না, ধর্মীয় প্রসঙ্গে এগুলিকে আমার অসহ্য লাগে। আপনি আমার কানের কাছে, সশব্দে সারা বিশ্ব গুঁড়িয়ে দিলেও আমি মানতে পারবো না যে আপনি কোন দৈব সাহায্যে একাজ করেছেন।

তিনি গোঁড়া বিশ্বাসী

"অবশ্য আমি নিশ্চিত মানি যে অতীত ছিল এবং বর্তমানের প্রয়োজনে ভবিষ্যৎও থাকবে। আমরা এখান থেকে চলে গেলে নিশ্চয় অন্য কোন আকার গ্রহণ করবো। সুতরাং পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এর কোন প্রমাণ আমি দিতে পারবো না এবং যে কেউ আমার এই বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারেন, যদি তিনি পরিবর্তে এর চেয়ে ভালো কোন মতবাদের সন্ধান দেন। আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন মতবাদ খুঁজে পেলাম না যা আমাকে এত সুন্দর ব্যাখ্যা যোগাতে পেরেছে।" শ্রীকানন্দ কলিকাতা নিবাসী এবং সেখানকার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী এবং তাঁর ইংরাজীতে কিছুটা আদিবাসী ঢঙ লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ ও ভারতবাসীদের সম্পর্ক খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। সুতরাং আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি যেসব নিরুৎসাহী মন্তব্য করবেন তা যে কোন বিদেশী ধর্মপ্রচারককে হতোদ্যম করবে। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পশ্চিমী শিক্ষা প্রাচ্যের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে।

উত্তরে তিনি বলেন: "একথা সত্যি যে, প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে কোন মতই কোন দেশে প্রবেশাধিকার পায় না। কিন্তু প্রাচ্যবাসীদের মনের উপর খ্রীষ্টধর্ম যদি কোন প্রভাব আদৌ বিস্তার করে থাকে তাহলে তা অতি নগণ্য, তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। প্রাচ্যের ধর্মমত এখানে যেটুকু রেখাপাত করেছে পাশ্চাত্যের ধর্মমতও ঠিক ততটাই বা তারও কম রেখাপাত করেছে প্রাচ্যে। তাও ওদেশের গুণী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে। জনসাধারণের উপর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাব কিছুই বোঝা যায় না। যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে থাকেন তাঁদের সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু হিন্দুদের সংখ্যা এত বেশী যে এইসব ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা তাঁদের উপর কোন রেখাপাতই করতে পারে না।"

যোগীরা বাজিকর

যোগীদের অলৌকিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না প্রশ্ন করা হলে স্বামী বিবেকানন্দ জানান যে অলৌকিক বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। তাঁর দেশে বহুসংখ্যক চতুর বাজিকর রয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপ সবই ভেল্কীবাজী। শ্রীবিবেকানন্দ জানান যে মাত্র একবার তিনি একজন ফকিরকে এধরনের কিছু ভেল্কী

দেখাতে দেখেছেন। লামাদের ক্ষমতা সম্পর্কেও তাঁর এক মত। তিনি বলেন: "এইসব ভোজবাজীর দর্শকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন, শিক্ষিত, স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন দর্শক খুবই কম আছে। সুতরাং কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা যাচাই করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।"

হিন্দু জীবনদর্শন

[BROOKLYN TIMES, DECEMBER 31st, 1894]

গতরাতে ব্রুকলাইন এথিক্যাল্ এসোসিয়েশন পাউচ গ্যালারীতে স্বামী বিবেকানন্দকে সম্বর্ধনা জানালেন। সম্বর্ধনার আগে এই বিশিষ্ট অতিথি ভারতীয় ধর্মপ্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বল্লেন: "হিন্দু জীবন দর্শনের মতে শেখার জন্যই আমাদের জন্ম, শিক্ষালাভের মধ্যেই জীবনের সমস্ত আনন্দ নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভের জন্যই মানবাত্মার আবির্ভাব হয়। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমি আমার ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে পারি, এবং আপনারাও আমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুরূপ প্রেরণা পাবেন। যদি একটি ধর্মমত সত্যি হয় তাহলে বাকিগুলিও সত্যি হতে বাধ্য। একই সত্যের বিভিন্নরূপ আমরা দেখি এবং বিভিন্ন জাতের শারীরিক, মানসিক গঠনের তারতম্যের জন্য এইসব আকৃতি-গত পার্থক্য নজরে পড়ে।

যদি বস্তু ও তার বিবর্তনই আমাদের একমাত্র মূলধন হয় তাহলে আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখনও প্রমাণ করা যায় নি যে বস্তু থেকে চিন্তার উৎপত্তি। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে মানবদেহে কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই প্রবণতাগুলি আসলে দৈহিক গঠনকেই বোঝায় এবং এই দেহের মধ্যে এক অদ্ভুত মন অদ্ভুতভাবে কাজ করে। এই অদ্ভুত প্রবণতার উৎপত্তি অতীত ঘটনা থেকে। যে আত্মার যেরকম প্রবণতা সাদৃশ্যের নিয়মানুযায়ী সেই আত্মা এমন একটি দেহ ধারণ করে যে দেহ পূর্বোক্ত প্রবণতাগুলিকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম। এই নিয়ম সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। কারণ বিজ্ঞান সবকিছুর ব্যাখ্যা হিসাবে অভ্যাসকে দাঁড় করায় এবং পুনঃ সঙ্ঘটনের মাধ্যমেই স্বভাব বা অভ্যাস তৈরী হয়। সুতরাং একটি নবজাতক আত্মার স্বাভাবিক অভ্যাসগুলিকে এই পুনরাবৃত্তির সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়। এজন্মে তারা সৃষ্টি হয় নি; সুতরাং এগুলি নিশ্চয়ই পূর্বজন্ম থেকে উদ্ভূত।

ধর্মগুলি হল বহুসংখ্যক সোপান। তাদের প্রত্যেকটি হল মানুষের ঈশ্বর উপলব্ধির এক একটি পর্যায়। সুতরাং কোনটিকেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। কোন পর্যায়ই বিপজ্জনক বা খারাপ নয়। প্রতিটিই কল্যাণকর। একটি মানুষ যেমন শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তেমনি প্রতিটি ধর্ম এক সত্য থেকে আর এক সত্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে। গোঁড়ামি দেখা দিলেই এই ধর্মমতগুলি বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ক্রমোন্নয়নের গতি স্তব্ধ হলেই ধর্ম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ হয়। শিশু যদি বৃদ্ধ না হতে চায় তাহলে বলতে হবে সে অসুস্থ। কিন্তু ধর্মমতগুলি গতিশীল

হলে প্রতিটি ধাপ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে তারা একদিন পূর্ণসত্যের সন্ধান পাবে। সুতরাং আমরা নিরাকার ও সাকার দুই ঈশ্বরকেই মানি এবং একই সঙ্গে স্বীকার করি সকল ধর্মমতকে একদা যাদের অস্তিত্ব ছিল, এখন যাদের আছে এবং ভবিষ্যতে যাদের অস্তিত্ব থাকবে। আমরা শুধু সর্বধর্মসহিষ্ণুই নই, অন্য ধর্মমতগুলিকে আমরা স্বীকারও করি।

বাস্তবজগতে সম্প্রসারণ হল জীবন এবং সঙ্কোচনের অর্থ মৃত্যু। যা কিছুর সম্প্রসারণ বন্ধ হয় সেগুলি সবই মৃত। এই নিয়মকে আধ্যাত্মিক জগতে কাজে লাগিয়ে আমরা বলি কোন মানুষ যদি বাঁচতে চায়, সম্প্রসারিত হতে চায়, তাহলে তাকে ভালোবাসতে হবে, জীবে প্রেম না করলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

সুতরাং প্রেমের স্বার্থেই আমাদের ঈশ্বরপ্রেমী হতে হবে, কর্তব্যের খাতিরেই কৃত্য সম্পাদন করতে হবে, ফললাভের চিন্তা না করে কাজ করতে হবে। জানতে হবে যে আমরা অনেক পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, বুঝতে হবে মানবদেহই ঈশ্বরের মন্দির।

[BROOKLYN DAILY EAGLE DECEMBER 31, 1894]

মুসলিম, বৌদ্ধ, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মমতের উল্লেখ করে বক্তা বললেন যে হিন্দুরা বৈদিক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান লাভ করে। বেদে বিশ্বপ্রকৃতিকে অনাদি, অনন্ত হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। বেদে বলা হয় যে প্রকৃতপক্ষে মানুষ হল দেহস্থিত আত্মা। এই দেহের মৃত্যু হবে, কিন্তু মানুষটির নয়। আত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। শূন্য থেকে আত্মার সৃষ্টি হয়নি, কারণ সৃষ্টির অর্থ হল সংযোজন। অর্থাৎ এই সংযোজনও ভবিষ্যতে দ্রবীভূত হতে পারে। সুতরাং আত্মার সৃষ্টি হয়ে থাকলে তার বিনাশও আছে। অতএব আত্মার সৃষ্টি হয়নি। প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমরা তাহলে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করতে পারি না কেন? এ প্রশ্নের সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। সচেতনতা হল মন নামক সমুদ্রের উপরিভাগ মাত্র, এর গভীরে রয়েছে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। চিরস্থায়ী কিছু খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হল। বস্তুতঃ মানুষের শরীর, মন এবং সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন অনন্ত সত্তাকে খুঁজে বার করার প্রশ্ন বহুবার আলোচিত হয়েছে। আধুনিক বৌদ্ধরা যাদের প্রতিনিধি সেই দলটি প্রচার করছেন যে পঞ্চেন্দ্রিয় যা কিছুর নিষ্পত্তি করতে পারে না, সেরকম বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সমস্ত সত্তাই পরমুখাপেক্ষী এবং মানুষ যে স্বাধীন সত্তা এ ধারণা ভ্রান্ত।

অপরপক্ষে আদর্শবাদীদের মত হল প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তাই স্বাধীন। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হল, প্রকৃতি স্বাধীন ও পরাধীন সত্তার, আদর্শ ও বাস্তবের সংমিশ্রণ। নির্ভরশীলতা যে প্রকৃতির অঙ্গ তার প্রমাণ হল আমাদের দেহের গতিবিধির নিয়ন্ত্রক আমাদের মন এবং এই মনকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মা। মৃত্যু পরিবর্তন মাত্র। মরজগত উত্তীর্ণ হয়ে যারা অমৃতলোকে উচ্চাসন লাভ করেছেন তাঁরা জীবৎকালেও একই আসনে আসীন ছিলেন, অপরপক্ষে ইহজগতে যারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত ছিলেন পরলোকে তাদের অবস্থার কোন তারতম্য হয় না। প্রত্যেক মানুষই পূর্ণ সত্তা।

অন্ধকারে বসে থেকে যদি সেই ঘোর অন্ধকারের জন্য কষ্ট পাই তাহলে কোন লাভই হবে না। কিন্তু যদি দেশলাই জোগাড় করে আলো জ্বালাই তবেই অন্ধকার দূরীভূত হয়। একইভাবে, নিজেদের দেহকে অপবিত্র জেনে যদি অনুতাপে দগ্ধ হই, তাহলেও কোন উপকার মিলবে না। যুক্তির আলো দিয়ে এই সন্দেহের অন্ধকার দূর করতে পারি। শিক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টানরা হিন্দুদের কাছ থেকে শিখতে পারে, হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার পর তিনি তাঁর নিজের ধর্মগ্রন্থ আরও ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে পেরেছেন। স্বামীজী বললেন: "আপনাদের সন্তানদের বলবেন ধর্ম সদর্থক বস্তু, কখনই নঙর্থক কিছু নয়। ধর্ম বিভিন্ন ব্যক্তির উপদেশের সংকলন নয়, এটি হল এক ক্রমোন্নয়ন। মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে উন্নত সত্তা নির্গমনের পথ খুঁজে বেড়ায় তারই ক্রমবিকাশ হল ধর্ম। প্রত্যেক নবজাতকই কিছু অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে জন্মায়। স্বাধীনতার ধারণা প্রমাণ করে যে দেহ এবং মনের ঊর্ধ্বে কিছু রয়েছে। দেহ এবং মন হল পরস্পর সাপেক্ষ। যে আত্মা আমাদের উদ্ভাসিত করে, সেই আত্মা হল স্বাধীনসত্তা এবং এই সত্তাই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী। আমরা মুক্ত না হলে পৃথিবীকে কি ভাবে সুন্দর ও পূর্ণ করা সম্ভব? আমাদের ধারণা আমরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছি, আমাদের যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছি নিজহাতে। আমরা এসব সৃষ্টি করেছি সুতরাং ধ্বংসও করতে পারি। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি বিশ্বপিতা, তাঁর সন্তানের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা, তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বশক্তিমান। আপনাদের মতআমরাও একজন ঈশ্বরবিশেষে বিশ্বাসী কিন্তু আমরা আরও এগিয়ে গেছি। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছেন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত ধর্মমতেই আমরা বিশ্বাসী। হিন্দুরা সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা জানায় কারণ বিয়োগ নয়, সংযোগই হল প্রকৃত ধারণা। সমস্ত সুন্দর রঙ দিয়ে আমরা একটি ফুলের স্তবক তৈরী করব একজন সুনির্দিষ্ট ঈশ্বরের জন্য, যিনি স্রষ্টা। ভালোবাসার জন্যেই আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসবো, কর্তব্যের খাতিরেই তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করব। কাজের স্বার্থেই আমরা তাঁর জন্য কাজ করব, শুধু উপাসনার জন্যই তাঁকে উপাসনা করব।

সব গ্রন্থই ভালো, কিন্তু তারা মানচিত্র মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশ অনুযায়ী একটি বই পড়ে আমি জানলাম যে এক বছরে এই ক'ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তারপর আমাকে সেই বইটি নিঙড়াতে বলা হল। আমি তাই করলাম, কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়ল না। বই থেকে ধারণাটুকু মাত্র পাওয়া গেল।

অগ্রগতির পথে ধর্মগ্রন্থ, মন্দির অথবা চার্চ থেকে আমরা কিছু ভালো ধারণা লাভ করতে পারি। উৎসর্গ ও মন্ত্রোচ্চারণ ধর্ম নয়। এসবই ভালো যদি পূর্ণতার আদর্শে পৌঁছতে কোন সাহায্য আমরা এদের কাছ থেকে পাই। খ্রীষ্টের মুখোমুখি দাঁড়ালেই এই পূর্ণতার আদর্শ আমরা উপলব্ধি করব।

এগুলি হল কিছু নির্দেশ যা থেকে আমরা লাভবান হতে পারি। এই মহাদেশ আবিষ্কার করার পর তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি

নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন। তারা তাঁর কথা মানতে চাইল না, অন্ততঃ কিছু লোকতো নয়ই। তিনি তাদের সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে বললেন। আমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, বই পড়ে আমরা এই সব সত্যের কথা জানতে পারি এবং আত্মিক উপলব্ধি হলে এগুলি সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় এবং সেই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে আমাদের কেউ চ্যুত করতে পারে না।"

ভাষণের পর শ্রোতাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয় যাতে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তার মতামত জানতে পারেন। অনেকে এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

নারীত্বের আদর্শ

[BROOKLYN STANDARD UNION, JANUARY 21, 1895]

এথিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর জেনস্ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে স্বামী বিবেকানন্দকে উপস্থাপিত করার পর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি তাঁর ভাষণ দিলেন।

কোন দেশের অনুন্নত এলাকার ফসল দেখে সেই দেশ সম্বন্ধে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না। একজন পৃথিবীর প্রতিটি আপেল গাছের নীচ থেকে পোকায়-কাটা, পচা আপেল সংগ্রহ করে, তাদের প্রতিটির বিষয়ে একটি বই লিখতে পারে। কিন্তু তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার পক্ষে কিছু না জানা সম্ভব। শ্রেষ্ঠদের দিয়েই একটি জাতকে বিচার করা চলে, পতিতরা নিজেরাই একটি সম্প্রদায় বিশেষ। একইভাবে একটি রীতিকে তার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ দিক থেকে বিচার করাই একমাত্র সঙ্গত ও সঠিক পথ।

পৃথিবীর সুপ্রাচীন জাত ভারতীয় আর্যদের মধ্যেই নারীত্বের আর্দশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই জাতের পুরুষ ও মহিলারা ছিলেন সম ধর্মাচারী, বেদের ভাষায় সহ-ধর্মিণী। সেখানে প্রতিটি পরিবারের একটি যজ্ঞকুণ্ড থাকত। বিবাহের সময় এই যজ্ঞকুণ্ডে বিবাহের পুতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হত। যতদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজন দেহত্যাগ না করতেন ততদিন এই অগ্নিশিখা অনির্বাণ থাকত। এদের একজনের মৃত্যু হলে সেই অগ্নিকুণ্ড থেকেই মৃতব্যক্তির চিতার আগুন জ্বালানো হত। সেখানে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আহুতি প্রদান করতেন এবং এই ধারণা এত পরিব্যাপ্ত ছিল যে কোন পুরুষ একাকী প্রার্থনা করতে পারত না। কারণ তখন সে অর্ধ-মানুষ হিসাবে গণ্য হত। এই কারণে কোন অবিবাহিত ব্যক্তি পুরোহিত হতে পারত না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেও একই ধারণার প্রচলন ছিল।

কিন্তু এক সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে এইসব দেশ-গুলিতে নারীর সম ধর্মাচরণের ধারণা অবলুপ্ত হয়। সেমেটিক বংশোদ্ভূত এশিরিয়ান সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ঘোষণা করে যে এমনকি বিবাহিত মেয়েদেরও কোন বাক্‌স্বাধীনতা, কোন অধিকার নেই। পার্শীরা এই ব্যাবিলনীয়-ধারণা একান্তভাবে গ্রহণ করে এবং তারাই এই ধারণা গ্রীস ও রোমে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে নারীত্বের অবমাননা চলতে থাকে।

আর একটি ঘটনাও এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী—বিবাহব্যবস্থার পরিবর্তন। বিবাহের প্রাচীন পন্থাটি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় মা-ই ছিলেন কেন্দ্র-বিন্দু এবং বিবাহের পর মহিলারা স্বগৃহে থাকতেন। এর ফলে পোলিঅ্যাণ্ডারদের মধ্যে এক অদ্ভুত রীতির প্রবর্তন হয়। এই রীতি অনুযায়ী পাঁচ ছয়জন ভাই প্রায়ই একজন মহিলাকে বিয়ে করত। এমন কি বেদেও এমন একটি সংস্থান রয়েছে যা থেকে এই অদ্ভুত রীতির কিছু আভাস মেলে। বলা হয়েছে যে নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কোন পুরুষের মৃত্যু হয় তাহলে তার বিধবা স্ত্রী মা না হওয়া পর্যন্ত অন্য লোকের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু এই সহবাসের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় তারা ঐ রমণীর মৃত স্বামীর সন্তান হিসাবে পরিচিত হয়। পরবর্তী কালে বিধবাদের নতুন করে বিয়ে করার সম্মতিও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন তার বিরোধিতা করা হয়।

এধরনের কিছু মাত্রাধিক্যের পাশাপাশি এক গভীর ব্যক্তিগত শুদ্ধতার ধারণাও হিন্দুজাতের মধ্যে গড়ে ওঠে। বেদের প্রতিটি পাতায় ব্যক্তিগত পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। এই পবিত্রতা সংক্রান্ত নিয়মগুলি ছিল অত্যন্ত কড়া। প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শিক্ষায়তনে পাঠানো হত, যেখানে তারা কুড়ি বা তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করত। সেখানে সামান্যতম অপবিত্রতার শাস্তিও ছিল ভয়ঙ্কর। এই ব্যক্তিগত পবিত্রতার ধারণা আমাদের জাতের অন্তরে গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়ে গেছে এবং তা প্রায় মানসিক বাতিকের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ মিলবে মুসলমান কর্তৃক চিতোর অধিকারের ঘটনার মধ্যে। ব্যাপক প্রতিবন্ধকের মধ্যেও চিতোরবাসীরা তাদের নগরকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়েছিল; মহিলারা যখন বুঝতে পারলেন যে পরাজয় অনিবার্য তখন তারা বাজারের মাঝখানে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরী করলেন এবং শত্রুপক্ষ শহরের দরজা ভেঙে ঢোকা মাত্র সাড়ে চুয়াত্তর হাজার মহিলা সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দিলেন। এই মহৎ দৃষ্টান্ত আজকের ভারতেও প্রচলিত আছে, 'সাড়ে চুয়াত্তর' এই সংখ্যা মুদ্রিত কোন চিঠি যদি কোন লোক অন্যায়ভাবে পড়ে তাহলে যে পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় ঐ মহিয়সী চিতোর রমণীরা আত্ম-বিসর্জন করেছিলেন ঠিক সমগোত্রীয় পাপের ফল সেই অবৈধ পাঠককে পেতে হবে।

এর পরের যুগ হল সন্ন্যাসীদের। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের যুগ শুরু হল। বৌদ্ধধর্মে বলা হল যে একমাত্র সন্ন্যাসীরাই নির্বাণলাভ করতে পারে। এই নির্বাণ হল খ্রীষ্টধর্মে বর্ণিত স্বর্গের সমতুল্য সুখকর অবস্থা। ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ এক বিশাল মঠে পরিণত হল। একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সংগ্রাম দেখা দিল—তা হল পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রাম। সমস্ত দোষ চাপানো হল স্ত্রীলোকদের উপর। এমনকি প্রবাদবাক্যগুলিতেও তাদের বিরুদ্ধে সর্তকীকরণ করা হল। একটি প্রবাদবাক্যে প্রশ্ন করা হল—'নরকের দ্বার কি?' তার উত্তর হল 'নারী'। আর একটিতে বলা হল—'কোন বন্ধন আমাদের সকলকে ধূলার সঙ্গে আবদ্ধ রাখে? নারী'। আর একটিতে বলা হল 'কোন ব্যক্তি অন্ধশ্রেষ্ঠ? যে নারীর দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়।'

পশ্চিমী দেবালয়গুলিতেও এ ধরনের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। যে কোন ধরনের সন্ন্যাসজীবনের অগ্রগতির অর্থ ছিল নারীত্বের অবমাননা।

কিন্তু ঘটনাক্রমে নারীত্বের আর একটি ধারণার সৃষ্টি হল। পশ্চিমে এ ধারণার আদর্শ রূপায়িত হল স্ত্রীর মধ্যে, ভারতবর্ষে মায়ের মধ্যে। কিন্তু কখনই ভাববেন না যে পুরোহিতরাই এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। আমি জানি পৃথিবীর সমস্ত বিষয়েই তারা তাদের দাবি জানায়, নিজে একজন সন্ন্যাসী হয়েও আমি একথা বলছি। পৃথিবীর সকল ধর্মে সকল পরিবেশের সাধুসম্প্রদায়ের কাছে আমি নতজানু হব, কিন্তু আমি অকপটভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে পশ্চিমে নারী প্রগতির হোতা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরা। ধর্ম অবশ্যই কিছু করেছে, কিন্তু সবটুকু নয়। এমন কি আজও এশিয়া মাইনরে বিশপরা হারেম তৈরী করেন!

খ্রীষ্টান আর্দশের প্রতিফলন ঘটেছে অ্যাংলো স্যাকসানদের মধ্যে। মুসলমান রমণীরা তাদের পশ্চিমী বোনেদের তুলনায় অনেক পৃথক, কারণ তাদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতির ততটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি না। কিন্তু তার জন্য মনে করার কোন কারণ নেই যে মুসলিম স্ত্রীলোকরা অসুখী। ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়। বিগত হাজার বছর ধরে ভারতীয় মহিলারা সম্পত্তির অধিকার ভোগ করে এসেছে। এদেশে কোন লোক তার স্ত্রীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। ভারতবর্ষে মৃত ব্যক্তির সমস্ত ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন তার স্ত্রী।

ভারতবর্ষে মা হলেন পরিবারের কেন্দ্র এবং তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের কাছে তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ, যেহেতু ঈশ্বর হলেন জগন্মাতা। একজন সন্ন্যাসিনীই সর্বপ্রথম ঈশ্বরের অভিন্নতা উপলব্ধি করেন এবং এই মতবাদ বেদের প্রথম শ্লোকগুলির একটিতে লিপিবদ্ধ করেন। আমাদের ঈশ্বর একাধারে ব্যক্তিবিশেষ ও ও অসীম। অসীম হলেন পুরুষ, ব্যক্তিরূপী হলেন রমণী। এই ভাবেই একটি অধুনা প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে 'ঈশ্বরের প্রথম স্বরূপ হল সেই হাত যে হাত দোলনা দোলায়।' প্রার্থনার মাধ্যমে যে ব্যক্তির জন্ম তিনি আর্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যৌনতৃপ্তির ফল হিসাবে যার জন্ম তিনি অনার্য।

জন্মপূর্ব প্রভাবের এই মতবাদ এখন ধীরে ধীরে গৃহীত হচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সঙ্গে ঘোষণা করছে :

"নিজেকে বিশুদ্ধ রাখুন।" এই তত্ত্ব ভারতবর্ষে এত গভীরভাবে গৃহীত হয়েছে যে প্রার্থনার মাধ্যমে সম্পূর্ণতা লাভ না করলে বিবাহকেও আমরা ব্যভিচার বলে থাকি। প্রত্যেক সৎ হিন্দুর সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি যে আমার জন্মদাত্রী একান্ত পবিত্র, সুতরাং আমার যা আছে তা সবকিছুর জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। আমাদের জাতের গোপন রহস্য হল ঐটি—পবিত্রতা।

প্রাচ্যের নারী

('The Chicago Daily Inter-Ocean' সংবাদপত্রে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

এক বিশেষ সভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাটি হচ্ছে নারীদের প্রতি আচরণ। প্রাচীন গ্রীসে নারী ও পুরুষের মর্যাদায় একেবারে কোন প্রভেদ ছিল না। তাদের মধ্যে পূর্ণ সমভাব ছিল। কোন হিন্দুও বিবাহিত না হলে পুরোহিত হতে পারে না, ভাবটা এই যে অবিবাহিত ব্যক্তি মাত্র আধখানা মানুষ, অসম্পূর্ণ। পূর্ণ নারীত্ব সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। আধুনিক হিন্দু নারীর জীবনের প্রধান ভাব হচ্ছে তার সতীত্ব। স্ত্রী হচ্ছে এক বৃত্তের কেন্দ্র, যার স্থিরত্ব নির্ভর করে তার সতীত্বের উপর। হিন্দু বিধবাদের সহমরণের কারণ হচ্ছে এই ভাবের চরম অবস্থা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের চেয়ে হিন্দুনারীরা সম্ভবতঃ বেশী আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না ও ধর্মশীলা। যদি আমরা তাদের ওই সব সদ্‌গুণ বজায় রাখতে পারি এবং সেই সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত করে তুলতে পারি তাহলে ভবিষ্যতের হিন্দুনারী জগতের আদর্শ নারী হয়ে উঠবে।"

ধর্মীয় ঐক্যের সম্মেলন

('The Chicago Sunday Herald', ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তৃতার বিবরণ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "এই সম্মেলনে প্রদত্ত সব ভাষণের সাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এই ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কারণ আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান বলে এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা। এখন এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব—বিশেষ করে ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর—স্বীকার করে না। যদি আমরা এই সব সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে বাইরে রাখতে না চাই—অবশ্য সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্রাতৃত্ব সার্বজনীন হবে না—সমস্ত মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদের মিলনস্থলকে প্রশস্ত করতেই হবে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে মানবজাতির কল্যাণ সাধন আমাদের কর্তব্য, কারণ প্রতিটি মন্দ ও হীন কার্যের প্রতিক্রিয়া কর্তার উপরই বর্তায়। এটা আমার কাছে মনে হয় দোকানদারির ভাব—নিজেরা প্রথমে, পরে আমাদের ভাইরা। আমি মনে করি ঈশ্বরের সার্বজনীন পিতৃত্বে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, আমাদের ভাইকে ভালবাসতেই হবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক মত মানুষের মধ্যে দেবত্ব স্বীকার করে এবং তার এই দেবত্বকে আহত করতে না চাইলে তার কোন ক্ষতি করা তোমার উচিত নয়।"

ভগবৎ প্রেম—এক

(The Chicago Herald পত্রিকার ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, সংখ্যায় প্রকাশিত বক্তৃতার বিবরণ)

লাফলিন ও মনরো স্ট্রীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতাগৃহ গতকাল সকালে শ্রোতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রচার' শোনার জন্য। তাঁর উপদেশের বিষয় ছিল ভগবৎ প্রেম। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁর ভাষণ বাগ্মিতাপূর্ণ ও অপূর্ব হয়েছিল।

তিনি বলেন যে, বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন। তিনি আরও বলেন যে, মহান ও সুন্দরের উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসাই মানুষকে দান, দয়া ও ন্যায়পরায়ণতায় প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ।

বক্তা চিকাগোতে আসা অবধি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত করে রেখেছে, কারণ সকলেই ঈশ্বর প্রেম থেকে উদ্ভূত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের যুক্তিসম্মত অনুসিদ্ধান্ত।

বক্তা বলেন যে, তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করেছেন, পর্বত-গুহায় রাত কাটিয়েছেন এবং প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই বিশ্বাস লাভ করেছেন যে স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বে এমন কিছু আছে যা মানুষকে অন্যায় থেকে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে তা হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। ঈশ্বর যদি যীশু, মহম্মদ ও বৈদিক ঋষিদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে কেন কথা বলেন না, তিনিও তো তাঁর আর এক সন্তান?

স্বামী আরও বলেন, "সত্যি তিনি আমার সঙ্গে ও তাঁর সকল সন্তানের সঙ্গে কথা বলেন। আমরা আমাদের চারদিকে তাঁকে দেখি এবং তাঁর অসীম ভালবাসা দ্বারা সর্বদা প্রভাবান্বিত হই এবং সেই ভালবাসা থেকে আমাদের মঙ্গল ও শুভকার্যের প্রেরণা লাভ করি।"

ভগবৎ প্রেম—দুই

(ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটারিয়ান চার্চে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪, এক ভাষণের ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন)

গত রাত্রে ইউনিটারিয়ান চার্চে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বিবেকানন্দ ভাষণ দিয়েছিলেন 'ভগবৎ প্রেম' সম্বন্ধে। বক্তার মন্তব্যের প্রবণতা ছিল বোঝানো যে, ঈশ্বরকে আমরা মানি, যথার্থই তাঁকে চাই বলে নয়, বরং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাঁকে আমাদের দরকার। বক্তা বলেন, প্রেম হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, প্রেমাস্পদের গুণকীর্তন ভিন্ন সেখানে অন্য চিন্তার স্থান নেই। প্রণতি ও পূজা হচ্ছে

প্রেমের স্বভাব, প্রতিদানে প্রেম কিছুই চায় না। বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আবেদন হলো শুধুই ভালবাসা।

একজন হিন্দু-সাধিকা সম্পর্কে, শোনা যায় যে, বিয়ের পর তিনি তাঁর নৃপতি পতিকে বলেছিলেন, তিনি ইতিপূর্বেই বিবাহিতা। রাজা জিজ্ঞাসা করেন, 'কার সঙ্গে?' জবাব হলো, 'ভগবানের সঙ্গে।' তিনি দীনদরিদ্রের মাঝে গিয়ে তাদের শিখিয়েছিলেন, ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালবাসার নীতি। তাঁর প্রার্থনাগীতি-গুলির মধ্যে একটি থেকে টের পাওয়া যায় তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত গভীর ছিল: "আমি ধন চাই না, মান চাই না, এমন কি মুক্তিও চাই না; তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে শত শত নরকভোগ করাতে পার, তবু তোমাকেই আমার প্রিয় প্রভু বলে শ্রদ্ধা করতে দিও।" এই সাধিকার মধুর ভজনাবলী প্রাচীন ভাষায় পরিপূর্ণ। যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল, এক নদীর তীরে গিয়ে তিনি সমাধিমগ্ন হলেন। এক সুন্দর সঙ্গীত রচনা করে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন যে তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি যাত্রা করছেন।

পুরুষেরা ধর্মের দার্শনিক বিচারে সক্ষম। নারী স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ, সে ভগবানকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। সলোমনের প্রার্থনা সঙ্গীতগুলি বাইবেলের সবচেয়ে সুন্দর অংশগুলির অন্যতম। এগুলির ভাব অনেকটা ওই হিন্দু সাধিকার ভজনের মতো অনুরাগে পূর্ণ। তা সত্ত্বেও আমি শুনেছি এই অতুলনীয় সঙ্গীতগুলি খ্রীস্টানরা বাইবেল থেকে বাদ দিতে যাচ্ছেন। গানগুলির এক ব্যাখ্যা আমি শুনেছি, যাতে বলা হয়েছে সলোমন এক যুবতীকে ভালবাসতেন এবং যুবতীটির কাছ থেকে তাঁর রাজোচিত প্রেমের প্রতিদান কামনা করেছিলেন। কিন্তু যুবতী অন্য এক যুবককে ভালবাসত এবং সলোমনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক ছিল না। এই ব্যাখ্যা কিছু লোকের বেশ ভাল লাগবে, কারণ এরকম আলৌকিক ভগবৎ প্রেম তারা বুঝতে পারে না, যা এইসব সঙ্গীতের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভারতের ভগবৎ ভক্তি অন্যান্য দেশের ভগবৎ ভক্তির থেকে স্বতন্ত্র, কারণ যে দেশের তাপমান-যন্ত্র শূন্যের নীচে ৪০ ডিগ্রি প্রদর্শন করে, সে দেশের লোকের প্রকৃতিও কিছু ভিন্ন ধরনের। যে আবহাওয়ায় বাইবেল রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়, সেখানকার লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঠাণ্ডা মাথার পাশ্চাত্য জাতিগুলির থেকে পৃথক, যারা ঈশ্বর-উপাসনার চেয়ে গানগুলিতে ব্যক্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে সর্বশক্তিমান অর্থের উপাসনাতেই বেশী অভ্যস্ত। 'এতে আমার কী লাভ?'—এটাই মনে হয় ভগবদ্‌ভক্তির ভিত্তি। তাদের প্রার্থনাতে তারা সব স্বার্থপূর্ণ বস্তুগুলি কামনা করে।

খ্রীষ্টানরা সর্বদা চায় ভগবান তাদের কিছু দিন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে তারা ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হয়। গল্প শোনা যায়, কোন সম্রাটের কাছে এক ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্যে গিয়েছিল। ভিক্ষুক যখন অপেক্ষা করছিল, তখন সম্রাটের প্রার্থনার সময়। সম্রাট প্রার্থনা করলেন, 'হে ঈশ্বর, আমাকে আরও সম্পদ দাও, আরও শক্তি দাও, আরও বড় সাম্রাজ্য দাও।' ভিক্ষুকটি চলে যাচ্ছিল সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চলে যাচ্ছ কেন?' উত্তর হলো, 'আমি ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চাই না।'

অনেকের পক্ষে বলা কষ্টকর হয় কী তীব্র আধ্যাত্মিক উন্মাদনা মহম্মদের হৃদয় আলোড়িত করেছিল। তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি দিতেন এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। এমনি তীব্র হৃদয়াবেগ-অনুভব-করা শুদ্ধ পুরুষদের লোকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলেছে। অহংচিন্তার অভাবই হচ্ছে ভগবৎ প্রেমের প্রধান লক্ষণ। বর্তমানে ধর্ম এক রকম শখ বা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে গির্জায় যায় গড্ডলিকা প্রবাহের মতো। ঈশ্বরকে তাদের প্রয়োজন আছে বলে বরণ করে নেয় না। যারা নিজেদের খুব বিশ্বাসী ভক্ত ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে, তাদের অধিকাংশ লোকই নিজের অজান্তে নাস্তিক।

ভারত

(১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪, বৃহস্পতিবার, ডেট্রয়টে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার ডেট্রয়ট ফ্রি প্রেসের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ বিবরণ)

গত রাত্রে ইউনিটারিয়ান চার্চ-ভরা শ্রোতাদের সামনে বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দেশের প্রথা ও আচরণ সম্পর্কে এক ভাষণ দান করেন। তাঁর বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহার শ্রোতাদের আনন্দিত করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা তাঁর বক্তৃতা শোনে, মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানায়। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতার চেয়ে তাঁর এই বক্তৃতার ধরন ছিল আরও বেশি জনপ্রিয়। ভাষণটি খুবই আগ্রহ-সঞ্চারী হয়েছিল, বিশেষ করে বক্তা যেখানে উপদেশমূলক প্রসঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর স্বদেশবাসীদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অবস্থার নিপুণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে (এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক) এই পূর্বদেশীয় ভ্রাতা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী এবং প্রকৃতির মহৎ নৈতিক নিয়মের বিবেকসম্মত কর্তব্যের কথা যখন তিনি বলছিলেন, তখন তাঁর কোমল নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর—যা তাঁর জাতির বৈশিষ্ট্য—এবং তাঁর রোমাঞ্চকর ভঙ্গি অনেকটা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মতো। শ্রোতাদের কাছে কোন নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় ছাড়া তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায় আর ওই নৈতিক সত্য উপস্থাপনার সময় তাঁর বাগ্মিতা হয় একবারে সর্বোচ্চ শ্রেণীর।

এটা কিছুটা অদ্ভুত মনে হলো যে এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী যিনি ভারতে খ্রীস্টান চার্চের পক্ষে মিশনারী-কার্য অপছন্দ করার কথা গোপন করেন না, (তাঁর দৃঢ় ধারণা সেখানে নৈতিকতার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু)—তাঁর পরিচিতি দিলেন বিশপ নিণ্ডে, যিনি জুন মাসে চীন যাচ্ছেন বৈদেশিক খ্রীস্টান মিশনের স্বার্থে। বিশপ আশা করেন ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি বিদেশে থাকবেন, যদি আরও বেশি দিন থাকেন তাহলে নিশ্চয় ভারতে যাবেন। বিশপ ভারতের আশ্চর্য বস্তুসমুদয় সম্পর্কে ও সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধির কথা উল্লেখ করে সানন্দে বিবেকানন্দের পরিচয় প্রদান করলেন। যখন পাগড়ি মাথায় উজ্জ্বল আলখাল্লা পরা ও বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দর মুখের সেই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলের সামনে উপস্থিত হলো এক মনোমুগ্ধকর মূর্তি। বিশপের বাক্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর স্বদেশের

জাতিভেদ, অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

মূলতঃ উত্তর-ভারতে চারটি ভাষা ও দক্ষিণ-ভারতে চারটি, কিন্তু উভয় স্থানেই একটি সাধারণ ধর্ম। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হিন্দু, এবং এই হিন্দু জাতিটি একটু অদ্ভুত। হিন্দু সব কথাই ধর্মীয় রীতি অনুসারে করে। ধর্মীয় ভাবে সে আহার করে, শয়ন করে, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে, ধর্মীয় রীতি অনুসারেই সে সৎকার্য করে এবং অসৎ কার্যও ধর্মীয় রীতি অনুসারে করে। এই প্রসঙ্গে বক্তা তাঁর ভাষণে শ্রেষ্ঠ নৈতিক কথাটির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস সকল স্বার্থশূন্য কাজেই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। সারা সন্ধ্যা এই কথাটির উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং এটিকেই ভাষণের মূল কথা বলা চলে। হিন্দুর মতে নিজের জন্যে গৃহ নির্মাণ স্বার্থপরতা, সেইজন্য সে গৃহ নির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনা ও অতিথি সেবার জন্য। নিজের জন্য খাদ্য রন্ধন স্বার্থপরতা, তাই সে দরিদ্রসেবার জন্য রন্ধন করে ; যদি কোন ক্ষুধার্ত আগন্তুক আসে তবে তাকে আগে দিয়ে শেষে সে নিজে গ্রহণ করে এবং এই ভাবটি দেশের সর্বত্র প্রচলিত। যে কেউ খাদ্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করুক, সব গৃহের দরজা তার জন্য খোলা।

জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকের বৃত্তি বংশগত। ছুতোর-মিস্ত্রি জন্ম থেকেই ছুতোর-মিস্ত্রি, স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর ও পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। কিন্তু এটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সামাজিক কুপ্রথা, কারণ এটি প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাত্র। কালের এই পরিমাপ ভারতে খুব দীর্ঘ বলে মনে করা হয় না, যেমন এদেশে ও অন্যান্য সব দেশে মনে করা হয়।

দু রকমের দান বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়—শিক্ষাদান ও প্রাণদান। শিক্ষাদানই অগ্রাধিকার লাভ করে। একজন অন্যের জীবন রক্ষা করল, সেটা খুব ভাল ; তার চেয়েও ভাল তাকে শিক্ষাদান করা। অর্থের বদলে শিক্ষাদান মন্দ কাজ, যে লোক ব্যবস্থা সামগ্রীর মত জ্ঞানের বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করে তার উপর ধিক্কার বর্ষিত হয়। সরকার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাহায্য করে থাকে। সেজন্য নৈতিক ফলাফল তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে যে পরিবেশ বজায় আছে তার চেয়ে ভাল হয়েছে।

বক্তা বহু দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বেড়িয়েছেন—সভ্যতার সংজ্ঞা কি ? কখনও কখনও উত্তর পেয়েছেন,—আমরা যা, তাই হচ্ছে সভ্যতা। তিনি সবিনয়ে জানান যে শব্দটির সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর মত অন্যরকম। কোন জাত হয়তো প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, জনহিতকর সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান করে ফেলতে পারে, তবু একথা তাদের বোধগম্য না হতে পারে যে সভ্যতার সর্বোচ্চ লক্ষণ সেই লোকের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে যে নিজেকে জয় করার শিক্ষালাভ করেছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে এই অবস্থা ভারতে বেশি দেখা যায়, কারণ সেখানে বস্তুগত পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশের অধীন এবং প্রত্যেকেই সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশ খোঁজে এবং প্রকৃতিকেও একইভাবে দেখে। তাই দেখা যায় ভাগ্যের নির্দয় পরিহাসকে অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার মতো ধীর মনোভাব ; এই

অবস্থায় অন্য যে কোন জাতের চেয়ে এখানে বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। তাই এই দেশ ও জাতের মধ্যে এক অফুরন্ত স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে, যা দেশ-বিদেশের বহু চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা তাদের কাঁধ থেকে পার্থিব বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

২৬০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে যে প্রাচীন রাজা আদেশ করেছিলেন, 'আর কোন রক্তপাত বা যুদ্ধ চলবে না' এবং যিনি সৈন্যদলের বদলে একদল শিক্ষক পাঠিয়েছিলেন, তিনি জননীর মতোই কাজ করেছিলেন, যদিও বাস্তব বিষয়ে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু বলপ্রয়োগকারী বর্বর জাতগুলির অধীন হলেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা চিরকাল বজায় আছে এবং কারও সাধ্য নেই তা কেড়ে নেয়। ক্রুদ্ধ ভাগ্যের আঘাত সহ্য করার মতো খ্রীষ্টসুলভ নম্রতা তাদের আছে, সেই সঙ্গে তাদের আত্মা উজ্জ্বলতর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন দেশে 'ভাব প্রচারের' জন্য কোন খ্রীষ্টান মিশনারীর প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতেব ধর্ম মানুষকে ধীর, মধুর, বিবেচক ও মনুষ্য-পশু নির্বিশেষে ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তোলে। বক্তা বলেন, নৈতিকতার দিক থেকে ভারত যুক্তরাষ্ট্র বা পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে উঁচুতে। মিশনারীরা যদি সেখানকার পবিত্র জল পান করতে এবং এক বিশাল সম্প্রদায়ের উপর বহু সাধুমহাত্মার জীবনের কী অপূর্ব প্রভাব পড়েছে তা দেখতে যান, তবেই ভাল করবেন।

তারপর বিবাহের রীতিনীতি ও প্রাচীন কালে যখন সহশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তখন নারীদের যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো তার বর্ণনা করা হয়। ভারতের ঋষিদের লেখায় ঈশ্বরোপলব্ধিকারী গুরুস্থানীয়া নারীর অপূর্ব মূর্তি পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে গুরুস্থানীয় সকলেই পুরুষ, কিন্তু ভারতের সাধিকা নারীরা ধর্মগ্রন্থগুলিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। গৃহস্থদের উপাসনার অঙ্গ পাঁচটি ; তার মধ্যে একটি হচ্ছে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। আর একটি হচ্ছে মূক প্রাণীর সেবা। এই উপাসনাটি আমেরিকানদের পক্ষে বোঝা শক্ত। এই মনোভাব ইউরোপীয়দের পক্ষেও উপলব্ধি করা সহজ নয়। অন্যান্য জাত পাইকারী ভাবে প্রাণী হত্যা করে এবং পরস্পরকেও হত্যা করে, রক্তের সমুদ্রে তারা বাস করে। এক ইউরোপীয় বলেছিল যে ভারতে প্রাণী হত্যা করা হয় না, কারণ মনে করা হয় প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষের আত্মা থাকে। পশুর স্তর থেকে বেশি দূর অগ্রসর না হওয়া বর্বর জাতের পক্ষে এ ধরনের যুক্তি যথাযথ। ব্যাপার হচ্ছে এই ধরণের উক্তি ভারতে এক শ্রেণীর নাস্তিক করেছিল, এই ভাবে তারা বেদের অহিংসা ও পুনর্জন্মবাদের দোষ প্রদর্শন করে থাকে। এ রকম ধর্মীয় মতবাদ কোনকালে ছিল না, এটা জড়বাদী ধারণা। বক্তা প্রাঞ্জলভাবে মূক প্রাণীর উপাসনার চিত্র তুলে ধরেন।

ভারতের সুন্দর বিধি—অতিথিসেবার ভাব—তিনি এক গল্পের মাধ্যমে চিত্রিত করেন। দুর্ভিক্ষের জন্য এক ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ কিছুকাল অনাহারে থাকেন। গৃহকর্তা খাদ্যের সন্ধানে বাইরে গিয়ে সামান্য পরিমাণ ছাতু সংগ্রহ করলেন। বাড়িতে এসে তিনি তা চার ভাগে ভাগ করেন, ছোট পরিবারটি যখন আহার করতে যাবে তখন দরজায় করাঘাত শোনা গেল। এক অতিথি এল।

ভাগগুলি অতিথির সামনে ধরে দেওয়া হলো এবং সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে চলে গেল। এদিকে অতিথিপরায়ণ চারজনের মৃত্যু হলো। আতিথেয়তার পবিত্র নামে ভারতে যা আশা করা যায়, এই গল্পটি তারই উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে।

বক্তা তাঁর ভাষণ সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে শেষ করেন। তাঁর বক্তব্য বরাবর সহজ ছিল, যখনই তিনি কোন চিত্র বর্ণনায় রত হচ্ছিলেন তখনই তা সুখকর কাব্যের মত শোনাচ্ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা প্রকৃতির সৌন্দর্য গভীর ও নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর প্রভূত আধ্যাত্মিক গুণ শ্রোতারা অনুভব করতে পেরেছিলেন, কারণ তা চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসা-রূপে এবং সমন্বয় ও কল্যাণকর মনোভাবের ঐশী বিধানের বিচিত্র কার্যকলাপের গভীরে প্রবেশ করার প্রখর অন্তর্দৃষ্টিরূপে স্বতঃ প্রকাশিত।

হিন্দু ও খ্রীষ্টান

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪, ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা ও ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস সংবাদপত্রে প্রকাশিত)

বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে হিন্দু দর্শনের প্রবণতা হচ্ছে ধ্বংস করা নয়, বরং সর্ববিষয়ে সমন্বয় করা। যদি ভারতে কোন নতুন ভাব আসে, আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তা গ্রহণ করার চেষ্টা করি, তার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করি, কারণ আমাদের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। ঈশ্বরের এই অবতাব প্রথম প্রচার করে গেছেন, 'আমি ঈশ্বরের অবতার, আমি সকল গ্রন্থের প্রেরণাদাতা, আমিই সকল ধর্মের উৎস।' তাই আমরা কোন কিছু বর্জন করি না।

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে খুবই প্রভেদ, যা আমাদের কখনও শেখানো হয়নি। সেটা হচ্ছে যীশুর রক্তের মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভের ধারণা কিংবা একজনের রক্তের দ্বাবা নিজের শুদ্ধি। ইহুদীদের মতো বলিদান প্রথা আমাদেরও আছে। আমাদের বলিদানের সহজ অর্থ হচ্ছে এই—আমি কিছু খেতে যাচ্ছি এবং তার অংশ ঈশ্বরকে আগে নিবেদন না করাটা খারাপ, তাই তামি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি। সহজ-সংক্ষেপে ভাবটি হচ্ছে এই। কিন্তু ইহুদীদের ধারণা হচ্ছে যে উৎসর্গীকৃত ভেড়াটির উপর তার পাপ বর্তাবে এবং ভেড়াটিকে বলি দিয়ে সে পাপমুক্ত হবে। এই 'সুন্দর ভাবটি' আমাদের দেশে বিকশিত হয়নি এবং সেজন্যে আমি আনন্দিত। আমি কখনও এই ধরনের বিশ্বাস দ্বারা পাপ থেকে পরিত্রাণ চাই না। যদি কেউ আমাকে এসে বলে, 'আমার রক্তের বদলে মুক্ত হও', আমি তাকে বলব, 'ভাই, বিদায় হও; আমি বরং নরকে যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে একজন নিরপরাধ লোকের রক্ত নিয়ে স্বর্গে যাব। আমি নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত।' ওই ধরনের বিশ্বাস আমাদের মধ্যে কখনও জাগেনি। আমাদের দেশের অবতার বলেছেন যে, যখনই পৃথিবীতে অসদ্ভাব ও দুর্নীতি প্রবল হবে, তখনই তিনি আসবেন তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে তাই করছেন।

পৃথিবীর যেখানেই দেখবে কোন অসাধারণ সাধুপুরুষ মানবসমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন, জেনো—তাঁর মধ্যে ভগবানই রয়েছেন।

তাই বুঝতে পারছ কী কারণে আমরা কোন ধর্মের বিরোধিতা করি না। আমরা বলি না যে আমাদের ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। প্রত্যেকেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তার প্রমাণ কি? আমরা দেখি প্রত্যেক দেশেই পবিত্র সাধুপুরুষ আছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন বা না করুন—সর্বত্রই সৎ নরনারী দেখা যায়। অতএব বলা যায় না আমার ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। 'বহু নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে এসে মেশে, তেমনি সব বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়ে তোমারই কাছে আসে'—এটি ভারতের শিশুদের প্রতিদিনের প্রার্থনার একটি অংশ। প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনার সঙ্গে ধর্মের পার্থক্যের জন্য বিবাদের চিন্তা একেবারেই অসম্ভব। এ তো হল ভারতের দার্শনিকদের কথা। এইসব ব্যক্তিদের উপর আমাদের খুবই শ্রদ্ধা আছে, বিশেষ করে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উপর, তার কারণ বিস্ময়কর উদারতার দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।

মূর্তির সামনে যে মানুষটি প্রণাম করছে, ওর আচরণ কিন্তু ব্যাবিলন বা রোমে তোমরা যে পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ সেরকম নয়। এটা হচ্ছে হিন্দুর এক বিশেষত্ব। মানুষটি মূর্তির সামনে চোখ বুঁজে ভাবতে চেষ্টা করে, 'আমিই তিনি (সোহং), আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার পিতা নেই, মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; সোহং, সোহং! আমি বইয়ের বাঁধনে বাঁধা নই, কোন তীর্থের বা কোন কিছুর বন্ধন আমার নেই। আমি সৎস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, সোহং, সোহং।' এই কথার পুনারাবৃত্তি করে সে বলে, 'হে প্রভু, আমার মধ্যে তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, আমি বড় হতভাগ্য।'

পুঁথিগত বিদ্যার উপর ধর্ম নির্ভরশীল নয়। ধর্মই আত্মা, ধর্মই ঈশ্বর। পুঁথিগত বিদ্যা বা বাগ্মিতার দ্বারা ধর্মলাভ হয় না। সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তিকে বলো আমাকে আত্মারূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না। আত্মার সম্বন্ধে তুমি একটা কল্পনা করতে পার, তিনিও পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া আত্মার চিন্তা অসম্ভব। ঈশ্বর-তত্ত্ব যতই শোন না কেন—তুমি একজন বড় দার্শনিক, খুব বড় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ হতে পার—তবু একটি হিন্দু বালক বলবে, 'ওর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই।' আত্মাকে আত্মার স্বরূপে চিন্তা করতে পার? তাহলেই সব সংশয় শেষ হয়ে যাবে, হৃদয়ের সব বাঁকা ভাব সোজা হয়ে যাবে। একমাত্র তখনই সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দেহ চিরতরে দূর হয়ে যায় যখন মানুষ (জীবাত্মা) ঈশ্বরের (পরমাত্মার) মুখোমুখি হয়।

পাশ্চাত্যের বিচারে কেউ অদ্ভুত বিদ্বান হতে পারেন, তবু তিনি হয়তো ধর্ম সম্বন্ধে 'অ আ ক খ' না জানতে পারেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, 'আপনি আত্মাকে আত্মা বলে ভাবতে পারেন? আপনি কি আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানে পারদর্শী? আপনি নিজের আত্মাকে জড়ের উপরে প্রকাশিত করেছেন?' যদি তা না করে থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে বলব, 'আপনার ধর্ম লাভ হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু এই আর গর্ব।'

আর ওই বেচারা মূর্তির সামনে বসে তাদাত্ম্য চিন্তা করার চেষ্টা করে এবং

তারপর বলে, 'হে প্রভু, আমি আত্মস্বরূপে তোমায় ধারণা করতে পারলাম না, তাই এই আকারেই তোমায় ধারণা করতে দাও' এবং তারপর সে চোখ খুলে এই মূর্তি প্রত্যক্ষ করে, প্রণাম করে বারবার প্রার্থনা করে। যখন প্রার্থনা শেষ হয়, তখন সে বলে, 'হে প্রভু, তোমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্য আমায় ক্ষমা কর।'

তোমাদের সব সময় বলা হয়েছে যে হিন্দুরা প্রস্তরখণ্ডের পূজা করে। তাদের অন্তরের ব্যাকুল ভাব সম্বন্ধে এখন তোমরা কী ভাব? আমি প্রথম সন্ন্যাসী যে পাশ্চাত্য দেশে এসেছে—পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সন্ন্যাসী যে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু আমরা শুনি তোমাদের ওই সব সমালোচনা, শুনি ওই সব কথা। আমার দেশের লোকের তোমাদের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 'ওরা শিশু; পদার্থ-বিজ্ঞানে ওরা বড় হতে পারে, ওরা বড় বড় জিনিস তৈরি করতে পারে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ওরা একেবারে শিশু।' এই হচ্ছে আমার দেশের লোকের ধারণা।

একটা বিষয় তোমাদের বলব, আর আমি কোন নির্দয় সমালোচনা করছি না। তোমরা কয়েকজনকে শিক্ষিত কর, খেতে-পরতে দাও ও মাইনে দাও কী করার জন্য? আমার দেশে গিয়ে আমার সব পূর্বপুরুষকে, আমার ধর্ম ও সব কিছুকে গাল দেবার জন্য। তারা মন্দিরের কাছে গিয়ে বলে, 'তোমরা পৌত্তলিক, তোমরা নরকে যাবে।' কিন্তু তারা ভারতের মুসলমানদের অমনি করতে সাহস করে না—তাহলে তলোয়ার বেরিয়ে আসবে। হিন্দু বড় নরম, সে হেসে চলে যাবার সময় বলে, 'মূর্খেরা বকে যাক।' এই হলো ভাবটা। এদিকে তোমরা, যারা গালাগাল ও সমালোচনা করার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করো, তারা আমার সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সামান্যতম সমালোচনার ছোঁওয়া লাগলে আঁতকে উঠে চিৎকার কর, 'আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা আমেরিকান। আমরা দুনিয়াশুদ্ধ লোকের সমালোচনা করব, তাদের গাল দেব, শাপ দেব, যা ইচ্ছে বলব। কিন্তু আমাদের ছুঁয়ো না; আমরা স্পর্শকাতর লজ্জাবতী লতা।' তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার, সেই সঙ্গে আমিও বলে রাখছি যে আমরা যেমন আছি তাতেই সন্তুষ্ট আছি এবং এক বিষয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে ভাল আছি, আমরা কখনও আমাদের ছেলেদের এই ভয়ংকর তথ্য গিলতে শেখাই না—'যেখানে সব কিছুই আনন্দকর, শুধু মানুষই খারাপ।'

যখনই তোমাদের ধর্মপ্রচারকরা আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন এইটি মনে রাখে—যদি সমস্ত ভারতবাসী দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভারত মহাসাগরের তলায় যত কাদা তা সব পাশ্চাত্য দেশবাসীর প্রতি ছুঁড়ে মারে, তাহলেও তোমরা আমাদের প্রতি যা করছ তার কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্য? আমরা কি কোনদিন পৃথিবীর কারুকে ধর্মান্তরিত করার জন্য একটি প্রচারকও পাঠিয়েছি? আমরা তোমাদের বলি, 'তোমার ধর্মকে স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু আমাকে আমারটা নিয়ে থাকতে দাও।' তোমরা বল, তোমাদের ধর্ম সম্প্রসারণশীল। তোমরাই হচ্ছ সম্প্রসারণশীল, কিন্তু কতজনকে তোমাদের মতে নিতে পেরেছ? পৃথিবীর প্রতি ষষ্ঠজন হচ্ছে একজন চীনা, তারা বৌদ্ধ; তারপর আছে জাপান, তিব্বত, রাশিয়া, সাইবেরিয়া, বর্মা ও শ্যাম। শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু এই যে খ্রীষ্ট নীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ, সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। ভাল কথা, কী ভাবে এটা

হয়েছিল ? এক ফোঁটা রক্তপাত না করে ! তোমাদের সব অহংকার আর বড় বড় কথা সত্ত্বেও কোথায় তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম তলোয়ার ছাড়া সফল হয়েছে ? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা আমায় দেখাও ! একটি, খ্রীষ্টধর্মের সারা ইতিহাস খুঁজে একটি দেখাও ; আমি দুটি চাই না। আমি জানি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কী ভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের ছিল হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু ; এই তো ! তোমাদের সব গর্ব সত্ত্বেও মুসলমানদের চেয়ে তোমরা কী ভাল করতে পার ? 'আমরাই একমাত্র !' কেন ? 'কারণ আমরা অপরকে হত্যা করতে পারি।' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ওই বড়াই করেছিল। কিন্তু আজ তারা কোথায় ? এখনও তারা বেদুইন। রোমানরা ওই কথা বলত, কোথায় এখন তারা ? 'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য ; তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।' আর ওই সব অহংকার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ; এ যে বালির ওপর গড়া, বেশিক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে না।

স্বার্থপরতার উপর যার ভিত্তি, প্রতিযোগিতা যার সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস হবেই। এসব জিনিস অবশ্যই মরবে। ভাইসব, আমার কথা শোন—যদি বাঁচতে চাও, যদি সত্যি চাও তোমাদের জাত বেঁচে থাকুক, তবে খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা খ্রীষ্টান নও। না, জাত হিসাবে তোমরা তা নও। খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাও। তাঁর কাছে ফিরে যাও, যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গা কোনখানে ছিল না। 'পাখিদের বাসা আছে, পশুদের গর্ত আছে, কিন্তু মানব-পুত্রের মাথা গোঁজার কোন জায়গা ছিল না।' তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা ! যদি বাঁচতে চাও এটি বদলে ফেল, উল্টে দাও ! এ দেশে যা শুনেছি সব কপটতা। যদি এ জাত বাঁচতে চায়, তবে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বর ও ধনদেবতা ম্যামনের সেবা তুমি একসঙ্গে করতে পার না। এই সব সম্পদ, এই সব খ্রীষ্ট থেকে ! খ্রীষ্ট এ সব অশাস্ত্রীয় কথা অস্বীকার করতেন। ম্যামনের কাছ থেকে যে সম্পদ আসে তা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত নিত্যতা আছে ঈশ্বরে। যদি এ দুটিকে মেলাতে পার—এই বিস্ময়কর সম্পদের সঙ্গে খ্রীষ্টের আদর্শকে—তাহলে ভালই। কিন্তু যদি না পার তবে এসব ছেড়ে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়াই ভাল। খ্রীষ্টবিহীন প্রাসাদে বাস করার চেয়ে ছেঁড়া কম্বল গায়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে বাস করার জন্যে প্রস্তুত হলে ভাল করবে।

ভারতের খ্রীষ্টধর্ম

(১১ই মার্চ, ১৮৯৪, ডেট্রয়েটে প্রদত্ত ভাষণ এবং দি ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস-এ প্রকাশিত)

"বিবেকানন্দ গত রাত্রে জনসমাকীর্ণ ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে বক্তৃতা করেন। তাঁকে খুব আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল এবং তিনি অপূর্ব বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি আড়াই ঘণ্টা ধরে বলেন।

মাননীয় টি. ডব্লু. পামার বিশিষ্ট আগন্তুককে পরিচিত করাতে গিয়ে উল্লেখ করেন সেই ঢালের গল্প, যার একদিক রূপার ও অন্যদিক তামার এবং যার ফলে বিতর্কের

সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা যদি কোন বিষয়ের দুদিকটাই দেখি তাহলে তর্কাতর্কি কমে যায়। সব মানুষের ঐকমত্য সম্ভব। ধার্মিকদের কাছে বিদেশে ধর্মপ্রচার কার্যের বিষয়টি প্রিয়। মিঃ পামার বলেন, খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দ আলোকপ্রাপ্ত নন। ঢালের তামার দিকটা সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকের মুখ থেকে শোনাটা সুখকর হবে।

বিবেকানন্দ প্রচুর করতালি-ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হলেন।"

বিবেকানন্দ বলেন:

জাপান ও চীনে মিশনারীদের কাজ সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপারটা আমার ভালভাবেই জানা আছে। এদেশের লোকেরা মনে করে ভারতবর্ষ একটা বিরাট পতিত জমি। সেখানে আছে অনেক জঙ্গল আর কয়েকটি সভ্য ইংরাজ। ভারতবর্ষ আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক এবং সেখানে ত্রিশ কোটি লোক আছে। সে দেশ সম্বন্ধে অনেক গল্প বলা হয় এবং সেগুলি অস্বীকার করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভারতের প্রথম বিজেতা আর্যরা ভারতের অধিবাসীদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেনি, যেমন খ্রীষ্টানরা কোন নতুন দেশে গিয়ে করে; তাদের প্রচেষ্টা ছিল পশু-প্রকৃতির মানুষদের উন্নত করা। স্পেনীয়রা সিংহলে এসেছিল খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে। তারা ভেবেছিল যে পৌত্তলিকদের হত্যা করে মন্দিরগুলি ভেঙে ফেলার জন্য ঈশ্বর তাদের আদেশ করেছেন। বৌদ্ধদের কাছে তাদের ধর্মগুরুর এক ফুট লম্বা একটি দাঁত ছিল, স্পেনীয়রা সেটি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কয়েক হাজার লোককে মেরে ফেলে এবং মাত্র কয়েক কুড়ি লোককে ধর্মান্তরিত করে। পশ্চিম ভারতে পর্তুগিজরা এসেছিল। হিন্দুরা ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাসী এবং তাদের সেই পবিত্র বিশ্বাসের উদ্দেশে একটি মন্দির গড়েছিল। আক্রমণকারীরা মন্দিরটি দেখে বলল, 'এ শয়তানের সৃষ্টি।' তাই তারা কামান এনে দাগল এই অপূর্ব কীর্তির উপর এবং এক অংশ ধ্বংস করে দিল। ক্রুদ্ধ জনতা আক্রমণকারীদের দেশ থেকে হটিয়ে দিল। প্রথম দিকে মিশনারীরা দেশ অধিকার করার চেষ্টা করেছে এবং বলপ্রয়োগে তাদের ঘাঁটি গড়ার চেষ্টায় বহু লোককে হত্যা করেছে এবং কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করেছে। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কিছু লোক খ্রীষ্টান হয়েছিল। ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন পর্তুগিজদের তরবারির ভয়ে বাধ্য হয়েছে ধর্মান্তর গ্রহণে এবং তারা বলেছিল, "আমরা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েছি নিজেদের খ্রীষ্টান বলতে।' কিন্তু ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম শীঘ্রই আবার দেখা দিল।

সুযোগের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের একাংশ অধিকার করেছিল। তারা মিশনারীদের দূরে রেখেছিল। হিন্দুরাই প্রথমে মিশনারীদের স্বাগত জানায়, ব্যবসায় ব্যস্ত ইংরাজরা নয়। পরবর্তী কালের প্রথম মিশনারীদের কয়েকজনের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। তাঁরা ছিলেন প্রকৃতই যীশুর সেবক, তাঁরা লোকের নিন্দা করেননি বা তাদের সম্বন্ধে জঘন্য মিথ্যা রটনা করেননি। তাঁরা ছিলেন ভদ্র, সহৃদয়। যখন ইংরাজরা ভারতের প্রভু হলো, তখন মিশনারীদের উদ্যম নিস্তেজ হতে শুরু হলো। আজকের ভারতে মিশনারীদের প্রচেষ্টার এই অবস্থাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। প্রথম যুগের মিশনারী ডাঃ লং জনগণের পাশে

দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতে নীলকররা যে অন্যায় করে চলেছিল তারই বর্ণনাকারী এক নাটক তিনি অনুবাদ করেছিলেন এবং তার ফল কী হয়েছিল? ইংরাজরা তাঁকে জেলে দিয়েছিল। এই ধরনের মিশনারীরা দেশের মঙ্গল করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা আর নেই। সুয়েজ খাল বহু অমঙ্গলের পথ খুলে দিয়েছে।

এখন বিবাহিত মিশনারী যায়, বিবাহিত বলে তার কাজ ব্যাহত হয়। মিশনারী জনসাধারণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাই সে গিয়ে বাস করে শ্বেতাঙ্গদের ছোট কলোনীতে। সে এই করতে বাধ্য হয় বিবাহিত বলেই। বিবাহিত না হলে সে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে থাকত এবং প্রয়োজন হলে মাটিতে শুত। তাই সে ভারতে গিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সঙ্গী খোঁজে, ইংরাজি ভাষী লোকদের মধ্যে থাকে। বর্তমানে ভারতের মহান হৃদয়কে মিশনারীদের প্রচেষ্টা একেবারেই স্পর্শ করতে পারে না। বেশির ভাগ মিশনারীই অনুপযুক্ত। আমি একজনও মিশনারী দেখিনি যে সংস্কৃত বোঝে। দেশের মানুষ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি কেমন করে তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে? আমি দোষ দিতে চাই না, তবে খ্রীষ্টানরা এমন লোকদের মিশনারীরূপে পাঠায়, যারা যোগ্য ব্যক্তি নয়। এটা দুঃখের বিষয় যে ধর্মান্তরকরণের জন্য টাকা ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত সন্তোষজনক ফল কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

অল্প কয়েকজন যারা ধর্মান্তরিত হয়, তারা মিশনারীদের চারদিকে ঘুরেই তাদের জীবিকা অর্জন করে। যে ধর্মান্তরিতদের ভারতে চাকরিতে বহাল করা হয় না, তারা আর ধর্মান্তরিত থাকে না। সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে হলো এই। ধর্মান্তরকরণের ধরনটাও একেবারে অদ্ভুত। মিশনারীদের আনীত অর্থ তারা গ্রহণ করে। শিক্ষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি ভালই, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। হিন্দুরা চালাক, তারা টোপ খায় কিন্তু বঁড়শি গেলে না! লোকেরা যে কত সহনশীল তা বিস্ময়কর। একদা এক মিশনারী বলেছিল, 'গোটা ব্যাপারটার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে ওইটি। আত্মসন্তুষ্ট লোকদের কখনও ধর্মান্তরিত করা সম্ভব নয়।'

মহিলা মিশনারীরা কয়েকটি নির্দিষ্ট বাড়িতে গিয়ে বাইবেল সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেন ও কী করে বুনতে হয় দেখিয়ে দেন এবং মাসে চার শিলিং করে পান। ভারতের মেয়েরা কখনও ধর্মান্তরিত হবে না। স্বদেশে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ মিশনারীদের অন্য দেশে ঠেলে দিচ্ছে। যখন আমি এদেশে আসি, তখন বহু উদারপ্রকৃতির পুরুষ ও নারীকে দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু ধর্মমহাসভার পর একটি বড় প্রেসবিটেরিয়ান সংবাদপত্র এক আক্রমণাত্মক রচনা দ্বারা আমায় সাহায্য করেছিল। সম্পাদক সেটিকে বলেছিলেন, 'উৎসাহ।' মিশনারীরা জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করে না বা করতে পারে না—তারা মোটেই উদার নয়—সেইজন্য ধর্মান্তরকরণের দ্বারা তারা কিছুই লাভ করতে পারে না, যদিও নিজেদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশায় তাদের সময় বেশ ভালই কাটে। ভারতবর্ষের প্রয়োজন খ্রীষ্টের কাছ থেকে সাহায্য, খ্রীষ্টবিরোধীর কাছ থেকে নয়। এই মানুষগুলি খ্রীষ্টের মতো নয়। তারা খ্রীষ্টের মতো আচরণ করে না; তারা বিবাহিত, আরামে বসবাস করার জন্য তারা আসে এবং তাদেরই

জীবিকার্জন করে। খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যেরা ভারতে এলে প্রভূত মঙ্গল করতেন, যেমন বহু হিন্দু সাধক করেন ; কিন্তু এই সব মিশনারীদের সেই চারিত্রিক পবিত্রতা নেই। খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টকে হিন্দুরা সানন্দে স্বাগত জানাবে, কারণ তাঁর জীবন ছিল পবিত্র ও সুন্দর ; কিন্তু তারা অজ্ঞ, ভণ্ড, আত্মপ্রবঞ্চক ব্যক্তিদের অনুদার উক্তিগুলি গ্রহণ করতে পারে না এবং করবেও না।

মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা না থাকলে জগতের মানবিকতার অধঃপতন হতো। পৃথক পৃথক ধর্ম না থাকলে কোন ধর্মই টিঁকে থাকত না। খ্রীষ্টানের প্রয়োজন তার ধর্মের, হিন্দুরও প্রয়োজন নিজের ধর্মের। ধর্মগুলি একটি অপরের বিরুদ্ধে বহু কাল ধরে লড়াই করেছে। যে সকল ধর্ম গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি বেঁচে আছে। খ্রীষ্টানরা ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করতে পারল না কেন? পার্সীদের খ্রীষ্টান করতে পারল না কেন? মুসলমানদের তারা ধর্মান্তরিত করতে পারল না কেন? চীন ও জাপানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করা যায়নি কেন? প্রথম প্রচারশীল ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, তাতে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা যে কোন ধর্মের চেয়ে দ্বিগুণ এবং তারা এর জন্য তরবারি ব্যবহার করেনি। মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি হিংসার পথ ব্যবহার করেছে। তিনটি বড় প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। এক সময় মুসলমানদেরও দিন ছিল। প্রতিদিনই তোমরা পড় খ্রীষ্টান জাত রক্তপাতের দ্বারা দেশ অধিকার করছে। কোন্ মিশনারী এর বিরুদ্ধে প্রচার করেছে? অত্যন্ত রক্তপিপাসু জাতগুলি কেন তথাকথিত খ্রীষ্টধর্মকে গৌরবান্বিত করবে, যা খ্রীষ্টের ধর্ম নয়? ইহুদি ও আরবরা ছিল খ্রীষ্টধর্মের জন্মদাতা এবং তারা খ্রীষ্টানদের দ্বারা কি ভাবেই না নির্যাতিত হয়েছে! ভারতে খ্রীষ্টানদের মেপে দেখা হয়েছে এবং ওজনে কম পড়েছে। আমি কড়া কথা বলতে চাই না, কিন্তু খ্রীষ্টানদের দেখাতে চাই অন্যেরা তাদের কী চোখে দেখে। যে মিশনারীরা নরকের আগুনের কথা প্রচার করে, সকলে তাদের ভয়ের চোখে দেখে। মুসলমানরা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো তরবারি আস্ফালিত করে ভারতে এসেছে, কিন্তু আজ তারা কোথায়?

সকল ধর্মের শেষ সীমা হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক সত্তার অস্তিত্ব। কোন ধর্মই তার বেশি শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই সার সত্য আছে এবং সেই সম্পদের এক বাহ্যিক আধার আছে। ইহুদীদের গ্রন্থে বা হিন্দুদের গ্রন্থে বিশ্বাস করাটা বাহ্যিক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, আধার বিভিন্ন, কিন্তু মূল সত্য একই থাকে। মূল সত্য একই হওয়ার ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেটাই ধরে থাকেন। যদি একজন খ্রীষ্টানকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, তার ধর্মের সার কি, তার উত্তর হওয়া উচিত, 'প্রভু যীশুর উপদেশ'। বাকি অধিকাংশই বাজে। কিন্তু এই অসার অংশটিও নিরর্থক নয় ; এর দ্বারাই আধার নির্মিত হয়। ঝিনুকের খোলাটি আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু এর ভেতরেই থাকে মুক্তা। হিন্দু কখনও যীশুর জীবনী আক্রমণ করে কিছু বলবে না, যীশুর 'পর্বতের উপর উপদেশ দান' সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু কজন খ্রীষ্টান জানে বা শুনেছে হিন্দু ঋষিদের উপদেশ? তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আগেই তা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত

হয়েছিল। এই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর ধর্মীয় মহান ঐকতান হতে একটি মাত্র যন্ত্র কেন গ্রহণ কর? এই অপূর্ব ঐকতান চলতে দাও। পবিত্র হও। কুসংস্কার ত্যাগ কর এবং প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য কর। কুসংস্কার ধর্মের উপর চেপে বসে। সব ধর্মই ভাল, কারণ সার সত্য হচ্ছে এক। প্রত্যেক মানুষকেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে হবে, এই ব্যক্তি সত্তাগুলিই পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি গড়ে তোলে। এই চমৎকার পরিবেশের অস্তিত্ব এখনই আছে। অপূর্ব সৌধ নির্মাণের জন্য প্রত্যেক মতবাদেরই কিছু না কিছু সংযোজনের আছে।

যীশু খ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য যে হিন্দু দেখতে পায় না, তাকে আমি করুণা করি। হিন্দু খ্রীষ্টকে যে শ্রদ্ধা করে না, সেই খ্রীষ্টানকে আমি করুণা করি। মানুষ যত বেশি নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়, প্রতিবেশীর উপর তার দৃষ্টি তত কম পড়ে। যারা অপরকে ধর্মান্তরিত করে বেড়ায়, যারা অপরের আত্মার পরিত্রাণের জন্য বেশি ব্যস্ত, বহু ক্ষেত্রেই তারা নিজের আত্মাকে ভুলে যায়। এক মহিলা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারতের নারীরা আরও উন্নত নয় কেন? তার কারণের বেশির ভাগটা হচ্ছে বিভিন্ন যুগের বর্বর আক্রমণকারী, আর আংশিক হচ্ছে ভারতবাসী নিজেরাই। তবে এ দেশের বলনাচ ও উপন্যাসভক্ত মেয়েদের চেয়ে আমাদের মেয়েরা বরাবরই ভাল। যে দেশে নিজেদের সভ্যতা সম্বন্ধে এত গর্ব, সে দেশে প্রত্যাশা মতো আধ্যাত্মিকতা কোথায়? আমি তো খুঁজে পাইনি। 'ইহকাল' ও 'পরকাল' কথাগুলি তো শিশুদের ভয় দেখাবার জন্য। 'এখানে'ই তো সব কিছু। ঈশ্বর নিয়ে জীবন যাপন, ঈশ্বরের ভাব নিয়ে বিচরণ এখানে, এই শরীরেই! সকল স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, সকল কুসংস্কার বিসর্জন দিতে হবে। ভারতে এমন মানুষ বাস করে। এ দেশে তেমন মানুষ কোথায়? তোমাদের প্রচারকেরা 'স্বপ্নবিলাসীদের' বিপক্ষে বলে। যদি এখানে আরও কিছু 'স্বপ্নবিলাসী' থাকত, তাহলে এদেশের লোকদের আরও ভাল হতো। যদি কেউ এখানে আক্ষরিক ভাবে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ পালন করে, তাকে ধর্মোন্মাদ বলা হবে। স্বপ্নবিলাস ও উনবিংশ শতাব্দীর বাগাড়ম্বরের মধ্যে অনেক পার্থক্য। মৌমাছি ফুল খুঁজে বেড়ায়। পদ্মকে বিকশিত করে তোলে। সারা জগৎ ঈশ্বরে পরিপূর্ণ, পাপে নয়। আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করি। আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি। বৌদ্ধদের একটি সুন্দর প্রার্থনা হচ্ছে—আমি সকল সাধুকে প্রণাম জানাই, আমি সকল মহাপুরুষকে প্রণাম জানাই, জগতের সকল পবিত্র নরনারীকে প্রণাম জানাই!

প্রেমের ধর্ম

(১৬ই নভেম্বর, ১৮৯৫, লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতার নোট)

উপলব্ধির গভীরে পৌঁছাবার জন্য প্রথমে প্রতীক ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে যাবার প্রয়োজন মানুষের আছে, তাই ভারতবর্ষে আমরা বলে থাকি, 'কোন চার্চে জন্মানো ভাল, কিন্তু সেখানে মরা ভাল নয়।' চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য নিশ্চয়ই বেড় দিতে হবে, কিন্তু সেটা যখন বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন বেড়াটাই বাধা হয়ে উঠবে।

সেজন্য প্রাচীন পদ্ধতিগুলির সমালোচনা ও নিন্দা করার কোন প্রয়োজনে নেই। আমরা ভুলে যাই যে ধর্মে ক্রমবর্ধমানতা থাকবে।

প্রথমে আমরা সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা করি এবং তাঁকে বলি স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। কিন্তু যখন প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন ঈশ্বর শুধু প্রেমস্বরূপ হয়ে যান। প্রেমিক-ভক্ত ঈশ্বর যে কী তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ সে তাঁর কাছে কিছু চায় না। এক ভারতীয় সাধু বলতেন, 'আমি তো ভিখারী নই।' সে ভয়ও করত না। ভগবানকে মানুষের মতোই ভালবাসত।

প্রেমের উপর ভিত্তি করা কয়েকটি সাধনপ্রণালীর কথা এখানে বলা হচ্ছে। (১) শান্ত—সাধারণ শান্তিপূর্ণ প্রেম, পিতৃত্ব ও সাহায্য প্রার্থনার ভাবসহ, (২) দাস্য--সেবার আদর্শ; ঈশ্বর যেন প্রভু বা সেনানায়ক বা সম্রাট, দণ্ড ও পুরস্কারদাতা; (৩) বাৎসল্য—ঈশ্বর যেন মাতা বা সন্তান। ভারতবর্ষে মা কখনও শাস্তি দেন না। এর প্রত্যেকটি অবস্থায় উপাসক ঈশ্বরের একটি আদর্শ গ্রহণ করে এবং তাকে অনুসরণ করে। তারপর (৪) সখ্য—ঈশ্বর হন সখা। এখানে কোন ভয় নেই। এখানে সমতা ও অন্তরঙ্গতার ভাবও আছে। অনেক হিন্দু আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে সখা ও খেলার সাথী জ্ঞানে উপাসনা করেন। তারপর আছে (৫) মধুর ভাব—মধুরতম প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম। এই ভাবের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সেন্ট টেরেসা ও ভাবাবিষ্ট সাধকরা। পারসীয়দের মধ্যে পত্নীভাবে এবং হিন্দুদের মধ্যে পতিভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করার রীতি আছে। আমরা স্মরণ করতে পারি মহীয়সী রানী মীরাবাঈয়ের কথা, যিনি প্রচার করতেন পতিরূপী ঈশ্বরই সর্বস্ব। এই মতে অনেকে এমন চরম অবস্থায় পৌঁছেছেন যে তাঁদের কাছে ঈশ্বরকে 'সর্বশক্তিমান' বা 'পিতা' বলা অধর্ম। এইভাবে ভজনার ভাষা প্রেমমূলক। এমন কি কেউ কেউ অবৈধ প্রণয়ের ভাষাও ব্যবহার করে থাকেন। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের কাহিনী এই ভাবের মধ্যে পড়ে। সম্ভবতঃ তোমাদের মনে হতে পারে যে, এইভাবে সাধকের অত্যন্ত অধোগতি হয়। তা হয়ও বটে। তবুও অনেক বড় সাধক এই ভাবের মধ্যে দিয়ে উন্নত হয়েছেন। কোন মানবীয় বিধানই অপব্যবহারের বাইরে নয়। ভিখারী আছে বলে কি তুমি কিছুই রান্না করবে না? চোরের ভয়ে কি তুমি নিঃস্ব হয়ে থাকবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি চুম্বনের একবার মাত্র আস্বাদন আমাকে পাগল করে দিয়েছে।'

এই ভাবের ফল হচ্ছে যে কেউ বেশি দিন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকতে পারে না বা আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতে পারে না। ভারতে ধর্ম শেষ হয় মুক্তির মধ্যে। কিন্তু এই মুক্তিও ত্যাগ করতে হয়, তখন শুধু প্রেমের জন্যই প্রেম।

সর্বশেষ আসে নির্বিশেষ প্রেম, আত্মা। এক পার্সী কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, এক প্রেমিক কেমন করে তার প্রেমিকার দরজায় আঘাত করেছিল। প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?' সে উত্তর দিল, 'আমি অমুক, তোমার প্রেমিক।' প্রেমিকা শুধু বলল, 'চলে যাও। আমি অমন কাউকে চিনি না।' এভাবে চতুর্থবার প্রেমিকা প্রশ্ন করার পর প্রেমিক বলে উঠল, 'ও আমার প্রিয়া, আমি তো তুমিই তাই আমায় দরজা খুলে দাও।' এবং দরজা খুলে গেল।

এক মহান সাধক নারীর ভাষায় প্রেমের বর্ণনা করে বলেছেন: 'চার চোখের মিলন

হলো। দুটি আত্মার পরিবর্তন হলো। এখন আমি বলতে পারি না তিনি পুরুষ আর আমি নারী, কিংবা তিনি নারী আর আমি পুরুষ। শুধু এইটুকুই মনে আছে—দুটি আত্মা ছিল, প্রেম এল, দুজনে এক হয়ে গেলাম।'

সর্বোচ্চ প্রেমে শুধু আত্মারই মিলন। অন্য যত রকমের প্রেম সবই দ্রুত মিলিয়ে যায়। শুধু আত্মিক প্রেমই স্থায়ী হয় এবং ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

প্রেম দেখে আদর্শকে। এটি ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ। ঈশ্বর হচ্ছেন কারণ, স্রষ্টা, পিতা। প্রেম হচ্ছে শেষ পরিণতি। মা আক্ষেপ করেন যে তাঁর ছেলেটি কুঁজো, কিন্তু যখন কয়েকদিন লালন-পালনের পর মা তাকে ভালবাসেন, তাকেই সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে করেন। প্রেমিক হেলেনের সৌন্দর্য খুঁজে পায় ইথিওপিয়ার ভ্রূতেই। ইথিওপিয়ার ভ্রূ একটি উপলক্ষ্য মাত্র। প্রেমিক দেখে হেলেনকেই। উপলক্ষ্যের উপর তার আদর্শকে প্রক্ষেপ করে সে উপলক্ষ্যকে ঢেকে ফেলে, যেমন শুক্তি বালু-কণাকে মুক্তা করে। ঈশ্বর হচ্ছেন এই আদর্শ, যাঁর মধ্যে দিয়ে মানুষ সব কিছু দেখতে পারে।

সেইজন্য আমরা প্রেমকেই ভালবাসছি। এই প্রেম প্রকাশ করা যায় না। কোন বাক্যই তা উচ্চারণ করতে পারে না। এই বিষয় সম্পর্কে আমরা মৌন।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রেমে অত্যন্ত উন্নত হয়। আমরা নিশ্চয় স্মরণ রাখব মানবীয় প্রেম গুণমিশ্রিত। অন্যের মনোভাবের উপর তা নির্ভরশীলও বটে ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রেমের এই পারস্পরিক নির্ভরতাকে বর্ণনা করার শব্দ আছে। সবচেয়ে নিম্নস্তরের ভালবাসা হচ্ছে স্বার্থযুক্ত; তাতে শুধু ভালবাসা পাবার সুখই আছে। আমরা ভারতবর্ষে বলি, 'একজন গাল পেতে দেয়, অন্যজনে চুম্বন করে।' পারস্পরিক প্রেম এর উর্ধ্বে। কিন্তু এও পারস্পরিকভাবে শেষ হয়। প্রকৃত প্রেম সর্বস্ব ত্যাগে। আমরা একে অন্যকে দেখতে কিংবা আমাদের আবেগকে প্রকাশ করার মতো কিছু করতে চাই না। দেওয়াটাই যথেষ্ট। এভাবে মানুষকে ভালবাসা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ভগবানকে ভালবাসা সম্ভব।

যদি ছেলেরা রাস্তায় মারামারি করতে করতে ঈশ্বরের নামে শপথ করে, তাহলে ভারতবর্ষে তাতে ঈশ্বর-নিন্দা হয় না। আমরা বলি, 'আগুনে হাত দাও এবং তুমি অনুভব কর বা না কর, তোমার হাত পুড়বেই। তেমনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করলে মঙ্গল ছাড়া কিছু হবে না।'

ঈশ্বর-নিন্দার ভাবটি এসেছে ইহুদীদের কাছ থেকে। তারা পারসিকদের আনুগত্যের প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ঈশ্বর বিচারক ও শাস্তিদাতা এই ভাবটি মন্দ নয়, কিন্তু নিম্নস্তরের ও অমার্জিত। ত্রিভুজের তিনটি কোণ হচ্ছে—প্রেম কিছু চায় না, প্রেম ভয় জানে না, প্রেম সর্বদাই আদর্শের জন্যে।

'কেবা পারে বাঁচিতে মুহূর্তের তরে,
মুহূর্তের তরে নিশ্বাসই বা কার পড়ে,
যদি সেই প্রেমময় না থাকিত এ জগৎ জুড়ে?'

আমরা অনেকেই দেখতে পাব যে কর্মের জন্যই আমরা জন্মেছি। ফলাফল আমরা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করব। শুধু ভগবানের ভালবাসার জন্যই কাজ করা হয়েছে।

যদি বিফলতা আসে দুঃখ করার কোন দরকার নেই। শুধু ভগবানের ভালবাসার জন্যই তো কাজ করা হয়েছে।

নারীদের মধ্যে মাতৃভাবটি খুবই বিকশিত। তাঁরা সন্তানরূপে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। তাঁরা কিছু চান না এবং সব কিছুই করবেন।

ক্যাথলিক ধর্ম এই সব গভীর তত্ত্বের অনেক কিছু শেখায় এবং একটু সংকীর্ণ হলেও উচ্চ ভাবে ধর্মনিষ্ঠ। আধুনিক সমাজে প্রোটেস্টাণ্ট মত উদার হলেও অগভীর। সত্য কতখানি মঙ্গল করেছে তার দ্বারা বিচার করা যতটা খারাপ, ঠিক ততটা খারাপ হচ্ছে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্য সম্বন্ধে একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করা।

সমাজ হবে প্রগতিশীল। আমাদের নিয়ম ভেঙে নিয়মের বাইরে যেতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করার জন্যই আমরা তাকে স্বীকার করি। বৈরাগ্যের অর্থই হচ্ছে কেউ ভগবান ও ম্যামনের সেবা একসঙ্গে করতে পারে না

তোমার নিজের ভাব ও প্রেমকে গভীর কর। নিজের হৃদয়পদ্মকে প্রস্ফুটিত করে তোল—মৌমাছিরা আপনিই এসে জুটবে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, তারপর ঈশ্বরে। মুষ্টিমেয় শক্তিশালী মানুষ পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে। আমরা চাই অনুভব করার মতো হৃদয়, ধারণ করার মতো মস্তিষ্ক এবং কর্ম করার মতো বলিষ্ঠ বাহু। বুদ্ধ প্রাণীদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। নিজেকে কর্ম করার উপযুক্ত করে তোল। কিন্তু ঈশ্বরই কর্ম করেন, তুমি নও। একজনের মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব রয়েছে। জড়বস্তুর একটি কণার মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে বিরোধে হৃদয়কেই অনুসরণ কর।

পূর্বে প্রতিযোগিতাই ছিল নিয়ম। বর্তমানে সহযোগিতাই হচ্ছে নিয়ম। ভবিষ্যতে কোন নিয়ম-কানুন থাকবে না। ঋষিরা তোমার প্রশংসা করুক কিংবা পৃথিবী তোমার নিন্দা করুক, সৌভাগ্য আসুক কিংবা দারিদ্র্য ও ছিন্নকন্থা তোমায় ভ্রূকুটি করুক, একদিন হয়তো বনের লতাপাতা খাদ্য রূপে গ্রহণ করবে এবং পরদিন পঞ্চাশ উপকরণের ভোজে অংশ গ্রহণ করবে, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে এগিয়ে যাও।

স্বামীজী প্রশ্নের উত্তরে পওহারী বাবার গল্প বলা শুরু করেন—কীভাবে তিনি নিজের বাসনপত্র নিয়ে চোরের পিছনে ছুটেছিলেন এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন—'ওগো প্রভু, আমি জানতাম না তুমি ওখানে এসেছিলে! এগুলি নাও! এগুলি তোমার! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার সন্তান!'

স্বামীজী আরও বলেন, কীভাবে সেই সাধককে এক গোখরো সাপ কামড়ায় এবং সন্ধ্যার দিকে যখন তিনি সুস্থ হন, তখন বলেন, 'আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে এক দূত এসেছিল।'

জ্ঞান ও কর্ম

[২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৫, লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতার নোট]

সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তি পাওয়া যায় চিন্তার শক্তি থেকেই। বস্তু যত সূক্ষ্ম, তার

শক্তিও তত বেশি। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মানুষকেও প্রভাবিত করে, কারণ মন এক, আবার অনেক। জগৎ এক মাকড়সার জাল, মনগুলি মাকড়সা।

এক বিশ্বব্যাপী সত্তার প্রকাশ হচ্ছে এই জগৎ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে দৃষ্ট সেই সত্তা এই জগৎ। এটাই মায়া। তাই এই জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, অর্ধ প্রকাশ—যেমন প্রভাতে সূর্যকে একটি লাল বলের মতো দেখায়। এইভাবে যা কিছু অশুভ ও মন্দ, তা হচ্ছে দুর্বলতা, ভালর অসম্পূর্ণ প্রকাশ।

সরলরেখাকে অনন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করলে একটি বৃত্ত হয়ে ওঠে। ভালর সন্ধান আত্মাতে ফিরে আসে। 'আমি'ই হচ্ছি সমস্ত রহস্য,—ঈশ্বর। কাঁচা আমি হচ্ছে দেহ, আবার আমিই বিশ্বের প্রভু।

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ কেন হবে? কারণ তাতে তার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয়। যা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে তোলে, তাই হচ্ছে নীতি। যা কিছু এর বিপরীত তাই হচ্ছে দুর্নীতি। দেশ ভেদে, ব্যক্তি ভেদে এর মান বিভিন্ন। মানুষকে বিধিনিষেধ, শাস্ত্রবচন ইত্যাদি থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে। এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই, কিন্তু যখন আমরা মুক্ত হব তখন ইচ্ছা হবে স্বাধীন। সংসারকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়ার নামই ত্যাগ। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়েই ক্রোধ আসে, দুঃখ আসে। যতক্ষণ না বৈরাগ্য জাগছে, স্বার্থ ও কামনা বিভিন্নভাবে পরিচালিত করে। শেষে তারা একাত্ম হয়ে যায় এবং মানুষ তখুনি পশু হয়ে যায়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হয়ে যাও!

একদা আমার দেহ ছিল, জন্মগ্রহণ করেছিলাম, জীবন-সংগ্রাম করেছিলাম এবং মৃত্যু হয়েছিল। কি ভয়ংকর মতিভ্রম! দেহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে মুক্তির জন্য ক্রন্দন!

কিন্তু ত্যাগের মানে কি এই যে আমরা সবাই সন্ন্যাসী হব? তাহলে অপরকে সাহায্য করবে কে? ত্যাগের অর্থ সন্ন্যাস নয়। সব ভিখারীই কি খ্রীষ্ট? দারিদ্র্য ও সাধুতা সমার্থক নয়; অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত। ত্যাগ হচ্ছে মনের ব্যাপার। কেমন করে এটি আসে? মরুভূমিতে যখন আমি তৃষ্ণার্ত, তখন এক হ্রদ দেখলাম। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সেটি অবস্থিত। চারধারে গাছেরা ঘিরে রয়েছে, জলে তাদের উল্টো ছায়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সব জিনিসটাই মরীচিকা বলে প্রমাণিত হলো। তখন বুঝলাম মাসাবধি প্রতিদিন আমি এই দৃশ্য দেখেছি এবং শুধু সেদিনই তৃষ্ণার্ত হয়েছি বলে আমি শিখলাম যে ওটা অবাস্তব। আবার আমি মাসের প্রতি দিন ওটা দেখব, কিন্তু সত্য বলে আমি আর ওটাকে কখনও মনে করব না। তাই আমরা যখন ঈশ্বরকে পাই, তখন জগৎ, দেহ ইত্যাদি অন্যান্য ভাব অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে আবার ফিরে আসবে, কিন্তু তখন আমরা সেগুলিকে মিথ্যা বলেই জানব।

পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে বুদ্ধ ও যীশুর মতো মানুষদের জীবন-ইতিহাস। নিষ্কাম ও নিরাসক্ত মানুষেরাই জগতের জন্য যা কিছু করেন। দরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কল্পনা কর। দুঃখের পারে তিনি দর্শন করে বলেছিলেন, 'ভাইরা, তোমরা সকলেই স্বর্গীয়।' তাঁর নীরব কর্ম। দুঃখের কারণগুলি তিনি দূর করেন। তখনই তুমি জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারবে, যখন তুমি প্রকৃতই বুঝবে এই কর্ম নিতান্তই

মায়া। এই কর্ম যত অজ্ঞাতসারে হয় ততই ভাল, কারণ তাহলে এই কর্ম আরও ঊর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন হয়। আমাদের সন্ধান ভাল বা মন্দের জন্য নয়, তবে সুখ ও মঙ্গল হচ্ছে তাদের বিপরীত—দুঃখ ও অমঙ্গলের চেয়ে সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা কাঁটা ফুটেছিল, আর একটা কাঁটা দিয়ে সে তা তুলে ফেলল। এই প্রথম কাঁটাটি মন্দ আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্মা হচ্ছে সেই শান্তি, যা ভাল ও মন্দ দুটিকেই অতিক্রম করে যায়। বিশ্ব বিলীন হয়ে যায়, মানুষ ঈশ্বরের নিকটতর হয়। ক্ষণেকের জন্য সে স্বরূপ ফিরে পায়—ঈশ্বর হয়। আবার ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষরূপে আবির্ভূত হন। তখন জগৎ তাঁর সামনে কেঁপে ওঠে। মূর্খ ঘুমায় এবং জেগে মূর্খই থাকে—অচেতন মানুষ ; আর সচেতন মানুষ, সে অনন্ত শক্তি, পবিত্রতা ও প্রেম—দেব-মানব। অতীন্দ্রিয় অবস্থার এটাই কার্যকারিতা।

এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধনা করা যেতে পারে। গীতা এইভাবে প্রচারিত হয়েছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছে—সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। নিষ্ক্রিয় অবস্থার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন ; দ্রুত স্পন্দন দ্বারা সক্রিয়তা এবং সবচেয়ে তীব্র স্পন্দন দ্বারা শান্ত। আত্মাকে রথী বলে জানবে। দেহ হচ্ছে রথ, ইন্দ্রিয়সমূহ অশ্ব, মন বল্গা এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবে মানুষ মায়ার সমুদ্র পার হয়। সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। যতক্ষণ মানুষ ইন্দ্রিয়গুলির অধীনে, ততক্ষণ সে এই সংসারের। যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় করে, তখন সে ত্যাগী।

দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও ঠিক নয়, সংগ্রাম ক্ষমার চেয়ে ভাল। দেবদূতের দলকে পরাজিত করতে পারলে তখন তুমি ক্ষমা কর। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ তাঁকে বলতে শুনেছিলেন, 'আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করা যাক।' তিনি বলেছিলেন, 'তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছ, কিন্তু তুমি তো জ্ঞানী নও, কাপুরুষ।' জলে থেকেও পদ্ম যেমন জলসিক্ত হয় না, তেমনি আত্মাও সংসারে থাকবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র, সংগ্রাম করে পথ করে নাও। সংসারের এই জীবন ঈশ্বর লাভের একটি প্রয়াস। ত্যাগের দ্বারা বলীয়ান ইচ্ছাশক্তির বিকাশরূপে তোমার জীবন গড়ে তোল।

আমাদের শিখতে হবে মস্তিষ্কের সকল কেন্দ্রগুলিকে জ্ঞাতসারে নিয়ন্ত্রিত করা। জীবন যাপনের আনন্দ হলো প্রথম সোপান। কৃচ্ছ্রসাধন পৈশাচিক। প্রার্থনা করার চেয়ে হাসা ভাল। গান কর। দুঃখকে ঝেড়ে ফেলে দাও। ভগবানের দোহাই, অপরের মধ্যে এই দুঃখের ভাব সংক্রামিত ক'রো না। কখনও ভেব না ভগবান একটু সুখ ও একটু দুঃখ নিয়ে ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও ধূপে নিজেকে পরিবেষ্টিত করে রাখ। সাধকরা প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য পর্বত শিখরে যেতেন।

দ্বিতীয় সোপান পবিত্রতা।

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সত্য ও অসত্যের বিচার কর। দেখ যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। যদি ক্ষণেকের জন্য ভাব তুমি ঈশ্বর নও, তাহলে মহাভয় তোমায় আক্রমণ করবে। যখনই চিন্তা করবে 'সোঽহং', তখনই পরম শান্তি ও আনন্দ পাবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর। যদি কেউ আমাকে অভিশাপ দেয়, তবুও আমার তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা উচিত। তাকে আমার দুর্বলতার জন্য অভিশাপকারী-

রূপে দেখি। যে গরীব লোকটির তুমি উপকার কর, সেও তোমায় উপকার করার সুযোগ দিচ্ছে। ঈশ্বরই দয়া করে তাঁর উপাসনা করার সুযোগ তোমায় দিচ্ছেন।

পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভেতরের দেবত্বকে জাগিয়ে তোলে। তুমি সব কিছু করতে পার। তুমি তখনই বিফল হও ; যখন অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা কর না। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই মরণ আসে।

অন্তর্নিহিত দেবত্বকে সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা গুণ্ডামি দ্বারা পরাজিত করা যায় না। যেখানেই সভ্যতা সেখানেই মুষ্টিমেয় গ্রীক কথা বলে। ভুল ত্রুটি কিছু সর্বদাই থাকবে। দুঃখ করো না। গভীর অন্তর্দৃষ্টি রাখ। মনে করো না, 'যা হবার হয়েছে। আহা, যদি আরও ভাল হতো!' মানুষের মধ্যে দেবত্ব না থাকলে সব মানুষ এত দিনে প্রার্থনা আর অনুশোচনা করতে করতে পাগল হয়ে যেত।

কেউ পড়ে থাকবে না, কেউ ধ্বংস হবে না। পরিণামে সকলেই পূর্ণতা লাভ করবে। দিনরাত বল, 'উঠে এস, ভাইসব! তুমি পবিত্রতার অনন্ত সাগর। দেবতা হও! ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও!'

সভ্যতা কি? সেটি হচ্ছে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে অনুভব করা। যখনই সময় পাবে, এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কর। এই হচ্ছে সব। যা ঈশ্বর নয়, সে সব অস্বীকার কর। যা কিছু ঈশ্বর ভাবাপন্ন, তা দৃঢ়ভাবে তুলে ধর। দিনরাত মনে মনে এটি ঘোষণা কর। তাতেই অজ্ঞানের আবরণ পাতলা হয়ে যাবে :

'আমি মানুষ নই, দেবতাও নই। আমি স্ত্রী বা পুরুষ নই, আমার কোন সীমা নেই। আমি চিৎস্বরূপ। আমি ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘৃণা নেই। আমার আনন্দ বা বেদনা নেই। জন্ম বা মৃত্যু আমার কখনও হয়নি। কারণ আমি পরম জ্ঞানস্বরূপ, পরম আনন্দস্বরূপ। আমার আত্মা, আমিই সেই, 'সোহং'!'

নিজেকে দেহবিহীন ভাব। কখন তোমার দেহ ছিল না। এটা আগাগোড়াই কুসংস্কার। সকল দরিদ্র, পদদলিত, অত্যাচারিত ও রোগপীড়িতকে দিব্য-চেতনা ফিরিয়ে দাও।

বাস্তবতঃ, প্রায় প্রতি পাঁচশো বছর অন্তর এই ভাবতরঙ্গ পৃথিবীতে আসে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানা দিকে ওঠে, কিন্তু একটি তরঙ্গ অন্য সবগুলিকে গ্রাস করে সমাজকে ভাসিয়ে দেয়। যে ভাবতরঙ্গের পেছনে সবচেয়ে চরিত্রবল আছে, সেটিই এমন করে থাকে।

কনফুসিয়াস, মোজেস ও পিথাগোরাস ; বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ ; লুথার, কেলভিন ও শিখগুরুরা ; থিওজফি, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি সকলেরই অর্থ হচ্ছে শুধু মানুষের মধ্যে দেবত্বকে প্রচার করা।

কখনও বলো না মানুষ দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতো। প্রেমই আদর্শ এবং কোন বস্তুর প্রয়োজন করে না। প্রেমই ঈশ্বর। সেইজন্য ভক্তি দিয়ে আমরা আত্মস্বরূপ ঈশ্বরে পৌঁছাতে পারি। আমিই তিনি। শহর, দেশ, জীব, জগৎকে ভাল না বাসলে কেমন করে কাজ করা যায়? বিচারের দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাওয়া

যায়। নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরা সামাজিক মঙ্গলের জন্য কাজ করুক। সেইভাবে ঈশ্বর আসেন।

কিন্তু এক বিষয়ে তোমরা নিশ্চয় সাবধান হবে : কারও বিশ্বাস নষ্ট করো না। নিশ্চয় জেনে রেখ—ধর্ম কোন মতবাদে নেই। আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়াই ধর্ম, উপলব্ধিতেই ধর্ম। মানুষ মাত্রই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ পশু। উচ্চতম মানুষ পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব্দ, বর্ণ, মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করে চিন্তা করতে হয়।

তুমি যে আর পৌত্তলিক নও তার পরীক্ষা হচ্ছে : 'যখন বলো "আমি" তখন তোমার চিন্তায় দেহটা আসে কিনা ? যদি আসে তবে তুমি তখনও পুতুল-পূজক।' ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়, ধর্ম হচ্ছে উপলব্ধি। যদি ঈশ্বর বিষয়ে 'চিন্তা' কর, তবে তুমি নিতান্তই মূর্খ। অজ্ঞ মানুষ প্রার্থনা ও ভক্তি দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করতে পারে। ঈশ্বরকে জানার জন্যে কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অপরের বিশ্বাসে আঘাত না করা। ধর্ম হচ্ছে অভিজ্ঞতা। সর্বভাবে ও সবার উপরে আন্তরিক হও ; কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়ালে দুঃখ আসে, কারণ তার থেকে বাসনা জাগে। এই ভাবেই গরীব লোক সোনা দেখে সোনার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সাক্ষীস্বরূপ হও। কোন বিষয়ে কখনও যেন প্রতিক্রিয়া না হয়, এটি শেখ।

আধুনিক জগতের উপর বেদান্তের দাবি

[২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০, রবিবার, ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার 'দি ওকল্যাণ্ড এনকোয়ারার' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রতিবেদন]

প্রাচ্যদেশের বিশিষ্ট সুধী স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিটেরিয়ান চার্চে ধর্ম মহাসভায় বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করবেন এই ঘোষণাটি গত সন্ধ্যায় বিরাট জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করেছিল। প্রধান হলঘরটি ও পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সংলগ্ন ওয়েণ্ট হলটি খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটিতেও ভিড় উপচে পড়ছিল। অনুমান করা যায় শ-পাঁচেকের উপর লোককে ভালভাবে শোনার জন্য বসার বা দাঁড়াবার জায়গা না দিতে পারায় ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল।

স্বামীজী শ্রোতাদের মনে গভীর ছাপ ফেলেন। তিনি বক্তৃতার মাঝে ঘন ঘন করতালি পান এবং বক্তৃতার শেষে উৎসাহী প্রশংসাকারীরা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। 'আধুনিক জগতের উপর বেদান্তের দাবি' বিষয়ে তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ হলো :

বেদান্ত দাবি করে আধুনিক জগতের বিচার-বিবেচনা। মানবজাতির সর্ববৃহৎ অংশ এর দ্বারা প্রভাবান্বিত। বার বার ভারতবর্ষে এর সমর্থকদের উপর লক্ষ লক্ষ লোক আক্রমণ করেছে, তাদের চরম শক্তি দিয়ে একে দলিত করেছে, তবু এই ধর্মটি বেঁচে আছে।

পৃথিবীর অন্য কোন জগতের মধ্যে কি এই ধরনের কিছু দেখা যায় ? অন্যেরা উঠে

এরই ছত্রছায়াতলে এসেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো জন্মে আজ তারা জীবন্ত ও বাড়ন্ত এবং কাল তারা বিগত। এটা কি যোগ্যতমের টিঁকে থাকা নয়?

এটি এক ধারা, যা এখনও শেষ হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে এটি বর্ধিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। মাত্র এক ঘণ্টার ভাষণে তার শুধু একটু আভাস আমি আপনাদের দিতে পারি।

প্রথমে আপনাদের বলি বেদান্তের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। যখন এর উদয় হয়, তার আগেই ভারতে একটি ধর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। বহু বছর ধরেই সেটি দানা বেঁধে উঠছিল। ইতিমধ্যে বিশদ অনুষ্ঠানাদি হতো, ইতিমধ্যেই জীবনের বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন নীতি-পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে ধর্মের মধ্যে যে সব হাস্যকর অনুষ্ঠান ও তামাসা ঢুকে পড়ে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলো, মহাপুরুষরা এগিয়ে এলেন বেদের মাধ্যমে প্রকৃত ধর্ম ঘোষণা করতে। হিন্দুরা তাদের ধর্মকে পেল বেদগুলির ঘোষণার মধ্য থেকে। তাদের বলা হলো বেদের আদি নেই, অন্তও নেই। এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এটি হাস্যকর শোনাতে পারে—বইয়ের গোড়া বা শেষ না থাকা কেমন ভাবে হতে পারে; কিন্তু বেদ বলে কোন বইকে বোঝানো হয় না। বেদের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মগুলির সঞ্চিত ভাণ্ডার।

এই মানুষগুলির আবির্ভাবের আগে ঈশ্বর জগৎ শাসন করেন এবং মানুষ অমর এই জনপ্রিয় ধারণাগুলি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধারণাগুলি ওইখানেই থেমেছিল। মনে করা হতো এর বেশি কিছু আর জানার নেই। তখন এল বেদ-প্রবক্তাদের দুঃসাহসিকতা। তাঁরা বুঝেছিলেন যে ধর্ম শিশুদের উপযোগী, তা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে ভাল নয়; মানুষ ও ঈশ্বরের পক্ষে আরও কিছু আছে।

অজ্ঞেয়বাদীরা জনেন শুধু বাইরের প্রাণহীন প্রকৃতিকে। তাই থেকে সে বিশ্বের নিয়ম সৃষ্টি করে নেয়। সে আমার নাকটুকু কেটে নিয়ে আমার সারা দেহ সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছে বলে তর্ক করতে পারে। তার অন্তর্মুখী হওয়া উচিত। আকাশ-ভরা তারার মেলা, এমন কি এই বিশ্ব-জগৎ হচ্ছে জলাশয়ের একটি মাত্র বারিবিন্দু, অজ্ঞেয়বাদীরা এই বিরাটকে অনুভব করে না এবং সে এই বিশ্ব দেখেই ভয় পায়।

সবচেয়ে বড় হচ্ছে আত্মার জগৎ—বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর—আমাদের পিতা, আমাদের মাতা। যাকে আমরা পৃথিবী বলি সেই মূঢ় মূক তামাশার মঞ্চটি কি? সর্বত্রই দুঃখ। শিশু অধরে ক্রন্দন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার প্রথম উক্তি হচ্ছে সেটাই। শিশু বড় হয় এবং দুঃখে এত অভ্যস্ত হয়ে যায় যে হৃদয়ের বেদনা মুখের হাসিতে ঢাকা পড়ে যায়।

এই জগতের সমাধান কোথায়? যারা বাইরে খুঁজে বেড়ায় তারা কোনদিন দেখতে পাবে না; নিজেদের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে সত্যকে খুঁজে বের করতে হবে। ধর্ম অন্তরে বাস করে।

একজন প্রচার করল, যদি মাথাটা কেটে ফেল মুক্তি পাবে। কিন্তু সে কি তাকে অনুসরণ করার মতো কারুকে খুঁজে পায়? আপনাদেরই যীশু বলেছেন, 'দরিদ্রকে সব দাও এবং আমায় অনুসরণ কর।' আপনাদের মধ্যে কজন তা করেছেন? এই

আদেশ আপনারা অনুসরণ করেন নি, তবু যীশু আপনাদের ধর্মের বড় শিক্ষক। আপনাদের প্রত্যেকেই নিজের জীবনে বাস্তববাদী এবং আপনারা বোঝেন এটি অবাস্তব হবে।

কিন্তু বেদান্ত আপনাদের অবাস্তব কিছু প্রদান করে না। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই গবেষণা করার মতো নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং প্রচুর জ্ঞান ও শিক্ষা; কিন্তু রাস্তার যে কোন লোক ধর্ম সম্বন্ধে সব কিছু আপনাকে বলতে পারে। আপনি ধর্মানুসরণ করতে চাইলে দক্ষ ব্যক্তির শরণাপন্ন হবেন, কিন্তু রাস্তার লোকটার সঙ্গে শুধু আলোচনাই করবেন কারণ সে এটা নিয়ে বকতে পারে।

বিজ্ঞানের ব্যাপারে যেমন করেন ধর্ম নিয়েও তেমনি করবেন, তথ্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবেন এবং তারই ভিত্তির উপর চমকপ্রদ সৌধ নির্মাণ করবেন।

প্রকৃত ধর্মের জন্য আপনার উপকরণ লাগবে। বিশ্বাসের কথা বলছি না, বিশ্বাস দিয়ে কিছু করতে পারবেন না, কারণ আপনি সব কিছুই বিশ্বাস করে বসতে পারেন।

আমরা জানি যে বিজ্ঞানে বেগের বৃদ্ধির সঙ্গে ভর হ্রাস এবং ভর বৃদ্ধির সঙ্গে বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে আমরা বস্তু ও শক্তিকে পাই। আমরা জানি না বস্তু কী ভাবে শক্তিতে পরিণত হয় এবং শক্তি বস্তুতে। অতএব এমন কিছু আছে যেটি শক্তি নয়, আবার বস্তুও নয়, যাতে এ দুটি পরস্পরের মধ্যে বিলীন হতে না পারে। তাকেই আমরা মন বলি,—বিশ্ব-মানস।

আপনি জানেন, আপনার দেহ ও আমার দেহ পৃথক। বিশ্বের মানব-মহাসমুদ্রে আমি এক ছোট ঘূর্ণি। ঘূর্ণি এটা সত্য, কিন্তু মহাসমুদ্রেরই অংশ।

যার প্রতিটি কণা পরিবর্তিত হচ্ছে সেই চলমান জলস্রোতের ধারে দাঁড়িয়ে আপনি তাকে বলেন স্রোতস্বিনী। জলধারা পরিবর্তিত হচ্ছে এটা সত্য, কিন্তু তীর দুটি একই থাকে। মন পরিবর্তিত হচ্ছে না, কিন্তু দেহ হচ্ছে—কি দ্রুত এর পরিবর্তন! শিশু ছিলাম, বালক, বয়স্ক এবং শিগগিরই জরাগ্রস্ত ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ হয়ে যাব। আপনি বলতে পারেন দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, আর মনেরও কি হচ্ছে না? আমি যখন শিশু ছিলাম সবে চিন্তা শুরু করেছিলাম, বড় হয়েছি কারণ মনটা হয়েছে চিন্তা ভাবনার সমুদ্র।

এই প্রকৃতির পিছনে আছে এক বিশ্ব-মানস। প্রশ্ন হচ্ছে, 'মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যায়? এর উত্তর দিতে হবে বালকের সেই জিজ্ঞাসার জবাবের মতোই'—'পৃথিবী কেন পড়ে যাচ্ছে না?' প্রশ্ন দুটি এক রকম এবং তাদের সমাধানও একই রকম; কারণ আত্মা কোথায় যেতে পারে?

আপনারা যাঁরা অমরত্বের কথা বলেন, তাঁদের আমি বলব বাড়ি গিয়ে নিজেকে মৃত বলে কল্পনার চেষ্টা করতে। পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মৃতদেহ স্পর্শ করুন! পারবেন না, কারণ নিজের বাইরে আসতে আপনি পারেন না। প্রশ্নটা অমরত্ব সম্পর্কে নয়, মৃত্যুর পরে জ্যাকের সঙ্গে তার জেনির দেখা হবে কিনা নিয়ে।

ধর্মের সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে মানুষ যে আত্মা সেটা স্বয়ং জানা। 'আমি কী,

আমি হীন।' এই বলে কান্না নয়। কবি বলেছেন, 'আমি অস্তিত্ব স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ।' কোন মানুষই জগতের কোন উপকার করতে পারে না শুধু কেঁদে, 'আমি এর মন্দের একজন।' যত সম্পূর্ণ হবে তত কম অসম্পূর্ণতা দেখবে।

জীবন ও মৃত্যুর বিধান

[৭ই মার্চ, ১৯০০, ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার 'দি ওকল্যাণ্ড ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রতিবেদন]

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ 'জীবন ও মৃত্যুর বিধান' বিষয়টির উপর এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলেন,—'এই জন্ম ও মৃত্যুর থেকে কেমন করে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—কেমন ভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়, কেমন ভাবে স্বর্গে না যাওয়া যায়—সেই হচ্ছে হিন্দুর সন্ধানের বিষয়।'

স্বামীজী আরও বলেন যে কিছুই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত নয়—সব কিছুই কার্য ও কারণের অন্তহীন শোভাযাত্রার অংশ। মানুষের চেয়ে উন্নততর কিছু থাকলে, তারাও এই নিয়ম নিশ্চয়ই মানে। শুধু জীবন থেকেই জীবন উদ্ভূত হতে পারে, চিন্তা থেকে চিন্তা, বস্তু থেকে বস্তু। বস্তু থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে না। চিরকাল এর অস্তিত্ব আছে। যদি মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে পৃথিবীতে সদ্য এসে থাকে, তারা কোন ধারণা ছাড়াই আসত; কিন্তু সেভাবে আমরা আসি না, যা প্রমাণ করে যে আমরা সদ্য সৃষ্টি হইনি। যদি শূন্য থেকে মানব-আত্মা সৃষ্টি হতো, তাহলে তাদের আবার শূন্যে ফিরে যাওয়ার কি বাধা ছিল? যদি ভবিষ্যৎ কালে সর্বদা আমাদের বাস করতে হতো, তাহলে অতীত কালেও সর্বদা আমরা নিশ্চয় বাস করেছি।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে আত্মা মন নয়, দেহও নয়। সেটা কি যা স্থির থাকে—যা বলতে পারে, 'আমি আমিই?' দেহ নয়, কারণ তা সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে; মন নয়, যা দেহের চেয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়, এমন কি কয়েক মিনিটের জন্যও একই চিন্তা যার কখনও নেই। এমন এক অভেদত্ব থাকবে যার পরিবর্তন হয় না—এমন কিছু যা নদীর কাছে যেমন তীর মানুষের কাছে তেমনি—তীরের পরিবর্তন হয় না এবং যার অনড়ত্ব ছাড়া আমরা চিরপ্রবাহমান স্রোতস্বিনী সম্পর্কে সচেতন হই না। দেহের পারে, মনের পারে এমন কিছু আছে যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সেটি আত্মা। মন শুধু মাত্র সূক্ষ্ম যন্ত্র যার দ্বারা আত্মা—কর্তা—দেহের উপর ক্রিয়া করেন। ভারতবর্ষে আমরা বলি, মানুষটি দেহ ত্যাগ করেছে, আর তোমরা বল, মানুষ আত্মা (ghost) ত্যাগ করে। হিন্দু বিশ্বাস করে মানুষ হচ্ছে আত্মা এবং তার দেহ আছে, আর পাশ্চাত্যবাসীরা বিশ্বাস করে সে হচ্ছে দেহ এবং তার আত্মা আছে।

জটিল সব কিছু মৃত্যুর কবলে পড়ে। আত্মা মৌলিক পদার্থ, অন্য আর কিছু দ্বারা গঠিত নয়, অতএব এর বিনাশ হতে পারে না। তার স্বভাব অনুসারেই আত্মা অমর। দেহ, মন ও আত্মা নিয়মের চক্রে আবর্তিত হয়—কারও নিস্তার নেই। এটি এক বিশ্বজনীন বিধান—সূর্য তারকারা যেমন একে অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি আমরাও পারি না। কর্মের বিধান হচ্ছে প্রতিটি কার্যের পিছনে শীঘ্রই বা বিলম্বে

একটি ফল নিশ্চয়ই আছে। পাঁচ হাজার বছর পরে এক মমির হাত থেকে নেওয়া ইজিপ্টের বীজ মাটিতে পুঁততে জীবন্ত হয়ে ওঠা হচ্ছে মানুষের কার্যের শেষহীন প্রভাবের দৃষ্টান্ত। কর্ম কখনও শেষ হয় না অন্য কর্মের জন্ম না দিয়ে। এখন আমাদের কর্ম যদি এই অস্তিত্বের স্তরে উপযুক্ত ফল প্রসব করে, তাহলে এই দাঁড়ায় যে আমরা সবাই ফিরে আসব কার্য ও কারণের চক্রটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে। পুনর্জন্মবাদের নীতি হচ্ছে এই। আমরা নিয়মের ক্রীতদাস, আচরণের ক্রীতদাস, তৃষ্ণার ক্রীতদাস, বাসনার ক্রীতদাস, হাজার বিষয়ের ক্রীতদাস। একমাত্র জীবন থেকে পালালে আমরা দাসত্ব থেকে মুক্তিতে পালাতে পারি। ঈশ্বরই একমাত্র মুক্ত। ঈশ্বর ও মুক্তি এক এবং অভিন্ন।

সত্তা ও ছায়া

[৮ই মার্চ, ১৯০০, ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার 'দি ওকল্যাণ্ড ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রতিবেদন।]

গত সন্ধ্যায় ওয়েণ্ডট্ হলে হিন্দু দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ আর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল—'সত্তা ও ছায়া'। তিনি বলেন—'মানবের আত্মা চিরকাল প্রচেষ্টা করছে স্থায়ীত্বের, অপরিবর্তনীয় কিছু খুঁজে বের করতে। সে কখনও সন্তুষ্ট নয়। সম্পদ, উচ্চাভিলাষের বা ক্ষুধার তৃপ্তি সবকিছুই পরিবর্তনশীল। একবার সেগুলি লাভ হলে মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। ধর্ম হচ্ছে সেই বিজ্ঞান, যা আমাদের শেখায় অপরিবর্তনীয়ের বাসনাকে কেমনভাবে পরিতৃপ্ত করতে হয়। স্থানীয় সকল বর্ণ ও সংস্কার পারে তারা একই বিষয় শিক্ষা দেয়—মানুষের আত্মার মধ্যেই আছে একমাত্র সেই সত্তা।

'বেদান্ত দর্শন শিক্ষা দেয় যে দুটি জগৎ আছে, বহির্জগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অন্তর্জগৎ বা আত্মসুখ—চিন্তা জগৎ।

'তিনটি মৌলিক প্রত্যয়কে ধারণা করা হয়—কাল, স্থান ও নিমিত্ত। এগুলি থেকে মায়া সৃষ্টি হয়, মানুষের চিন্তার মূল ভিত্তি, চিন্তার ফল নয়। পরবর্তীকালে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট।

'আমার সত্তা, প্রকৃতির সত্তা ও ঈশ্বরের সত্তা একই, পার্থক্য হচ্ছে প্রকাশিত হওয়ার আকারের মধ্যে। এই পার্থক্যের কারণ মায়া। তীরের সমোন্নতিরেখা সাগরের আকারকে পরিণত করে উপসাগরে, প্রণালীতে, খাঁড়িতে; কিন্তু যখন এই আকারদানকারী শক্তি বা মায়া অপসারিত হয়, বিভিন্ন আকার অদৃশ্য হয়ে যায়, পার্থক্য চলে যায়, সব কিছু আবার সাগর হয়।'

তারপর বেদান্ত-দর্শনে ক্রমবিকাশ তত্ত্বের যে মূল দেখা যায়, সেই সম্পর্কে স্বামীজী বলেন:

'সব আধুনিক ধর্মেরই এই ভাবটি থেকে উৎপত্তি'; বক্তা বলে যান, 'একদা মানুষ পবিত্র ছিল, তার পতন হলো এবং সে আবার পবিত্র হবে। আমি বুঝতে পারি না কোথা থেকে তারা এই ভাবটি পেল। জ্ঞানের বাসভূমি আত্মা, বাহ্যিক

পরিবেশ কেবল আত্মাকে উদ্দীপ্ত করে; জ্ঞানই আত্মার শক্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী এটি দেহ সৃষ্টি করে চলেছে। আত্মার জীবন কাহিনীর ক্রমান্বয় অধ্যায়গুলি হচ্ছে শুধু বিভিন্ন আকারের দেহ ধারণ। আমরা ক্রমাগত দেহ নির্মাণ করে চলেছি। সমস্ত বিশ্বই রয়েছে প্রবাহমান অবস্থায়, প্রসারণ ও সংকোচনের অবস্থায়, পরিবর্তনের অবস্থায়। বেদান্তের ধারণা যে আত্মা মূলতঃ কখনওই পরিবর্তনশীল নয়, কিন্তু মায়া দ্বারা আংশিক পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতি মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ঈশ্বর। প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হচ্ছে আত্মার আংশিক পরিবর্তন। সত্তার সর্ব প্রকার আকারের মধ্যে আত্মা মূলতঃ একই। তার প্রকাশ পরিবর্তিত হয় দেহ দ্বারা। আত্মার এই একত্ব, মানবজাতির এই একই সারাংশ হচ্ছে নীতিবিদ্যা ও নীতির ভিত্তি। এই ভাব অনুসারে সকলেই এক এবং কারও ভাইকে আঘাত করলে নিজের সত্তাকেই আহত করা হয়।

'এই অসীম একত্বের এক সহজ প্রকাশ হচ্ছে প্রেম। কোন দ্বৈত পদ্ধতির দ্বারা প্রেমের ব্যাখ্যা করতে পার? এক ইউরোপীয় দার্শনিক বলেছেন যে চুম্বন হচ্ছে নরখাদকতার চিহ্ন, "তোমার স্বাদ কত ভাল" তার এক ধরনের প্রকাশ। আমি একথা বিশ্বাস করি না।

'আমরা সবাই কি খুঁজে বেড়াই? মুক্তি। জীবনের সব সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা মুক্তির জন্য। জাতির, জগতের, ব্যবস্থা পদ্ধতির এ হচ্ছে এক বিশ্বজনীন যাত্রা।

'যদি আমরা বদ্ধ হই, তাহলে কে আমাদের বাঁধে? অসীমকে কোন শক্তি বন্ধন করতে পারে না, সে স্বয়ং ছাড়া।' আলোচনার পর বক্তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়, তিনি সেগুলির উত্তরদানের জন্য আধঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন।

মুক্তির পথ

[১২ই মার্চ, ১৯০০, সোমবার, ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত ভাষণের 'দি ওকল্যাণ্ড এনকোয়ারার' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রতিবেদন]

ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চের ওয়েণ্ডেট হলে গত সন্ধ্যায় প্রচুর শ্রোতৃবর্গের ভিড় হয়েছিল হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মুক্তির পথ' সম্পর্কে শোনার জন্য। স্বামীজী প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতামালার এইটি ছিল শেষ বক্তৃতা। তাঁর বক্তৃতার অংশ:

একজন বলেন ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, আর একজন বলেন যে ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে আছেন এবং সর্বত্র আছেন। কিন্তু যখন বিরাট সংকট আসে, আমরা দেখি যে লক্ষ্য একই। আমরা সবাই পৃথক ক্ষেত্রে কর্ম করি, কিন্তু পরিণামে প্রভেদ নেই।

প্রত্যেক বড় ধর্মেরই দুটি বড় মূলমন্ত্র হচ্ছে বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগ। আমরা সবাই সত্যকে চাই এবং আমরা জানি আমরা চাই বা না চাই সত্যের উদয় হবেই। একভাবে আমরা সকলেই সেই কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করছি। সত্যে উপনীত হবার জন্য কী আমাদের বাধা দিচ্ছে? আমরা নিজেরাই। তোমাদের পূর্বপুরুষরা তাকে শয়তান বলে অভিহিত করত; কিন্তু তা হচ্ছে আমাদের নিজেদেরই মিথ্যা আত্মভাব।

আমরা দাসত্বের মধ্যে বাস করি এবং যদি এর বাইরে যাই আমরা মরে যেতে পারি। আমরা ঠিক সেই লোকটির মতো যে নব্বই বছর সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে বাস করেছিল এবং যখন তাকে প্রকৃতির উষ্ণ রৌদ্রালোকের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে প্রার্থনা করেছিল তার গুহার মধ্যে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। তোমরা এই পুরানো জীবন ছেড়ে সামনে উন্মুক্ত নতুনতর ও বৃহৎতর মুক্তির মধ্যে যাবে না।

কোন বিষয়ের গভীরে যাওয়াই খুব কষ্টকর। অমুক জ্যাকের এইগুলি হচ্ছে অবনতিকর ভ্রান্তি, যে ভাবে তার অসীম আত্মা আছে, যত ক্ষুদ্রই সে হোক না কেন তার বিভিন্ন ধর্মের জন্য। একদেশে ধর্ম অনুসারেই এক ব্যক্তির বহু পত্নী আছে, আর এক দেশে স্ত্রীর বহু স্বামী। এইভাবে কিছু মানুষের দুটি দেবতা, কয়েকজনের একটি দেবতা, কারও কোন দেবতা নেই।

কিন্তু প্রেম ও কর্মের মধ্যেই মুক্তি। তুমি ভালভাবে কিছু শিক্ষা করলে, এক সময় তুমি সেই বিষয়টি স্মরণ করতে সক্ষম না হতে পার। তবুও সেটি তোমার চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছে এবং তোমার অংশই হয়ে আছে। সেজন্য ভাল বা মন্দ যেভাবেই তুমি কাজ কর, তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ গতিপথ তুমি নির্মাণ করছ। কর্মের ভাব নিয়ে যদি তুমি সৎ কর্ম কর—শুধু কর্মের জন্যই কর্ম—তাহলে তোমার ধারণা ও স্বপ্ন অনুযায়ী যে স্বর্গ, সেই স্বর্গে তুমি যাবে।

জগতের ইতিহাস বড় মানুষদের ইতিহাস নয়, মহাপুরুষদের নয়, কিন্তু সেই ইতিহাস সমুদ্রের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির মতোই, যারা সমুদ্রের স্রোতে ভেসে আসা পলি-মাটিতে গঠিত হয়ে নিজেদের মহাদেশে পরিণত করে। তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস লিখিত আছে প্রতি গৃহকোণে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের কর্মগুলিতে। মানুষ ধর্মকে গ্রহণ করে কারণ সে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে চায় না বলে। এক মন্দ জায়গা থেকে বের হওয়ার সবচেয়ে ভাল পথ বলেই সে এটি গ্রহণ করে।

মানুষের মুক্তি নিহিত আছে মহৎ প্রেমের মধ্যে, যা দিয়ে সে তার ঈশ্বরকে ভালবাসে। তোমার স্ত্রী বলে, 'ও জন, তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না।' কোন মানুষ তার অর্থহারা হলে তাকে উন্মাদ-আশ্রমে পাঠাতে হয়। তোমার ঈশ্বরের জন্য কি তুমি তেমন বোধ কর ? যখন তোমার টাকাকড়ি, বন্ধুবান্ধব, বাপ মা, ভাইবোন, জাগতিক সবকিছু ত্যাগ করতে পারবে এবং ঈশ্বরের কাছে কেবলমাত্র এই প্রার্থনা করবে যে তিনি যেন তাঁর ভালবাসা একটু তোমায় দান করেন, তখনই তুমি মুক্তি পাবে।

ভারতের মানুষ

[১৯শে মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ, সোমবার, ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার 'দি অকল্যাণ্ড এনকোয়ারার, পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রতিবেদন]

সোমবার রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতের মানুষ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা আগ্রহকর হয়েছিল, কারণ শুধু সেই দেশের মানুষ সম্বন্ধে বর্ণনা নয়, তাদের মনোভাব

ও সংস্কার সম্পর্কে কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে বক্তা যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন সেইজন্য। প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান স্বামীজী পাশ্চাত্য সভ্যতার একজন গুণমুগ্ধ নন। তিনি স্পষ্টতই বেশ কিছুটা বিরক্ত হয়েছেন বাল বিধবা, নারী-পীড়ন ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্বরতার নানারূপ অভিযোগের কথা শুনে এবং উত্তরে পালটা অভিযোগ করার খানিকটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

বক্তৃতার শুরুতে তিনি শ্রোতাদের কাছে ভারতের মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতোই ভারতে ঐক্যের বন্ধন হলো ধর্ম, ভাষা বা গোষ্ঠী নয়। ইউরোপে গোষ্ঠী জাতি সৃষ্টি করে, কিন্তু এশিয়ায় বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীরা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, যদি তাদের ধর্ম এক হয়। উত্তর ভারতের মানুষকে চারটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি এতই পৃথক যে কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতের লোকেরা মহান আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে পিরেনিজের বাস্ক জাতি ও ফিনজাতি ব্যতীত সমগ্র ইউরোপের মানুষ উদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়। দক্ষিণ ভারতীয়রা প্রাচীন মিশরীয় ও সেমিটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতে পরস্পরের ভাষা শিক্ষার অসুবিধা বোঝাতে স্বামীজী বলেন যে, যখন তাঁর দক্ষিণ ভারতে যাবার সুযোগ হয়েছিল, যেন সংস্কৃত-জানা মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তাঁকে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে হতো।

জাতিভেদ-প্রথার আলোচনাতেই বক্তৃতার অনেকটা চলে যায়, যার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে স্বামীজী বলেন যে, এর খারাপ দিক আছে, কিন্তু এর উপকারিতা অসুবিধার চেয়ে বেশি। সংক্ষেপে বলা চলে যে জাতিভেদ উৎপত্তি হয়েছিল পিতার বৃত্তি সর্বদা পুত্রের গ্রহণ করার রীতির ফলে। কালক্রমে এই বৃত্তিগত সম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণী স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। এই প্রথা মানুষকে যেমন বিভক্ত করেছে, তেমনি আবার ঐক্যবদ্ধও করেছে, কারণ শ্রেণী-ভুক্ত সকল মানুষ তার স্বজাতিকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ। যেহেতু কোন ব্যক্তি তার নিজের শ্রেণীর উর্ধ্বে উঠতে পারে না, সেজন্য অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারের যে সংগ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, হিন্দুদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

জাতিভেদের সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে যে, এটি প্রতিযোগিতাকে দমন করে এবং প্রতিযোগিতার অভাবই প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক জয়ের কারণ।

বহু আলোচিত বিবাহ বিষয়ে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক এবং সমাজের কল্যাণের কথা না ভেবে যুবক-যুবতীর পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ থাকার ফলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা তারা মোটেই ভাল চোখে দেখে না, কারণ যে কোন দুটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজী বলেন, 'আমি জেনিকে ভালবাসি এবং জেনি আমাকে ভালবাসে, তাই আমরা বিয়ে করব—এটা কোন কারণ নয়।'

বালবিধবাদের অবস্থার যে শোচনীয় বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তা অস্বীকার করে

তিনি বলেন যে, ভারতে বিধবাদের সাধারণভাবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি, কারণ সে দেশে বিষয়সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। প্রকৃতপক্ষে বিধবারা এমন একটি স্থান অধিকার করে আছে যে, মেয়েরা বা পুরুষেরা হয়তো পরজন্মে বিধবা হবার জন্য সম্ভবতঃ প্রার্থনা করতে পারে।

বালবিধবা বা যে নারীরা বাল্যকালেই বাগদত্তা এবং বিবাহের পূর্বেই বালক-'স্বামী' মৃত, তাদের প্রতি করুণা করা চলতো, যদি বিবাহই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হতো ; কিন্তু হিন্দু চিন্তাধারা অনুসারে বিবাহ বরং একটি কর্তব্য, কোন বিশেষ সুযোগ নয় এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার না দেওয়া বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার নয়।

ঐক্য

[১৯০০ সালের জুন মাসে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার নোট]

ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ ঐক্য বা দ্বৈতভাবের একটি মূল ধারণা হতে প্রসারিত হয়েছে।

মতবাদগুলি সবই বেদান্তের অন্তর্গত, সবগুলিই বেদান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। তাদের শেষ সারকথা হলো ঐক্যের শিক্ষা। যাঁকে আমরা বহুরূপে দেখি, তিনিই ঈশ্বর। আমরা অনুভব করি বস্তু, পৃথিবী, বহু ধরনের ভাবাবেগ। তবু মাত্র একটি সত্তাই বিদ্যমান।

এই সমস্ত বিভিন্ন নাম সেই 'এক'-এর প্রকাশের মাত্রাগত পার্থক্যকে দেখিয়ে দেয়। আজকের কীট, কালকের দেবতা। যে সকল স্বাতন্ত্র্যকে আমরা এত ভালবাসি, সে সবই অনন্ত সত্তার অংশ, সেগুলির পার্থক্য শুধু প্রকাশের মাত্রায়। সেই অনন্তই হচ্ছেন মুক্তি লাভ।

সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকল সংগ্রামই মুক্তির জন্য। আমরা দুঃখ চাই না, সুখও চাই না, চাই মুক্তি। এই একটি লক্ষ্যের মধ্যে আছে মানুষের অতৃপ্ত তৃষ্ণার রহস্য। হিন্দু বলে, বৌদ্ধও বলে— মানুষের তৃষ্ণা জ্বলন্ত, অতৃপ্ত, ক্রমবর্ধমান। তোমরা আমেরিকানরা সর্বদা আরও সুখ, আরও সম্ভোগের সন্ধান করছ। তোমরা সন্তুষ্ট হতে পার না সত্যি, কিন্তু তলায় তলায় তোমরা যা খুঁজছ, তা হচ্ছে মুক্তি।

এই বাসনার বিশালতা বস্তুতঃ মানুষের নিজের অনন্ত তত্ত্বের লক্ষণ। যেহেতু মানুষ অনন্ত, তাই সে একমাত্র তৃপ্ত হতে পারে, যখন তার বাসনা অনন্ত এবং পরিতৃপ্তিও অনন্ত হয়।

তাহলে মানুষকে কী তৃপ্ত করতে পারে? কাঞ্চন নয়। সম্ভোগ নয়। সৌন্দর্য নয়। শুধু এক অনন্তই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, আর সেই অনন্ত সে স্বয়ং। যখন সে এটি উপলব্ধি করে, কেবল তখনই মুক্তি আসে।

'এই বাঁশী, ইন্দ্রিয়গুলি যার রন্ধ্রস্বরূপ,
সকল চেতনা, অনুভূতি ও সংগীত,
শুধু একটি রাগিণীই গাইছে। যে বন থেকে ছেদন করা হয়েছে, সেখানেই সে ফিরে যেতে ব্যাকুল।'

'নিজেকে মুক্ত কর নিজের দ্বারা।
আহা, নিজেকে ডুবতে দিও না!
কারণ তুমিই তোমার পরম বন্ধু,
আবার তুমিই তোমার চরম শত্রু।'

অনন্তকে সাহায্য করতে কে পারে? অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যে হাতটি তোমার কাছে আসে, সেটিকেও তোমার নিজেরই হতে হবে।

ভয় ও কামনা—এই দুটি কারণই এ সবের মূল। কে তাদের সৃষ্টি করে? আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন যেন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে গমন। অনন্ত স্বপ্নবিলাসী মানুষ সীমার স্বপ্ন দেখবে!

আহা, বাইরের কোন বস্তু নিত্য বস্তু হতে পারে না—কি অপূর্ব আশীর্বাদ! এই আপেক্ষিক জগতে কিছুই চিরন্তন নয়--একথা শুনে যাদের বুক কেঁপে ওঠে, তারা ওই কথাগুলির অর্থ সামান্যই বোঝে।

আমি অনন্ত নীলাকাশ। আমার উপর দিয়ে এই নানা রংয়ের মেঘ ভেসে যায়, কখনও এক মুহূর্ত থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়। আমি সেই চিরন্তন নীলাকাশ থেকে যাই। আমি হচ্ছি সাক্ষী, সব কিছুরই সেই চিরন্তন সাক্ষী। আমি দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি না দেখলে প্রকৃতি থাকে না। আমাদের কেউ কিছু দেখতে বা বলতে পারতাম না, যদি এই অনন্ত ঐক্য এক মুহূর্তের জন্যও ভেঙে যেত।

দিব্য-জননীর উপাসনা

[১৯০০, জুন মাসে এক রবিবার বিকালে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণের খণ্ডিত নোট]

প্রতি ধর্মেই মানুষ গোষ্ঠী-দেবতার ভাব থেকে তাদের সমষ্টি পরমেশ্বর ভাবে উপনীত হয়েছে।

একমাত্র কনফিউসিয়াস চিরন্তন একটি নীতির কথা প্রকাশ করেছেন। 'মনু-দেব' রূপান্তরিত হয়েছেন আহুরিমানে। ভারতে পুরাণের গল্প চাপা পড়েছে, কিন্তু ভাবটি থেকে গেছে। প্রাচীন এক বেদে মন্ত্র পাওয়া যায়, 'সর্ব প্রাণীর সাম্রাজ্ঞী আমি, সবের শক্তি'।

মাতৃ-উপাসনা এক স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের ভাবগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে শক্তি। মানুষের প্রতি পদক্ষেপেই এটি অনুভূত হয়; অন্তরে অনুভূত শক্তি হচ্ছে আত্মা, বাইরে—প্রকৃতি। এই দুয়ের সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যা কিছু জানি বা অনুভব করি, তা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখেছিল সূর্য ভাল ও মন্দ দুয়ের উপর সমভাবে কিরণ বর্ষণ করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এটি এক নতুন ধারণা—সব কিছুর পিছনে সার্বভৌম শক্তি। এইভাবে মাতৃভাব জন্ম নিল।

সাংখ্য মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম, পুরুষ বা আত্মার নয়। ভারতে নারীর সর্বপ্রকার রূপের মধ্যে মাতা সবার উপরে। মা তাঁর সন্তানের পাশে সর্ব অবস্থায় থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু মা কখনও করেন না। আবার মাতৃশক্তিই বিশ্বের পক্ষপাতহীন মহাশক্তি, কারণ মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ কিছু চায় না, কিছু কামনা

করে না, সন্তানের দোষ গ্রাহ্য করে না, বরং তাকে আরও বেশি ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর উপাসনা।

যা এখনও পাওয়া যায়নি, তাকেই লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এখানে কোন লক্ষ্য নেই। এই জগতের সব কিছুই মায়ের খেলা। কিন্তু আমরা তা ভুলে যাই। এমন কি দুঃখকেও উপভোগ করা যায়, যখন স্বার্থজ্ঞান থাকে না, যখন আমরা নিজেদের জীবনের সাক্ষীরূপে পরিণত হই। সব ঘটনার পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল এই ধারণাই এই ভাবের সাধককে বিস্ময়াভিভূত করে। আমাদের ঈশ্বর চিন্তায় তিনি মানুষের মতো সসীম ও ব্যক্তিত্বময়; শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আসে। শক্তি বলেন, 'রুদ্র যখন ধ্বংস করতে চান, আমি তার ধনুক আকর্ষণ করি।' এই ভাবের চিন্তা উপনিষদে নেই, কারণ বেদান্ত ঈশ্বর-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু গীতায় আছে অর্জুনের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, 'আমি ব্যক্ত এবং আমিই অব্যক্ত। ভাল-মন্দ আমার সৃষ্টি।'

এই ভাবটি আবার সুপ্ত থাকে। পরবর্তীকালে আসে নতুন দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ এবং উভয়ের মধ্য দিয়ে একই শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে। 'যজ্ঞ এক-পেয়ে বিশ্ব ঈশ্বরকেও যজ্ঞ এক-পেয়ে করে তোলে।' অবশেষে, এই ভাব আমাদের সহানুভূতিহীন ও পশুভাবাপন্ন করে তোলে। এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে পাশবিক নীতি। সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আর পাপী সাধুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। এমন কি এই ভাবও এগিয়ে নিয়ে যায়। কারণ অবশেষে বারবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হয়ে দুটি স্বার্থপর মনের মৃত্যু হবে এবং তখন আমরা জেগে উঠব আর মাকে জানব।

মার কাছে চিরতরে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণ একমাত্র আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁর জন্যই তাঁকে ভালবাস—ভয়ে নয়, কিছু পাবার আশায় নয়। তাঁকে ভালবাস, কারণ তুমি তাঁর সন্তান। ভাল-মন্দ সবেতে সমভাবে তাঁকে দেখ। যখন তাঁকে আমরা এই ভাবে উপলব্ধি করব, একমাত্র তখনই আসবে সমত্ব ও চিরশান্তি—সেটিই মায়ের স্বরূপ। তার আগে পর্যন্ত দুঃখ আমাদের অনুসরণ করবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করতে পারলে আমরা নিরাপদ।

ধর্মের সারতত্ত্ব

[আমেরিকায় প্রদত্ত ভাষণের প্রতিবেদন]

ফরাসী দেশে জাতির দীর্ঘকাল ধরে মূলমন্ত্র ছিল 'মানুষের অধিকার'; আমেরিকায় এখনও 'নারীর অধিকার' জনসাধারণের কানে আবেদন জানায়; ভারতে 'ঈশ্বরদের অধিকার' নিয়ে আমরা সর্বদা নিজেদের জড়িত রাখি।

সব ধর্মমতই বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে আমাদের এক বিশিষ্ট ভাব আছে। ধর আমার যদি এক পুত্র থাকত, তাকে আমি কোন ধর্মের শিক্ষা দিতাম না, শেখাতাম মনঃসংযমের অভ্যাস ও শুধু এক পংক্তি প্রার্থনা—তোমাদের ধারণা অনুযায়ী প্রার্থনা নয়—কিন্তু এই রকম, 'বিশ্বের স্রষ্টা যিনি, আমি তাঁকে ধ্যান করি; তিনি যেন আমার

মনকে আলোকিত করেন।' তারপর যখন যথেষ্ট বড় হবে, তখন বিভিন্ন দর্শন ও উপদেশ শুনতে শুনতে এমন কিছু খুঁজে পাবে, যা তার কাছে সত্য বলে মনে হবে। সে তখন সেই সত্য যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, সেই গুরুর (শিক্ষক) শিষ্য হবে। খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ বা মহম্মদ, যাঁকে ইচ্ছা সে উপাসনা করতে পারে, এঁদের প্রত্যেকের অধিকার আমরা স্বীকার করি, আর সকলের নিজস্ব ইষ্ট বা মনোনীত পন্থা অনুসরণের অধিকারও আমরা স্বীকার করি। তাই এটা খুবই সম্ভব যে একই সময়ে সম্পূর্ণ বিরোধবিহীন স্বাধীন ভাবে আমার পুত্র বৌদ্ধ, স্ত্রী খ্রীষ্টান ও আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।

আমরা সকলে স্মরণ করে আনন্দিত হই যে, সব ধর্ম পথেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায় এবং আমাদের চোখ দিয়ে সকলের ভগবানকে দেখার উপর পৃথিবীর উন্নতি নির্ভর করে না। আমাদের মূল ভাব হচ্ছে যে তোমার ধর্মবিশ্বাস আমার হতে পারে না, আবার আমার মত তোমার হতে পারে না। আমি আমার নিজের সম্প্রদায়। এটা সত্যি যে ভারতে আমরা এমন এক ধর্মমত সৃষ্টি করেছি, যা আমরা একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ধর্ম-ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু এর যুক্তিবত্তায় আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করছে সকল ঈশ্বরান্বেষীকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার উপর ; সকল রকমের উপাসনা পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ উদারতা দেখানো এবং জগতে ভগবদাভিমুখী চিন্তা প্রনালীগুলি চিরকাল গ্রহণ করার ক্ষমতার উপর। আমাদের পদ্ধতির অপূর্ণতা স্বীকার করি, কারণ তত্ত্বস্তু হচ্ছে সকল পদ্ধতির ঊর্ধ্বে ; আর এই স্বীকৃতির মধ্যে আছে অনন্ত বিকাশের ইংগিত ও প্রতিশ্রুতি। মত অনুষ্ঠানাদি ও শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষের স্বরূপ উপলব্ধির উপায় হিসাবে ঠিকই ; কিন্তু উপলব্ধির পরে সে সবকিছু পরিত্যাগ করে। বেদান্ত-দর্শনের শেষ কথা হচ্ছে, 'আমি বেদ পরিত্যাগ করেছি।' আচার-অনুষ্ঠান, স্তোত্রমন্ত্র ও শাস্ত্রগ্রন্থ, যার মধ্যে দিয়ে সে মুক্তিতে পৌঁছেছে, সে সব তার কাছে বিলীন হয়ে যায়। 'সোহং, সোহং,—আমিই তিনি, আমিই তিনি'—তাঁর ওষ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে এবং ঈশ্বরকে 'তুমি' সম্বোধন তখন অধর্মীয়, কারণ সে তখন 'পিতার সঙ্গে এক' হয়ে গেছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বেদের ততখানি গ্রহণ করি, যতখানি যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের বহু অংশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। পাশ্চাত্য মতে যাকে 'আদিষ্ট বাণী' বলে এগুলি তা নয়, কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের সমষ্টি জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা, যা আমাদের আছে। কিন্তু শুধু যে বইগুলিকে আমরা বেদ বলি, তার মধ্যেই এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এই কথা বলা উন্মাসিকতা। আমরা জানি সব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের মধ্যে তা বিভিন্ন মাত্রায় আছে। মনু বলেন, বেদের যে অংশটুকু যুক্তিগ্রাহ্য, সেইটুকুই বেদ ; আমাদের আরও অনেক দার্শনিক এই মত পোষণ করেন। পৃথিবীর সব শাস্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র বেদই ঘোষণা করে যে বেদ অধ্যয়ন গৌণ ব্যাপার।

প্রকৃত অধ্যয়ন তাকেই বলা হয়, 'যার দ্বারা আমরা শাশ্বতকে 'উপলব্ধি করি', এবং তা শুধু পাঠ, বিশ্বাস বা বিচার দ্বারা হয় না, অপরোক্ষানুভূতি ও সমাধির দ্বারা হয়। মানুষ যখন সেই পূর্ণাবস্থায় পৌঁছায়, তখন সগুণ ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত হয় : 'আমি ও আমার পিতা এক।' পরম ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক বলে তিনি জানেন

এবং সগুণ ঈশ্বরের মতো নিজেকে মনে করেন। সগুণ ঈশ্বর হচ্ছেন ব্রহ্ম—মায়া বা অজ্ঞানের আবরণের মধ্য দিয়ে দেখা।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই, তখন তাঁকে সগুণ ঈশ্বররূপেই কেবল দেখতে পারি। ভাবটি হচ্ছে যে আত্মা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হতে পারে না। জ্ঞাতা নিজেকে কেমন করে জানবে? কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনই নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে পারেন এবং এই প্রতিবিম্বের সর্বোচ্চ রূপ, আমার এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবার প্রচেষ্টাই হচ্ছে সগুণ ঈশ্বর। পরমাত্মা হচ্ছেন শাশ্বত, এবং তাঁকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার জন্য আমরা অনন্তকাল ধরে সাধন করছি, এই সাধনার মধ্য দিয়ে জগৎ-রহস্য প্রকটিত হয়েছে, যাকে আমরা জড়বস্তু বলি। কিন্তু এগুলি হচ্ছে দুর্বল প্রচেষ্টা এবং আমাদের কাছে সম্ভবপর আত্মার সর্বোচ্চ প্রকাশ হচ্ছে সগুণ ঈশ্বর।

'একটি সৎ ঈশ্বর হচ্ছেন মানুষের মহত্তম কীর্তি', তোমাদের পাশ্চাত্যের এক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন। যেমন ভগবান, তেমন মানুষ। এই রকম মানবিক প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না। যাই বল, যত চেষ্টাই কর, তুমি ঈশ্বরকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে পার না এবং তিনি তোমারই মতো। এক অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয়েছিল শিবের এক মূর্তি নির্মাণ করতে, বেশ কয়েক দিন চেষ্টার পর সে একটি বাঁদরের মূর্তি মাত্র তৈরি করতে পারল। তেমনি ভাবে যখনই আমরা ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা ভাবতে চেষ্টা করি, তখনই আমরা নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, কারণ আমাদের বর্তমান প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি রূপেই দেখি। যদি মহিষেরা ঈশ্বরকে উপাসনা করার বাসনা করে, তবে তারা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁকে এক বৃহৎ মহিষ বলেই ভাববে, একটি মাছ যদি ঈশ্বরকে উপাসনা করতে চায়, তাহলে ঈশ্বর সম্বন্ধে তার ধারণা হবে তিনি নিশ্চয় প্রকাণ্ড এক মাছ; সেই ভাবে মানুষ তাঁকে মানুষ বলেই চিন্তা করে। মনে কর যেন এই মানুষ, মহিষ ও মৎস্য সব ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, নিজ নিজ আকার ও সামর্থ্য অনুযায়ী ঈশ্বররূপ সমুদ্র জলে তারা পূর্ণ হতে যায়। মানুষের মাঝে সেই জল মানুষের আকার নেবে, মহিষের মাঝে মাহষের আকার এবং মৎস্যের মধ্যে মৎস্যের আকার; কিন্তু প্রতিটি পাত্রেই ঈশ্বররূপ সমুদ্রের সেই একই জল।

দু' ধরণের মানুষ ঈশ্বরকে মানুষ রূপে উপাপনা করে না—ধর্মহীন নরপশু ও পরমহংস, যিনি স্বীয় মানব-প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করেন। তাঁর কাছে সমস্ত প্রকৃতিই তাঁর নিজের স্বরূপ হয়ে গেছে, তিনিই শুধু ঈশ্বরকে তাঁর স্বরূপে উপাসনা করতে পারেন। সেই নরপশু তার অজ্ঞতার জন্য উপাসনা করে না, আর জীবন্মুক্তরা (মুক্ত আত্মা) উপাসনা করেন না, কারণ নিজেদের মধ্যে তাঁরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। 'সোহং, সোহং'—আমি তিনি, আমিই তিনি—তাঁরা বলেন এবং তাঁরা নিজেদের উপাসনা নিজেরা কিভাবে করবেন?

তোমাদের একটা ছোট গল্প বলব। একদা একটি সিংহশিশু মুমূর্ষু জননী দ্বারা ভেড়াদের মাঝে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ভেড়ারা তাকে খাওয়াত এবং আশ্রয় দিয়েছিল। সিংহটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল এবং ভেড়ারা যখন 'ব্যা-ব্যা' করত, সেও 'ব্যা ব্যা' করত। একদিন আর একটা সিংহ কাছাকাছি এসে পড়ে। অবাক হয়ে দ্বিতীয় সিংহটি বলল,

'তুমি এখানে কি করছ?' কারণ সে শুনেছিল মেষরূপী-সিংহটিও অন্যদের সঙ্গে ব্যা-ব্যা করছে। সিংহশিশুটি ব্যা-ব্যা করে বলল, 'আমি ছোট ভেড়া, আমি ছোট ভেড়া, আমি ভয় পেয়েছি।' প্রথম সিংহটি গর্জে উঠে বলল, 'বাজে কথা! আমার সঙ্গে আয়; আমি তোকে দেখাচ্ছি।' তারপর সে তাকে এক শান্ত নদীর ধারে নিয়ে গেল এবং জলে যা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তা দেখাল। 'তুই হচ্ছিস সিংহ; আমার দিকে দেখ, ভেড়াগুলোর দিকে দেখ, নিজের দিকে দেখ!' সিংহশিশুটি দেখল, তারপর বলল, 'ব্যা-ব্যা, আমি তো ভেড়ার মতো দেখতে নই,—সত্যিই আমি সিংহ!' এই বলে সে এমন গর্জন করল যে পাহাড়ের ভিৎ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

এই হচ্ছে—অভ্যাসের মেষচর্মাবৃত আমরা সকলেই সিংহ, আমাদের পরিবেশই আমাদের মোহাচ্ছন্ন করে দুর্বল করেছে। বেদান্তের কাজ হচ্ছে এই আত্মমোহ বিমোচন। মুক্তি হচ্ছে লক্ষ্য। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি আনুগত্য মুক্তি এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। এ কথার অর্থ কী আমি বুঝি না। মানুষের উন্নতির ইতিহাস অনুযায়ী প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করাই হচ্ছে উন্নতির মূলে। কেউ হয়তো বলবেন যে, সাধারণ নিয়মকে জয় করা তো উচ্চতর নিয়মের সাহায্যে হয়ে থাকে, কিন্তু বিজয়ী মন সেখানেও মুক্তিকেই খুঁজে বেড়ায়, আর যখনই সে বুঝতে পারে নিয়মের মধ্য দিয়েই সংগ্রাম, তখনও সে তা জয় করতে চায়। তাই সর্বদা আদর্শ হল মুক্তি। গাছেরা কখনও নিয়ম অমান্য করে না; আমি কখনও গরুকে চুরি করতে দেখি নি। ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না। তা সত্ত্বেও তারা মানুষের চেয়ে বড় নয়।

নিয়মের প্রতি আনুগত্য শেষ পর্যন্ত আমাদের জড়বস্তুতে পরিণত করে—তা সমাজে হোক, রাজনীতিতে হোক বা ধর্মেই হোক। এ জীবন তো মুক্তিরই বিরাট ঘোষণা; নিয়ম-কানুনের আধিক্য মানে মৃত্যু। হিন্দুদের মতো অন্য কোন জাতের এত বেশি সামাজিক নিয়ম নেই, যার ফল হচ্ছে জাতীয় মৃত্যু। কিন্তু হিন্দুদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ধর্মের মধ্যে তারা কোন গোঁড়ামি বা নিয়মাদি আনেনি; তাই তাদের ধর্মের সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে। তাই এই ধর্মের মধ্যেই আমরা বাস্তবদৃষ্টি-সম্পন্ন—আর তোমরা বাস্তবদৃষ্টিহীন।

আমেরিকায় কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে বলল, 'আমরা যৌথ কারবার করব'; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা হয়ে গেল। ভারতে কুড়িজন লোক মিলে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যৌথ কারবার সম্বন্ধে আলোচনা করল এবং তা হয়তো করাই হলো না; কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে যে চল্লিশ বৎসর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকলে জ্ঞানলাভ করবে, তাহলে সেটা করবে। তাই আমরা আমাদের ভাবে বাস্তববাদী, তোমরা তোমাদের ভাবে।

কিন্তু উপলব্ধির সব পথের সেরা পথ হচ্ছে প্রেম। ঈশ্বর ভালবাসলে সমস্ত বিশ্ব প্রিয় হয়ে ওঠে, কারণ সবই তো তাঁর সৃষ্টি। ভক্ত বলেন, 'সবই তাঁর এবং তিনি আমার প্রেমিক; আমি তাঁকে ভালবাসি।' এমনি করে ভক্তের কাছে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে, কারণ সব বস্তুই তো তাঁর। তাহলে কি করে আমরা কাউকে আঘাত দিতে পারি? তাহলে কি করে আমরা অন্যকে ভাল না বেসে পারি?

ঈশ্বরকে ভালবাসার সঙ্গে—তারই ফল রূপে—শেষ পর্যন্ত সকলের প্রতি ভালবাসা আসবে। যত আমরা ঈশ্বরের কাছে যাব, তত দেখতে পাব যে তাঁতেই সব কিছু রয়েছে, আমাদের হৃদয় তখন প্রেমের চিরন্তন নির্ঝরিণী। প্রেমের দিব্যালোকে মানুষ রূপান্তরিত হয় এবং সর্বশেষে সেই সুন্দর উদ্দীপনাময় সত্যকে উপলব্ধি করে যে, প্রেম, প্রেমিক, প্রেমাস্পদ বস্তুতঃ একই।

আমিই সেই

[২০শে মার্চ ১৯০০, স্যানফ্রান্সিস্কোয় প্রদত্ত ভাষণের নোট]

আজকের বিষয় হচ্ছে মানুষ, প্রকৃতির তুলনায় মানুষ। বহুকাল ধরে 'প্রকৃতি' শব্দটি কেবলমাত্র ব্যবহার করা হতো বাহ্যিক বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্য। এই বিষয়গুলি দেখা যেত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আচরিত হতো এবং তারা প্রায়ই নিজেদের পুনরাবৃত্তি করত। অতীতে যা ঘটেছে তা আবার ঘটত,—কিছুই মাত্র একবার ঘটত না। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল প্রকৃতির আচরণ একই প্রকার। প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে একই প্রকারত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; এটি ছাড়া প্রাকৃতিক বিষয় বোঝা যায় না। এই এক প্রকারত্ব আমরা যাকে নিয়ম বলি তার ভিত্তি।

ক্রমশঃ 'প্রকৃতি' শব্দটি ও একই প্রকারত্বের ধারণা আন্তর বিষয়গুলি সম্পর্কেও প্রয়োগ করা হলো, জীবন ও মনের বিষয়ে। যা সব পার্থক্য করা চলে তাই প্রকৃতি। বৃক্ষের গুণ, পশুর গুণ ও মানুষের গুণ হচ্ছে প্রকৃতি। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের জীবন আচরিত হয়; তার মনও তাই। চিন্তা শুধু শুধু ঘটে না, তার উদয়, অস্তিত্ব ও বিলয়ের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এক কথায়, ঠিক বাহ্যিক বিষয়গুলি যেমন নিয়মে আবদ্ধ, তেমনি আন্তর বিষয়গুলিও, যথা মানুষের জীবন ও মন, নিয়মে আবদ্ধ।

যখন আমরা মানুষের মন ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত নিয়ম বিবেচনা করি, তখুনি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কোন কিছু নেই। আমরা জানি পশুর প্রকৃতি কী ভাবে নিয়ম দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। পশুকে কোন স্বাধীন ইচ্ছা খাটাতে দেখা যায় না। মানুষের বেলায়ও সেটি সত্য; মানব প্রকৃতিও নিয়মে আবদ্ধ। মানুষের মনের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে যে নিয়ম, তাকে বলা হয় কর্মের নিয়ম।

শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে কেউ কখনও দেখেনি; মনে যদি কিছু উদয় হয়, সেটি নিশ্চয় কোন কিছু থেকে সৃষ্ট হয়েছে। যখন আমরা স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলি, তখন আমরা বোঝাতে চাই যে ইচ্ছাটির কারণ কোন কিছু নয়। কিন্তু এটি সত্য হতে পারে না, ইচ্ছার কারণ আছে এবং যেহেতু কারণ আছে তাই এটি স্বাধীন নয়—নিয়মের অধীন। এই যে আমি তোমাদের কাছে বক্তৃতায় ইচ্ছুক এবং তোমরা আমার কথা শুনতে এসেছ, এটাই নিয়ম। প্রতিটি বিষয় যা আমি করি বা ভাবি বা অনুভব করি, আমার প্রতিটি আচরণ ও ব্যবহারের অংশ, আমার

প্রতিটি নড়াচড়া—সবেরই কারণ আছে এবং সেই জন্যই স্বাধীন নয়। আমাদের জীবন ও মনের এই বিধিবদ্ধতাই হচ্ছে কর্মের নিয়ম।

যদি প্রাচীনকালে কোন পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতবাদ প্রবিষ্ট হতো তাহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করত। পাশ্চাত্যবাসীরা ভাবতে চায় না যে তার মন নিয়মের অধীন। ভারতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে যখন এই মত প্রস্তাবিত হয়েছে তখনই তা গৃহীত হয়েছে। মনের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। এই শিক্ষা ভারতীয় মনে কেন কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি? ভারত শান্তভাবে এটি গ্রহণ করেছে; ভারতীয় চিন্তাধারার এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য, জগতের অন্যান্য সব চিন্তার থেকে এই হচ্ছে পার্থক্য।

বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি দুটি পৃথক বস্তু নয়; বস্তুতঃ তারা এক। প্রকৃতি হচ্ছে সর্ব বিষয়ের সমষ্টি। প্রকৃতির অর্থ যা কিছু বিদ্যমান, যা কিছু গতিময়। আমরা বস্তু ও মনের মধ্যে চরম প্রভেদ করি; আমরা ভাবি মন বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতপক্ষে, তারা একই প্রকৃতি, যার অর্ধাংশ সমানে অন্য অর্ধাংশের উপর ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন সংবেদনের আকারে বস্তু মনের উপর চাপ ফেলেছে। এই সংবেদনগুলি শক্তি ছাড়া কিছু নয়। বাইরের শক্তি ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। বাইরের শক্তিতে সাড়া দেওয়া বা সরে যাওয়ার ইচ্ছা থেকেই অন্তরের শক্তি যাকে আমরা চিন্তা বলি তাই হয়।

বস্তু ও মন উভয়েই সত্যি করে শক্তি ছাড়া কিছু নয়। যদি তুমি এদের ভাল ভাবে বিশ্লেষণ কর, তাহলে দেখবে যে মূলে তারা এক। বাহ্যিক শক্তি যে কোন ভাবে অন্তর শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে এই সত্যটিই প্রমাণ করে যে কোথাও না কোথাও এদের মধ্যে যোগ আছে—এরা নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্ন এবং তাই মূলতঃ একই শক্তি। যখন তুমি বস্তুর মূলে যাও, তখন তারা সহজ ও সাধারণ হয়ে ওঠে। যেহেতু একই শক্তি বস্তুরূপে এক আকারে দেখা দিচ্ছে এবং মন রূপে আর এক আকারে, তাই বস্তু ও মনকে পৃথক ভাবার কোন যুক্তি নেই। মন বস্তুতে পরিবর্তিত হয়, বস্তু মনে পরিবর্তিত হয়। চিন্তা শক্তি পরিণত হয় স্নায়ুর শক্তিতে, পেশীর শক্তিতে; স্নায়বিক ও পৈশিক শক্তি পরিণত হয় চিন্তা শক্তিতে। প্রকৃতিই এই সব শক্তি, বস্তু বা মন যেভাবেই প্রকাশিত হোক।

সূক্ষ্মতম মন ও স্থূলতম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধু একমাত্র মাত্রার। অতএব সমস্ত জগৎকে মন বা বস্তু বলা চলতে পারে, যেটাই বলা হোক কিছু আসে যায় না। তুমি মনকে পরিশোধিত বস্তু বলতে পার, এবং দেহকে স্থূলীভূত মন; কোন নামে কোনটা বলছ তাতে বিশেষ তফাৎ হয় না। বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিবাদের ফলে যে সব গণ্ডগোলের উৎপত্তি হয় তার কারণ হচ্ছে ভুল চিন্তাধারা। প্রকৃতপক্ষে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই। আমার ও হীনতম শুয়োবের মধ্যে প্রভেদ শুধু মাত্রার। সে কম প্রকাশিত, আমি বেশি। কখনও আমি তার চেয়ে খারাপ, সে আমার চেয়ে ভাল।

মন ও বস্তুর মধ্যে কোনটি আগে হয়েছে এ নিয়ে আলোচনা করেও লাভ নেই। মন কি প্রথমে, যার থেকে বস্তু হয়েছে? অথবা বস্তু প্রথমে, যার থেকে মন

হয়েছে? এই অসার প্রশ্ন থেকে বহু দার্শনিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এটা যেন তেমনি জিজ্ঞাসা—ডিম আগে, না মুরগী আগে? দুটিই আগে এবং দুটিই পরে—মন ও বস্তু, বস্তু ও মন। যদি আমি বলি বস্তু প্রথমে ছিল এবং তা সূক্ষ্মতম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে মন হয়েছে, তাহলে আমায় স্বীকার করতে হয় বস্তুর আগে মন নিশ্চয় ছিল। না হলে বস্তু এলো কোথা থেকে? বস্তু মনের আগে, মন বস্তুর আগে। আগাগোড়াই হচ্ছে সেই মুরগী ও ডিমের প্রশ্ন।

সমস্ত প্রকৃতি কারণের নিয়মে সীমাবদ্ধ, স্থানে ও কালে। স্থানের বাইরে আমরা কিছু দেখতে পারি না, অথচ আমরা স্থানকে জানি না। সময়ের বাইরে আমরা কিছু ধারণা করতে পারি না, অথচ আমরা সময়কে জানি না। কারণ তার সম্পর্ক ছাড়া আমরা কিছুই বুঝতে পারি না; অথচ কারণত্ব কী আমরা জানি না। এই তিনটি জিনিস—কাল, স্থান ও কারণ—প্রতিটি ঘটনায় আছে, কিন্তু তারা ঘটনা নয়। তারা যেন আকার বা ছাঁচ যাতে প্রতিটি বস্তু বোঝার আগে ঢালাই করতে হয়। বস্তু হচ্ছে পদার্থযুক্ত কাল, স্থান ও কারণ। মন হচ্ছে পদার্থসংযুক্ত কাল, স্থান ও কারণ।

এই ব্যাপারটি আর একভাবে প্রকাশ করা যায়। সব কিছুই হচ্ছে নাম ও রূপযুক্ত পদার্থ। নাম ও রূপ আসে যায়, কিন্তু পদার্থ বরাবর একই থাকে। পদার্থ, রূপ ও নাম এই কলসীটি করেছে। এটি যখন ভেঙে যায়, তখন তুমি আর একে কলসী বল না, এর কলসী রূপটিও দেখ না। পদার্থে যা কিছু পার্থক্য তা নাম ও রূপ দ্বারা সৃষ্ট। এগুলি সত্য নয়, কারণ এগুলি ধ্বংস হয়। যাকে আমরা প্রকৃতি বলি তা পদার্থ নয়, তা অপরিবর্তনশীল ও অবিনশ্বর। প্রকৃতি হচ্ছে কাল, স্থান ও কারণ। প্রকৃতি হচ্ছে নাম ও রূপ। প্রকৃতি হচ্ছে মায়া। মায়া মানে নাম ও রূপ, যাতে সব কিছুই ঢালাই করা হয়েছে। মায়া সত্য নয়। সত্য হলে তাকে আমরা ধ্বংস বা পরিবর্তন করতে পারতাম না। সত্য 'আমি' আছে, যাকে কিছুই ধ্বংস করতে পারে না, আবার বৈষয়িক 'আমি' আছে, যা সমানে পরিবর্তিত ও বিলীন হচ্ছে।

ব্যাপার হচ্ছে, বিদ্যমান সব কিছুরই দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর, অন্যটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। মানুষ তার সত্য প্রকৃতিতে পদার্থ, আত্মা, মন। এই আত্মা, এই মন অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর; কিন্তু একে দেখা যায় রূপের আবরণে এবং এক নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে। এই নাম ও রূপ সনাতন বা অক্ষয় নয়; তারা অবিরাম পরিবর্তিত হয় এবং ধ্বংস হয়। অথচ মানুষ নির্বোধের মতো এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে অমরত্ব খোঁজে দেহে ও মনে—তারা চায় এক চিরন্তন দেহ। আমি সেরকম অমরত্ব চাই না।

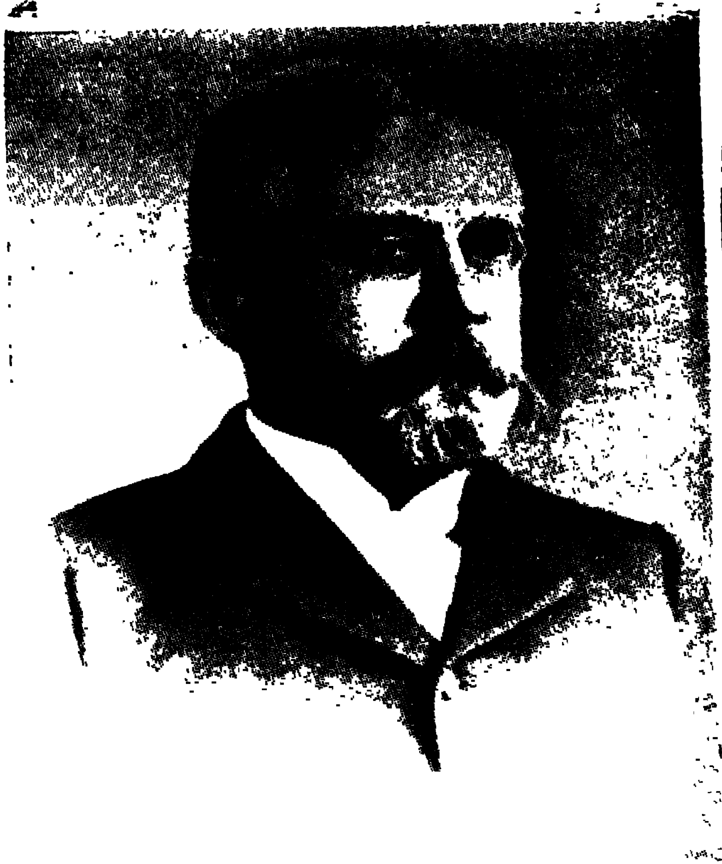
আমার ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক কী? যে পর্যন্ত প্রকৃতি নাম ও রূপ বা স্থান-কাল-কারণে অবস্থিত, আমি প্রকৃতির অংশ নই, কারণ আমি মুক্ত, আমি অমর, আমি অক্ষয় ও অনন্ত। আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি নেই প্রশ্ন ওঠে না; আমি সকল ইচ্ছার পারে। যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে কখনো মুক্তি নেই। ইচ্ছার কোন প্রকার স্বাধীনতা নেই। যেটি ইচ্ছা হয়, সেটি যখন নাম ও রূপের কবলে পড়ে তখন তাদের ক্রীতদাস হয়ে যায়। সেই পদার্থ—আত্মা—যেটি ছাঁচ ছিল, সেটি যখন নাম ও রূপে ঢালাই হয়, তখনই বদ্ধ হয়ে পড়ে, অথচ সেটি আগে মুক্ত ছিল। অথচ এর মৌলিক প্রকৃতি তখনও

রয়েছে। সেজন্যই সে বলে, 'আমি মুক্ত, এই সব বন্ধন সত্ত্বেও আমি মুক্ত।' আর এটি সে কখনও ভোলে না।

কিন্তু যখন আত্মা সংকল্পে পরিণত হয়, তখন আর তা প্রকৃত মুক্ত নয়। প্রকৃতি দড়ি টানে এবং প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী তাকে নাচতে হয়। এইভাবে তুমি ও আমি বছরের পর নেচে আসছি। যা কিছু আমরা দেখি, করি, অনুভব করি, জানি, আমাদের সব চিন্তা ও কাজ, প্রকৃতির আজ্ঞানুযায়ী নৃত্য ছাড়া কিছু নয়। এর মধ্যে কোন স্বাধীনতা কোন কালে ছিল না, কোন কালে নেই। সর্ব নিম্ন থেকে সর্ব উচ্চ পর্যন্ত সকল চিন্তা ও কার্য নিয়মের অধীন, এবং এর কোনটিই আমাদের প্রকৃত সত্তার অংশ নয়।

আমার প্রকৃত সত্তা সব নিয়মের পারে। দাসত্বের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে সুর মেলালে তুমি নিয়মের অধীনে থাকবে, নিয়মের অধীনেই তুমি সুখী। কিন্তু প্রকৃতিকে যতই মেনে নেবে, সে যত তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে, ততই তুমি বদ্ধ হবে; যতই তুমি অজ্ঞতার সঙ্গে তাল রাখবে, ততই তুমি বিশ্বের সব কিছুর অধীন হবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই মিল, নিয়মের প্রতি এই বাধ্যতা, মানুষের সত্য প্রকৃতি ও মানুষের লক্ষ্যের সঙ্গে কি সামঞ্জস্যকর? কোন খনিজ পদার্থ কোন নিয়মের বিরুদ্ধাচার কখনও করেছে? কোন বৃক্ষ বা উদ্ভিদ নিয়মকে অমান্য করেছে? এই টেবিলটার প্রকৃতির সঙ্গে, নিয়মের সঙ্গে মিল আছে, তাই এটা সর্বদা টেবিলই থাকে, এটা এর চেয়ে উন্নত হয় না। মানুষ সংগ্রাম করতে শুরু করে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে। সে অনেক ভুল করে, কষ্ট পায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে প্রকৃতিকে জয় করে এবং মুক্তিলাভ করে। যখন সে মুক্ত হয় তখন প্রকৃতি তার দাস হয়।

বন্ধন সম্পর্কে আত্মার সচেতনতা এবং নিজের স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা—একেই জীবন বলা হয়। এই সংগ্রামের সাফল্যকে বলা হয় ক্রমবিকাশ। সব দাসত্ব যখন ক্ষয় হয়, বিজয়াবস্থাকে বলা হয় মুক্তি, নির্বাণ, স্বাধীনতা। বিশ্বের সব কিছুই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। যখন আমি প্রকৃতি দ্বারা, নাম ও রূপ দ্বারা, স্থান-কাল-কারণ দ্বারা বদ্ধ, তখন আমি জানি না আমি প্রকৃত কী। কিন্তু এমন কি এই বন্ধনের মধ্যেও আমার প্রকৃত সত্তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। বন্ধনের বিরুদ্ধে আমি প্রয়াস করি, একটি একটি করে তা ছিন্ন হয় এবং আমি আমার অন্তর্নিহিত বিরাটত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই। তারপর আসে সম্পূর্ণ মুক্তি। আমি নির্মলতম ও পূর্ণতম জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হই—আমি বুঝি আমি অনন্ত আত্মা, প্রকৃতির কর্তা, তার দাস নয়। সর্বপ্রকার বিভেদ ও সংযুক্তির পারে, স্থান-কাল-কারণের অতীত, আমি সেই, আমিই সেই।



শ্রীজর্জ এইচ. হেল



শ্রীমতী হেল



হেল ভগিনীরা
বাম দিক থেকে : হ্যারিয়েট ম্যাক ক্যাইণ্ডলি, মেরি হেল, ইসাবেল ম্যাককাইণ্ডলি, হ্যারিয়েট হেল

কয়েকটি প্রবন্ধ

ধর্মের প্রায় অন্যান্য সকল ভাবকে সেই সময়ের জন্য পরিত্যাগ করে আর্ত জগৎকে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম, এটিকেই বুদ্ধদেব প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবুও তাঁকে আত্ম-অনুসন্ধানে বহু বৎসর কাটাতে হয়েছিল স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্তি সম্পূর্ণ অসার, এই সত্যটি উপলব্ধি করার জন্য। তাঁর চেয়ে নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্মীর ধারণা করতে আমাদের প্রবলতম কল্পনাশক্তিও অক্ষম; তবুও সব বিষয়ের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে তার চেয়ে বেশি কঠোর সংগ্রাম আর কাকে করতে হয়েছিল? এটি সব সময়ে সত্য যে, কাজটি যত বড় হয়, তার পিছনে উপলব্ধির শক্তিও তত বেশি। আগে থেকে প্রস্তুত এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার খুঁটিনাটিকে কার্যে পরিণত করার জন্য খুব বেশি একাগ্র চিন্তার প্রয়োজন না হতে পারে, কিন্তু একমাত্র গভীর চিন্তাই পরিণত হতে পারে বৃহৎ উদ্দীপনায়। সামান্য প্রচেষ্টার জন্য শুধু মতবাদই যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু যে বেগ ছোট ঢেউ সৃষ্টি করে তার থেকে তরঙ্গ উৎপন্নকারী বেগ খুবই পৃথক; তবুও ওই ক্ষুদ্র ঢেউটি হচ্ছে তরঙ্গ উৎপাদনকারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশেরই রূপ।

তথ্যগুলি, নগ্ন তথ্যগুলি কঠোর ও ভয়ংকর হতে পারে; সত্য, নগ্ন সত্য, তার স্পন্দনে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী ছিন্ন করতে পারে; আন্তরিক ও অকপট প্রেরণা, যদিও তা লাভ করতে একটির পর একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে হয়—এই তথ্য, সত্য, প্রেরণা সন্ধান করতে হবে, লাভ করতে হবে মন নিম্নতর কর্মভূমিতে বিরাট কর্ম-তরঙ্গ তোলার আগে। সূক্ষ্ম বস্তু কালপ্রবাহে আবর্তিত হতে হতে নিজের চারধারে স্থূলবস্তু জমা করে ব্যক্ত হয়, অদৃশ্য দৃশ্যে পরিণত হয়, সম্ভব বাস্তব হয়ে ওঠে, কারণ কার্যে এবং চিন্তা—পেশীর কর্মে।

হাজার রকম পরিবেশ যে কারণকে এখন ব্যক্ত হতে দিচ্ছে না, শিগ্‌গির বা দেরীতে, তা কার্যে রূপায়িত হবে এবং সুপ্ত চিন্তা, বর্তমানে যত শক্তিহীন হোক না কেন, জড়জগতের কর্মক্ষেত্রে তার একসময় গৌরবের দিন আসবে। সেই আদর্শ যথার্থ নয়, যা সর্ববস্তুর বিচার করে আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখ প্রদানের ক্ষমতার দ্বারা।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, সে ততই ইন্দ্রিয় সুখে আনন্দ পায়, ততই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাস করে। সভ্যতার, প্রকৃত সভ্যতার, অর্থ হচ্ছে পশুপ্রকৃতির মানুষকে তার ইন্দ্রিয়ের জীবন থেকে টেনে বের করে আনার শক্তি—তাকে উচ্চতর দৃশ্য দেখিয়ে ও সেখানকার আনন্দের স্বাদ দিয়ে, বাহ্যিক জগতের আরাম দিয়ে নয়।

মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে এটি জানে। সে সকল অবস্থাতে নিজে এটি স্পষ্টভাবে না বুঝতেও পারে। সে হয়তো ভাবময় জীবন সম্বন্ধে খুবই ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। কিন্তু এটি থাকেই, সব কিছু সত্ত্বেও এটি আত্মপ্রকাশের জন্য চাপ দেয়; তাই বাজিকর, চিকিৎসক, ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত বা বিজ্ঞানের অধ্যাপককেও সে সম্মান করে। মানুষের উন্নতির পরিমাপ শুধু করা যায়, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়িয়ে তার উচ্চতর ভূমিতে বাস করার শক্তি দ্বারা, তার ফুসফুস কতটা

বিশুদ্ধ ভাবের হাওয়া নিতে পারে তার দ্বারা এবং কতটা সময় এই উচ্চাবস্থায় থাকতে পারে তার দ্বারা।

এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মার্জিতরুচির মানুষ জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু ছাড়া তথাকথিত আরামের জন্য সময় ব্যয় করতে অনিচ্ছুক এবং যতই তাঁরা উন্নত হতে থাকেন, ততই দরকারী কাজগুলিতেও তাঁদের উৎসাহ কমতে থাকে।

এমনকি বিলাসিতাও মানুষের ভাব ও আদর্শ অনুযায়ী হয়। তাঁদের চিন্তার জগৎ যতটা সম্ভব তাঁদের বিলাসের উপকরণগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয় তাই করেন—এবং এটাই হচ্ছে জীবনশিল্প।

'যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হয়ে নানা রূপে প্রকাশ পায়, অথচ যতটা ব্যক্ত হয়েছে তারচেয়ে সে অনেক বেশি'—হ্যাঁ, অনন্তগুণ বেশি! এক কণা, সেই অনন্ত চিন্তার শুধু এক কণা মাত্র আমাদের সুখ বিধানের জন্য জড় জগতে অবতরণ করতে পারে,—তার বাকি অংশকে স্থূল হস্তে ব্যবহার করা চলে না। সেই পরম সূক্ষ্ম, সর্বদা আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে থাকে এবং তাকে টেনে নামাবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা দেখে হাসে। এক্ষেত্রে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে এবং 'না' বলা চলে না। মানুষ নিজেকে সেই উচ্চস্তরে উন্নত করবে, যদি সেই উন্নত ভূমির সৌন্দর্যরাশি উপভোগ করতে চায়, তার আলোকধারায় স্নান করতে চায়, সেই জগৎ-কারণের সঙ্গে তার জীবন একই ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে তা অনুভব করতে চায়।

জ্ঞানই বিস্ময়কর রাজ্যের দ্বার খুলে দেয়, জ্ঞান পশুকে দেবতা করে; যে জ্ঞান আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যায়, 'যাঁকে জানলে সব কিছু জানা হয়' (যিনি সকল জ্ঞানের হৃদয়স্বরূপ—যাঁর স্পন্দনে সকল বিজ্ঞান প্রাণ পায়—সেই ধর্মবিজ্ঞান), সেই জ্ঞান নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম, কারণ সেটিই মানুষকে পূর্ণ করে এবং ধ্যানময় জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলে। সেই দেশই ধন্য, যে দেশ একে 'পরম জ্ঞান' নামে অভিহিত করে।

কর্মজীবনে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে প্রায়ই দেখা যায় না, তবুও আদর্শটি কখনও নষ্ট হয় না। একদিকে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আদর্শ থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত না হওয়া, তা আমরা তার দিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে অগ্রসর হই বা অনুভবনীয় গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোই; অন্যদিকে সত্য হচ্ছে যে এটি সর্বদাই আমাদের সম্মুখে ভাস্বর—যদিও আমরা চোখে হাত দিয়ে তার জ্যোতিকে ঢেকে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

কর্মজীবনের প্রাণ হচ্ছে আদর্শ। আদর্শই আমাদের সারা জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তা আমরা দার্শনিক বিচারই করি বা প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর কর্তব্য সম্পাদন করি। আদর্শের রশ্মিধারা সরল বা বক্র নানা রেখায় প্রতিবিম্বিত ও পরিবর্তিত হয়ে প্রতিটি রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তারই আলোকে প্রতিটি কার্য সম্পন্ন করতে হয়; প্রতিটি বস্তুই দেখা যায় তার দ্বারা পরিবর্তিত, উন্নত বা বিকৃত। আমরা বর্তমানে যা হয়েছি, আদর্শই আমাদের তা

করেছে এবং ভবিষ্যতে যা হবো, সেটিও আদর্শ করবে। আদর্শের শক্তিই আমাদের আচ্ছাদিত করে রেখেছে এবং আমাদের সুখে দুঃখে, আমাদের বড় বা ছোট কাজে, আমাদের পাপে-পুণ্যে এটি অনুভূত হয়ে থাকে।

যদি কর্মজীবনের উপর আদর্শের এমন ধারা প্রভাবিত হয়, তবে কর্মজীবনও আদর্শ গঠনে কম শক্তিমান নয়। আদর্শের সত্য কর্মেই। আদর্শের পরিণতি কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবে। আদর্শ থাকলেই প্রমাণিত হয় যে, কোন না কোন স্থানে, কোন না কোন রূপে এটি কর্মজীবনেও পরিণত হয়েছে। আদর্শ বৃহত্তর হতে পারে, কিন্তু সেটি কর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি ও সামান্যীকরণ।

কর্মজীবনেই আদর্শের শক্তি। কর্মজীবনের মাধ্যমেই এটি আমাদের উপর ক্রিয়া করে। কর্মজীবনের মাধ্যমে আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণোপযোগী আকারে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে নেমে আসে। কর্মজীবনকে সোপান করে আমরা আদর্শে আরোহণ করি। তার উপরই আমাদের যত কিছু আশা গড়ে তুলি ; এটিই আমাদের কাজে সাহস জোগায়।

(যাদের বাক্যরাশি আদর্শকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে পারে ও সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি উদ্ঘাটন করতে পারে, এমন বহু ব্যক্তির চেয়ে যে আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছে, এমন একজন মানুষ অনেক বেশি শক্তিমান।)

দর্শনের মতবাদগুলি মানব জাতির কাছে অর্থহীন কিংবা শুধুমাত্র বুদ্ধির ব্যায়াম বলে বিবেচিত হতো, যদি না তারা ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হতো এবং অল্প-বিস্তর সাফল্যের সঙ্গে কর্মজীবনে সেগুলিকে টেনে আনার জন্য একদল সংগ্রামশীল লোক না পেত। এমন কি যে সব মতবাদ কোন সার্থক আশাও জাগ্রত করে না, কিছু লোক সেই মতবাদ গ্রহণ করেও খানিকটা কার্যে পরিণত করতে পারে এবং তার সমর্থনের জন্য বহু লোক পায়। এর অভাবে বহু ব্যাখ্যাত নিশ্চিত মতবাদও লোপ পেয়েছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই কর্মের সঙ্গে আমাদের ভাবময় জীবনের সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। (আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে হয় গভীর ভাবে চিন্তা করলে কর্মের শক্তি হারিয়ে ফেলে, আবার যদি বেশি কাজ করে তাহলে গভীর চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। এই কারণে অনেক বড় চিন্তাবিদ্ তাঁদের মহৎ আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করার ভার সময়ের উপরই ছেড়ে দেন। তাঁদের চিন্তাধারাকে অপেক্ষা করতে হয় আরও ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের জন্যে, যে সেগুলিকে কার্যে পরিণত করবে ও প্রচার করবে। তবুও, এই লেখার সময়, আমরা যেন দিব্যদৃষ্টিতে সেই পার্থসারথিকে দেখছি, যিনি উভয়পক্ষে বিরোধী সৈন্যদলের মাঝে তাঁর রথে দাঁড়িয়ে বামহস্তে তেজস্বী ঘোড়াগুলিকে সংযত করছেন—বর্মপরিহিত যোদ্ধা, যাঁর শ্যেনদৃষ্টি বিরাট সৈন্যদলকে নিরীক্ষণ করছে এবং যেন সহজাত জ্ঞানের দ্বারা উভয়পক্ষের সৈন্যসজ্জার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিচার করছেন—সেই সঙ্গে আমরা যেন শুনছি, ভয়ত্রস্ত অর্জুনকে বিস্মিত করে তাঁর মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে কর্মের সবচেয়ে আশ্চর্যকর রহস্য :—'যিনি

কর্মের মধ্যে বিশ্রাম এবং বিশ্রামের মধ্যে কর্মকে দেখেন, মানুষদের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্মের কর্তা।' (গীতা-৪।১৮)

এটিই পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু খুব কম লোকই এই আদর্শে পৌঁছায়। তাই যেমনটি আছে, আমাদের তেমনটি নিতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন মানবীয় পূর্ণতাকে একত্রে গ্রথিত করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ধার্মিক লোকদের মধ্যে আমরা পাই তীব্র চিন্তাশীল মানুষ, লোকের হিতের জন্য প্রবল কর্মানুষ্ঠানকারী মানুষ, সাহসী আত্ম-উপলব্ধিকারী মানুষ ও শান্ত বিনয়ী মানুষ।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছেন এক অদ্ভুত বিনয়ী ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন মানুষ।

বারানসীর গুঞ্জির কাছে এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশের শেষজীবনে পওহারীবাবা নামে অভিহিত মানুষটি জন্মেছিলেন। অতি বাল্যকালে তাঁর কাকার কাছ থেকে লেখাপড়া শেখার জন্য তিনি গাজিপুরে এসেছিলেন। বর্তমানকালে হিন্দু সাধুরা এই কটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী। সন্ন্যাসীরা শংকরাচার্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী; যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তবুও বিভিন্ন যোগ প্রণালীতে সাধন দক্ষ; বৈরাগীরা রামানুজাচার্য ও অন্যান্য দ্বৈতবাদীদের অনুগামী শিষ্য; পন্থীরা দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয় প্রকার মতকেই অনুসরণ করে এবং তাদের সম্প্রদায়গুলি মুসলমান রাজত্বের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পওহারী বাবার কাকা রামানুজ বা শ্রী-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আজীবন অবিবাহিত থাকবেন এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। গাজিপুরের দু' মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে তাঁর একখণ্ড জমি ছিল এবং তিনি সেখানেই বাস করতেন। তাঁর অনেকগুলি ভাইপো থাকায় পওহারী বাবাকে নিজের বাড়িতে এনে পোষ্যপুত্র করেছিলেন, তাঁকেই তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ও সামাজিক পদমর্যাদার উত্তরাধিকারী বলে মনস্থ করেছিলেন।

পওহারী বাবার এই সময়কার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য পরবর্তীকালে তিনি অমন বিখ্যাত হয়েছিলেন, তার কোন লক্ষণও বোধ হয় তখন দেখা যায় নি। লোকের এইটুকু মনে আছে যে, ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের তিনি এক মনোযোগী ছাত্র ছিলেন এবং এক প্রাণবন্ত সক্রিয় বালক ছিলেন, যার রঙ্গপ্রিয়তা মাঝে মাঝে সহপাঠীদের উপর রূঢ় মজাদার ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো।

এইভাবে সেকালের ভারতীয় ছাত্রদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে ভাবী সাধকের বাল্যজীবন কাটল; (তাঁর লেখাপড়ায় অসাধারণ অনুরাগ ও ভাষা শিক্ষায় অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সেই সরল সদানন্দ ক্রীড়াশীল ছাত্রজীবনে এমন কিছু দেখা যায়নি, যা তাঁর ভাবী জীবনের সেই প্রচণ্ড আন্তরিকতার পূর্বাভাস দেয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছিল এক অদ্ভুত ও ভয়ানক ত্যাগে।)

এই সময় এমন এক ঘটনা ঘটল, যাতে এই যুবক পণ্ডিত বোধহয় এই প্রথম বুঝলেন জীবনের গভীর মর্ম; এতদিন তাঁর দৃষ্টি পুস্তকে আবদ্ধ ছিল, সেখান থেকে সেটি তুলে তিনি নিজের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন এবং পুঁথির বাইরে ধর্মে

প্রকৃত সত্য আছে কিনা তা জানার জন্যে ব্যাকুল হলেন। তাঁর কাকা মারা গেলেন; তরুণ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা যে মানুষটির উপর ছিল তিনি চলে গেলেন। তখন সেই উদ্দাম যুবক হৃদয়ের গভীরে শোকের আঘাত পেয়ে সংকল্প করল যে ওই শূন্য হৃদয় পূর্ণ করার জন্য এমন কিছু খুঁজে বের করবে যার কোন পরিবর্তন নেই।

ভারতে সকল বিষয়ের জন্য আমাদের একজন গুরুর দরকার। (আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি যে বইতে শুধুমাত্র আভাস থাকে। সব শিল্পের, সব বিজ্ঞানের, সবার উপরে ধর্মের জীবন্ত-রহস্যগুলি গুরুর কাছ থেকে শিষ্য প্রাপ্ত হয়।) স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে ঈশ্বর-অনুরাগীরা অন্তর্জীবনের রহস্য নির্বিঘ্নে মনন করার জন্য সর্বদা লোকালয় পরিত্যাগ করে নিভৃত স্থানে বাস করেছেন, এমন কি আজও একটি বন, পর্বত বা পবিত্র স্থান নেই, যাকে কোন না কোন মহাত্মার বাসস্থান বলে কিংবদন্তী মহিমান্বিত করেনি।

এই কথাটি সকলেই জানে—

'রমতা সাধু, বহতা পানি,
যঁহ কভি না মৈল লখানি।'

নিয়ম অনুসারে ভারতে যাঁরা ব্রহ্মচর্য আচরণ করে ধর্মজীবন গ্রহণ করেন, তাঁরা ভারত উপ-মহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করে বিভিন্ন তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করে তাঁদের জীবনের অধিকাংশ কাটিয়ে থাকেন,—এইভাবে তাঁরা নিজেদের জীবনে মরচে ধরান না এবং সেই সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ধর্মভাব নিয়ে যান। যাঁরা সংসার ত্যাগ করেছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই ভারতের চার কোণে অবস্থিত চারটি প্রধান তীর্থ দর্শন করা অবশ্য প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা হয়।

এই সব বিবেচনাই বোধ হয় আমাদের যুবক ব্রহ্মচারিকে প্রভাবিত করেছিল, তবে আমরা নিশ্চিত যে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে জ্ঞানতৃষ্ণা। তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানি, তবে তাঁর সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত, সেই দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে তাঁর জ্ঞান দেখে এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণবদের প্রাচীন বাংলা ভাষার সঙ্গে তার ব্যাপক পরিচয় দেখে আমরা অনুমান করি দাক্ষিণাত্য ও বাংলায় তাঁর বাস খুব অল্পদিন হয়নি।

কিন্তু একটি স্থানে তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর যৌবনের বন্ধুরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, কাথিয়াওয়াড়ে গিরনার পর্বতের চূড়ায় তিনি যোগসাধনার রহস্যে প্রথম দীক্ষালাভ করেন।

এই পর্বতটি বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। এই পর্বতের পাদদেশে এক বিরাট শিলায় সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক অশোকের সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অনুশাসন খোদিত আছে। এর নীচে শত শত শতাব্দীর বিস্মরণের অন্ধকারে জঙ্গলে ঢাকা বিরাট স্তূপমালা লুকিয়ে ছিল, যেগুলিকে অনেক দিন ধরে গিরনার পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত ছোট ছোট পাহাড় বলে মনে করা হতো। বৌদ্ধধর্ম এখন যে সম্প্রদায়ের সংশোধিত সংস্করণ বলে মনে করা হয়, সেই সম্প্রদায় আজও একে কম পবিত্র মনে করেন না এবং আশ্চর্যের বিষয় ওই ধর্মের জগৎ-জয়ী উত্তরাধিকারী আধুনিক হিন্দু

ধর্মে মিশে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সাহস করে স্থাপত্যক্ষেত্রে জয়লাভের চেষ্টা করেনি। মহান অবধূতগুরু দত্তাত্রেয়ের পবিত্র বাসভূমি বলে গিরনার হিন্দুদের মধ্যে বিখ্যাত এবং কিংবদন্তী আছে যে ভাগ্যবান লোকেরা এখনও এই পর্বতের চূড়ায় বড় বড় সিদ্ধযোগীর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকে।

তারপর আমরা দেখতে পাই আমাদের তরুণ ব্রহ্মচারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বারাণসীর কাছে গঙ্গাতীরে এক যোগসাধক সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়া, যিনি নদীর উঁচু পাড়ে একটি গর্ত খুঁড়ে বাস করতেন। বুঝতে পারা যায় এই যোগীর কাছ থেকে আমাদের সাধক শিখেছিলেন গাজিপুরের কাছে গঙ্গার পাড়ের জমিতে এক গভীর গহ্বর তৈরি করে তার মধ্যে বাস করা। যোগীরা সর্বদা উপদেশ দিয়েছেন গুহায় বা যেখানকার আবহাওয়ায় কোন পরিবর্তন হয় এবং যেখানে কোন শব্দ মনকে বিচলিত করতে পারে না, এমন জায়গায় বাস করতে। আমরা আরও জানতে পারি যে, তিনি প্রায় এই সময়েই বারাণসীতে এক সন্ন্যাসীর কাছে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করেছিলেন।

বহু বছর ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও সাধনার পর এই তরুণ ব্রহ্মচারী যেখানে মানুষ হয়েছিলেন সেখানে ফিরে এলেন। যদি তাঁর কাকা বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ এই বালকের মুখে সেই জ্যোতি দেখতে পেতেন যা পুরাকালে এক মহান ঋষি তাঁর শিষ্যের মুখে দেখতে পেয়ে বলে উঠেছিলেন,—'বৎস, ব্রহ্মজ্যোতিতে আজ তোমার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত দেখছি।' কিন্তু যাঁরা তাঁকে গৃহে স্বাগত জানালেন, তাঁরা তাঁর সেই বাল্যকালের সঙ্গী—যাঁদের সকলেই সংসারে প্রবেশ করেছিলেন এবং চিরকালের জন্য বাঁধা পড়েছিলেন, যে সংসারে চিন্তার পরিসর অল্প ও খাটুনি অনন্ত।

তবু সেই সহপাঠী ও খেলার সাথীর—যাঁকে তাঁরা বুঝতে অভ্যস্থ ছিলেন—এক পরিবর্তন, রহস্যময় ও তাঁদের কাছে ভীতিজনক পরিবর্তন তাঁরা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু এটি তাঁদের মনে তাঁর মতো হবার বাসনা বা তাঁর মতো জ্ঞানান্বেষণের ইচ্ছা জাগাল না। তাঁরা দেখলেন এ এক রহস্যময় মানুষ, যিনি এই যন্ত্রণাজড়িত ও জড়বাদের জগতের পারে চলে গিয়েছেন, এবং ওই পর্যন্তই। তাঁরা স্বভাবতই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন না।

ইতিমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বগুলি আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল। বারাণসীতে তাঁর গুরু যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি এক মাটিতে এক গুহা খনন করলেন এবং তার মধ্যে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলেন। তারপর আহার সম্বন্ধে অতি কঠোর সংযম শুরু করলেন। সারাদিন নিজের ছোট আশ্রমটিতে কাজ করতেন, তার প্রেমাস্পদ রামচন্দ্রের পূজা করতেন, ভাল খাদ্য রান্না করতেন—শোনা যায় রন্ধনশিল্পে তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন—ঠাকুরকে নিবেদিত সমস্ত প্রসাদ বন্ধুবান্ধব ও দরিদ্রদের বিলিয়ে দিতেন এবং রাত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সেবা করতেন এবং যখন তারা শুতে যেতেন, তখন এই যুবক লুকিয়ে সাঁতার কেটে গঙ্গার অপর পারে যেতেন। সেখানে সারারাত সাধনভজনে কাটাতেন, ভোরের আগে ফিরে এসে

বন্ধুদের জাগাতেন এবং আবার নিত্যকর্ম শুরু করতেন, ভারতে এই কাজকে আমরা 'অন্যের সেবা বা পূজা' বলে থাকি।

ইতিমধ্যে তাঁর নিজের খাওয়া কমে আসতে লাগল, আমরা শুনেছি শেষে তা এসে দাঁড়িয়েছিল দিনে এক মুঠো তেতো নিমপাতা বা কয়েকটা লংকায়। তারপর তিনি রাতে গঙ্গার অপর তীরে যাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং নিজের গুহায় আরও বেশি থাকতে লাগলেন। আমরা শুনেছি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি গুহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটিয়ে তারপর বাইরে আসতেন। কেউ জানে না এই দীর্ঘকাল তিনি কী খেয়ে কাটাতেন, সেইজন্য লোকে তাঁকে বলত 'পওহারী' (বা হাওয়া-খাওয়া) বাবা।

তিনি জীবনে আর কখনও এই স্থান ত্যাগ করেননি। যাহোক, একবার তিনি এত দীর্ঘকাল ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে লোকে ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু অনেক দিন পরে বাবা আবার বেরিয়ে এলেন এবং বহুসংখ্যক সাধুকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

যখন ধ্যানমগ্ন থাকতেন না, তখন তিনি গুহার মুখের ওপর এক কুটিরে বাস করতেন এবং সেই সময়ে আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গাজিপুরের অহিফেন-বিভাগের রায় গগনচন্দ্র বাহাদুর—যে ভদ্রলোক স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও ধর্মপ্রবণতার জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন—আমাদের এই মহাত্মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

ভারতের আরও অনেক মহাত্মার মতো এই জীবনেও চমকপ্রদ বা চাঞ্চল্যকর বাহ্যিক কাজ কিছু ছিল না। 'বাক্যের দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শিক্ষা' এই ভারতীয় আদর্শের এটি আর একটি দৃষ্টান্ত এবং সত্য সেই জীবনেই ফল প্রসব করে যে তা গ্রহণে প্রস্তুত হয়েছে। এই ধরনের মানুষেরা যা জানেন তা প্রচার করতে সম্পূর্ণ বিমুখ, কারণ তাঁদের দৃঢ় ধারণা এই যে সাধনা দ্বারাই একমাত্র সত্য লাভ হয়, বাক্যের দ্বারা নয়। ধর্ম তাঁদের কাছে সামাজিক আচরণের প্ররোচক নয়, সেটি হচ্ছে সত্যের জন্য তীব্র অনুসন্ধান ও এই জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করা। তাঁরা অস্বীকার করেন যে একটি মুহূর্তের চেয়ে অন্য মুহূর্তের বেশি ক্ষমতা আছে এবং অনন্তকালের প্রতিটি মুহূর্ত অন্য মুহূর্তের সঙ্গে সমান বলে তাঁরা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে এখানেই এবং এখুনি ধর্মের সত্যগুলির মুখোমুখি হওয়ার উপর জোর দিয়ে থাকেন।

বর্তমান লেখক এক সময় এই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, জগতে কল্যাণের জন্য তাঁর গুহা থেকে বেরিয়ে না আসার কারণ কি? প্রথমে তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয় ও রসিকতার সঙ্গে নিম্নলিখিত দৃঢ় উত্তরটি দিয়েছিলেন—

'কোন লোক এক অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এবং শাস্তিস্বরূপ তার নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল। নিজের নাককাটা রূপ জগৎকে কেমন করে দেখাবে এই ভেবে সে খুবই হতাশ হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে যখনই কেউ আসছে বলে তার মনে হতো, তখনই মাটিতে এক বাঘের চামড়া পেতে সে গভীর ধ্যানের ভান করত। তার এই আচরণে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার বদলে দলে দলে

কাছে টেনে আনত অদ্ভুত সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। সে দেখল তার অরণ্য জীবন আবার তাকে সহজে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিল। এইভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। অবশেষে স্থানীয় অধিবাসীরা এই মৌনী ধ্যানী সাধুর কাছ থেকে কিছু উপদেশ পেতে খুব আগ্রহী হয়ে উঠল, বিশেষ করে এক যুবক তার কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যাকুল হলো। শেষে এমন অবস্থা হলো যে আর কালক্ষেপ করলে সাধুর প্রতিষ্ঠা লোপ পাবে। তখন সে একদিন মৌনব্রত ভঙ্গ করে সেই উৎসাহী যুবককে বলল যে পরদিন সকালে একটা ধারাল ক্ষুর আনতে। যুবকটি তার জীবনের প্রধান বাসনা এত শিগ্‌গির পূর্ণ হবে এই আনন্দে পরদিন ভোরেই এক ক্ষুর নিয়ে এল। নাককাটা সাধু তাকে জঙ্গলের একান্তে নিয়ে গেল, ক্ষুরটা হাতে নিয়ে খুলল এবং এক আঘাতে তার নাক কেটে দিয়ে গভীর ভাবে বলল, 'হে যুবক, আমি এইভাবে এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়েছি। সেই দীক্ষাই তোমায় দিলাম। তুমিও সুযোগ পেলেই তৎপর হয়ে অন্যদের এই দীক্ষা দিতে থাক!' যুবকটি লজ্জায় তার অদ্ভুত দীক্ষার রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করতে পারল না এবং সাধ্যানুসারে গুরুর আদেশ পালন করতে লাগল। এই ভাবে নাক কাটা সাধু-সম্প্রদায় দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তুমি কি চাও আমি এই ধরনের এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হই?'

পরে আর একবার জিজ্ঞাসা করায় অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, 'তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? এটা কি সম্ভব নয় যে, দেহের ক্রিয়া ছাড়াই একটি মন অপর মনকে সাহায্য করতে পারে?'

অন্য এক সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বড় যোগী হয়েও নবীন সাধকদের উপযোগী হোম ও শ্রীরঘুনাথজীর মূর্তি পূজা ইত্যাদি কর্ম কেন করেন? জবাব পাওয়া গিয়েছিল, 'তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে সকলে নিজের কল্যাণের জন্য কর্ম করে? একজন কি অপরের জন্য কর্ম করতে পারে না?'

তারপর সকলেই সেই চোরের কথা শুনেছেন, যে আশ্রমে চুরি করতে এসেছিল এবং সাধুকে দেখে ভয় পেয়ে চোরাই মালের পোঁটলা ফেলে রেখে দৌড় মারে। সাধু সেই পোঁটলা নিয়ে চোরের পিছনে মাইল খানেক দ্রুত দৌড়ে তাকে ধরে ফেলে পোঁটলা তার পায়ের কাছে রেখে হাত জোড় করে সজল নয়নে তার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং সেগুলি গ্রহণ করার জন্য তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন, কারণ চোরাই মালগুলি চোরেরই, তাঁর হলেও তিনি তাঁর অধিকারী নন।

আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আরও শুনেছি যে একবার তাঁকে গোখ্‌রো সাপে কামড়ায়, কয়েক ঘণ্টার জন্য সকলে তাঁকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু তিনি সামলে ওঠেন, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু বলেন যে, ওই গোখ্‌রো সাপটি 'তাঁর প্রিয়তমের দূত।'

আমরা এই কাহিনী ভালভাবেই বিশ্বাস করতে পারি, কারণ আমরা জানি তাঁর স্বভাবের পরম শান্তভাব, বিনয় ও প্রেম। সবরকম দৈহিক পীড়াই তাঁর কাছে ছিল

শুধু 'প্রেমাস্পদের কাছ থেকে আসা দূত'। এমন কি অন্যেরা ওইগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করছে এটা শোনাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এমন কি নিজে সেগুলি থেকে যন্ত্রণা ভোগ করলেও। এই নীরব প্রেম ও কোমলতার ভাব চারধারের লোকদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল এবং যাঁরা আশপাশের পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরাই এই অদ্ভুত ব্যক্তির নীরব প্রভাবের সাক্ষ্য দিতে পারেন। শেষের দিকে তিনি আর কাউকে দেখা দিতেন না। যখন তাঁর মাটির নিচের আবাস থেকে উঠে আসতেন, তখন লোকের সঙ্গে কথা বলতেন, কিন্তু বন্ধ দ্বারের পিছন থেকে। গুহার ভেতর থেকে উঠে এসেছেন তা বোঝা যেত হোমের আগুন থেকে ওঠা ধোঁয়া দেখে ও পূজার আয়োজনের শব্দে।

তাঁর বহু মহৎ বিশেষত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে যখন যে কাজে হাত দিতেন, তা সে যত তুচ্ছই হোক, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। শ্রীরঘুনাথজীর পূজায় তিনি যেমন যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটা তামার পাত্র মাজতেও ঠিক তাই করতেন। কর্মের রহস্য সম্বন্ধে তিনি একবার আমাদের যা বলেছিলেন, তার সার্থক দৃষ্টান্ত হচ্ছে তিনি নিজেই: 'সিদ্ধির উপায়কে এমন ভাবে আদর-যত্ন করবে যেন সেটাই সিদ্ধি।'

তাঁর বিনয় কোনরূপ দুঃখ যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিপূর্ণ ছিল না। এটি স্বভাবতই সেই উপলব্ধির থেকে প্রকাশ পেয়েছিল, সেটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি একবার আমাদের বলেছিলেন, 'হে রাজা, ভগবান সর্বহারার ধন,—হ্যাঁ, তাদেরই, যারা কোন কিছু অধিকারের সব বাসনা ত্যাগ করেছে, এমন কি নিজের আত্মা সম্পর্কেও তাই।' তিনি সাক্ষাৎভাবে কোন উপদেশ দিতেন না, কারণ তাহলে শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হতো এবং অন্যের চেয়ে নিজেকে উচ্চস্থানে বসাতে হতো। কিন্তু একবার তাঁর হৃদয় প্রস্রবণ খুলে গেলে তার থেকে অনন্ত জ্ঞানবারি উৎসারিত হতো, তবুও উত্তরগুলি সর্বদা পরোক্ষভাবে দেওয়া হতো।

তিনি আকারে দীর্ঘ ও একটু মোটা ছিলেন, মাত্র একটি চোখ তাঁর ছিল এবং প্রকৃত-বয়সের চেয়ে অনেক তরুণ দেখাত। তাঁর মতো মধুর কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনিনি। জীবনের শেষ দশটি বছর বা তার বেশি তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ঘরের দরজার পিছনে কয়েকটা আলু ও একটু মাখন রেখে দেওয়া হতো, যখন তিনি গর্তের উপরে সমাধিতে থাকতেন না, তখন রাতে সেগুলি গ্রহণ করতেন। গুহার মধ্যে থাকলে সেগুলিরও দরকার হতো না। এইভাবে যোগ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এই নীরব জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল এবং পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জীবন্ত এক উদাহরণ।

আমরা আগেই বলেছি ধোঁয়া দেখলেই বোঝা যেত তিনি সমাধি থেকে উঠে এসেছেন। একদিন পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া গেল। আশপাশের লোকেরা বুঝতে পারল না কী ঘটছে। কিন্তু যখন গন্ধটা অসহ্য হয় এবং ঝলকে ঝলকে ধোঁয়া ওঠে, তখন তারা দরজা ভেঙে ফেলল এবং দেখল সেই মহাযোগী নিজেকে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি দিয়েছেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর দেহ ভস্মে পরিণত হয়েছে।

কালিদাসের সেই কথা আমরা স্মরণ করি—'মূর্খেরা মহতের কাজের নিন্দে করে, কারণ সেই কাজগুলি অসাধারণ এবং তাদের কারণ সাধারণ মানুষ খুঁজে বের করতে পারে না।'

তবু তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল বলেই একথা বলতে সাহস করছি যে মহাত্মা বুঝেছিলেন তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত এবং মৃত্যুর পরে কাউকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা না থাকায় সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে আর্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়েছিলেন।

বর্তমান লেখক সেই পরলোকগত মহাত্মার কাছে গভীরভাবে ঋণী এবং এই পংক্তিগুলি অযোগ্য হলেও যে মহান আচার্যদের সে ভালবেসেছে ও সেবা করেছে, তাঁদেরই একজনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হলো।

আর্য ও তামিল

এ এক সত্যিই নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর! হয়তো এখানেও সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানরের কংকালটিকেও খুঁজলে পাওয়া যাবে। ডোলমেনদের অভাব নেই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র প্রায় যে কোন জায়গায় খুঁড়লেই পাওয়া যাবে। হ্রদ-অধিবাসীরা—অন্ততঃ নদীবাসীরা—নিশ্চয় এককালে প্রচুর ছিল। গুহাবাসী ও পত্রসজ্জাধারী আজও আছে। দেশের নানা অঞ্চলে বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও দেখা যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো—কোলারীয়, দ্রাবিড় ও আর্য ইত্যাদি ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যগুলিও আছে। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুক্ত হয়েছে সকল জানা ও বহু আজও অজানা জাতি—মঙ্গোলয়েড, মঙ্গোল, তাতার ও নৃতাত্ত্বিকদের তথাকথিত আর্যদের নানা ধরনের বংশধরেরা। এখানে পারসিক, গ্রীক, ইউঝি, হুন, চীন, সিথীয়ান ও আরও অনেক জাতি মিলে মিশে এক হয়ে গেছে; ইহুদী, পার্সী, আরব, মঙ্গোল থেকে আরম্ভ করে ভাইকিং ও জার্মান বনবাসী দস্যুরা পর্যন্ত যারা এখনও একাত্ম হয়ে যায়নি—এই সব বিভিন্ন জাতি-তরঙ্গে গঠিত উদ্বেলিত মানব-মহাসমুদ্র ফেনায়িত, উচ্ছ্বসিত, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে বিস্তারমান এবং ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে গ্রাস করে আবার শান্ত—এই হচ্ছে ভারতের ইতিহাস।

প্রকৃতির এই পাগলামির মধ্যে এক প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা আবিষ্কার করেছিল এবং নিজের উন্নততর সংস্কৃতির শক্তির সাহায্যে ভারতের অধিকসংখ্যক জনগণকে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

এই উন্নত জাতি নিজেদের 'আর্য' বা মহৎ বলত এবং তাদের পন্থা ছিল বর্ণাশ্রমাচার—তথাকথিত জাতিভেদ।

অবশ্য আর্যজাতির মানুষেরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজেদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা সংরক্ষিত করেছিল; তবু জাতিভেদ প্রথা সর্বদাই খুব নমনীয় ছিল, মাঝে মাঝে সংস্কৃতির মাপকাঠিতে খুব নিচু জাতিগুলির স্বাস্থ্যকর উন্নতির জন্য এটি অতিরিক্ত নরম হতো।

এটি অন্তত তত্ত্বগতভাবে সমস্ত ভারতকে পরিচালিত করত—ধনসম্পদ বা তরবারি দ্বারা নয়—বুদ্ধি দ্বারা—আধ্যাত্মিকতা দ্বারা শোধিত ও নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি। ভারতের প্রধান জাতি আর্যদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণ।

অন্যান্য দেশের সামাজিক পদ্ধতি হতে আপাত পৃথক মনে হলেও, গভীর ভাবে পরীক্ষা করলে আর্যদের জাতিভেদ প্রথা দুটি ক্ষেত্র ছাড়া বিশেষ পৃথক বলে মনে হবে না।

প্রথম হচ্ছে, অন্যান্য দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান পান অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়রা। রোমের পোপ খুব খুশি হবেন রাইন নদীর তীরের কোন অভিজাত দস্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করতে পারলে। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান পান শান্তিবাদী মানুষ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর-সাধক।

ভারতের সবচেয়ে বড় রাজা অতীতের কোন ঋষিকে নিজের পূর্বপুরুষ বলতে পারলে

আনন্দিত হবেন, যিনি অরণ্যচারী, সংসার-বিরাগী, সর্বস্ব-ত্যাগী, নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভরশীল এবং সারা জীবন ইহকাল ও পরকালের সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'একক'-এর পার্থক্য। অন্যান্য দেশে জাতি নির্ধারণের একক মাত্রা হিসাবে একজন পুরুষ বা নারীই যথেষ্ট। ধন, ক্ষমতা, বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দ্বারা যে কেউ নিজের জন্মগত জাতির ঊর্ধ্বে যে কোন স্তরে উঠতে পারে।

ভারতে একক হচ্ছে সমগ্র গোষ্ঠীটি।

এখানেও নিম্নজাতি থেকে উচ্চতর বা উচ্চতম জাতিতে উঠার সব সুযোগই প্রত্যেকের আছে; তবে এই পরার্থবাদের জন্মভূমিতে স্বীয় জাতির সকলকে সঙ্গে নিয়ে উন্নত হতে হবে।

ভারতবর্ষে তুমি তোমার ঐশ্বর্য, ক্ষমতা বা অন্য কোন গুণের জন্য তোমার নিজের গোষ্ঠীর লোকদের পিছনে ফেলে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক হতে পার না; যারা তোমার উন্নতিতে সাহায্য করেছে তাদের বঞ্চিত করে তার বদলে শুধু ঘৃণা করতে পার না। ভারতবর্ষে যদি তুমি উচ্চ বর্ণে উন্নীত হতে চাও, তবে প্রথমে তোমার স্বজাতিকে উন্নত করতে হবে, তারপর তোমার উন্নতির পথে বাধা দেবার জন্য সামনে আর কিছু নেই।

এটাই হচ্ছে ভারতীয় সাঙ্গীকরণ পদ্ধতি এবং স্মরণাতীতকাল হতে এটাই চলে আসছে। অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে একথা বেশি খাটে যে, আর্য ও দ্রাবিড় এই ধরনের কথাগুলি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগ, তথাকথিত করোটি-তত্ত্বগত বিভাগ নয়, সে ধরনের বিভাগের কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি নামগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ। সেগুলি কেবল একটি গোষ্ঠীর মর্যাদাসূচক; এই গোষ্ঠীও সর্বদা পরিবর্তনশীল, এমন কি পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যখন বিবাহ-নিষেধের মধ্যেই অন্য সব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে, তখনও নিম্নতর গোষ্ঠী বা বিদেশ হতে সদ্য আগত লোকদের নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

যে বর্ণের তরবারির শক্তি আছে তারাই ক্ষত্রিয় হয়; যাদের বিদ্যা—তারা ব্রাহ্মণ; যাদের সম্পদ—বৈশ্য।

যে গোষ্ঠী অভীষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই সেই গোষ্ঠী নবাগতদের কাছ থেকে নানা উপবিভাগের দ্বারা নিজেদের পৃথক করে রাখে, কিন্তু এটা সত্য যে শেষ পর্যন্ত মিলে মিশে এক হয়ে যায়। আমাদের চোখের সামনে ভারতের সর্বত্র এটা ঘটছে।

স্বাভাবিকভাবেই যে গোষ্ঠী নিজেদের উন্নত করেছে, তারা নিজেদের জন্য সব সুবিধা সংরক্ষিত করে রাখতে চায়। সুতরাং যখনই সম্ভব হয়েছে রাজার সাহায্য নিয়ে বা অস্ত্রের সাহায্যে উচ্চবর্ণেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, নিম্নবর্ণের লোকদের উচ্চাশা দমনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই :—তারা কি সফল হয়েছিল? নিজেদের পুরাণ ও উপপুরাণগুলি ভাল করে দেখ, বিশেষ করে বৃহৎ পুরাণগুলির স্থানীয়

খণ্ডগুলি দেখ এবং দৃষ্টির সামনে ও চারদিকে যা ঘটছে ভাল করে লক্ষ্য কর, তুমি উত্তর পাবে।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ ও নানা উপবিভাগের মধ্যে বিবাহ-প্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা সত্বেও (যদিও সেটা সার্বজনীন নয়) আমরা পুরোপুরি মিশ্রিত জাতি।

ভাষাতাত্ত্বিক 'আর্য' ও 'তামিল' শব্দ দুটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যাই হোক না কেন, এমন কি যদি ধরে নেওয়াও হয় যে, ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা পশ্চিম সীমান্তের বাইরে থেকে এসেছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল থেকে এই দুই বিভাগ ভাষাগত, রক্তগত নয়। বেদে দস্যুদের কুৎসিত দৈহিক আকৃতি সম্বন্ধে যে সকল ঘৃণাকর বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তার কোনটিই মহান তামিলভাষী জাতি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ আর্য ও তামিলদের মধ্যে যদি দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা হয়, তবে তার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাহস করবে না।

ভারতে যে কোন বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরম দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ সম্পূর্ণ অসার কল্পনা এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় দাক্ষিণাত্যের মতো ভারতের আর কোথাও এই মতবাদ উপযুক্ত মাটি পায়নি এবং তার কারণ হচ্ছে ভাষাগত প্রভেদ।

দাক্ষিণাত্যের এই সামাজিক অত্যাচারের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা থেকে আমরা ইচ্ছে করেই বিরত থাকছি, যেমন বিরত থেকেছি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা থেকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে যে প্রচণ্ড উত্তেজনার ভাব বর্তমান তার উল্লেখই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম মানুষকে ঈশ্বরের দেওয়া সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রথা। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদিও অনিবার্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, বৈদেশিক অত্যাচার এবং সবার উপরে ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য বহু ব্রাহ্মণের পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতা ও দম্ভ বর্ণাশ্রম ধর্মের স্বাভাবিক সুফললাভ বহুভাবে ব্যাহত করলেও এটি ভারতভূমিতে আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবে।

দক্ষিণের ব্রাহ্মণদের প্রতি আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই ভারতের আদর্শকে যেন ভুলে না যান—পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের এক জগৎ সৃষ্টি। মহাভারতের মতে শুরুতে এমন ছিল এবং শেষেও এমনি হবে।

যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন, তিনি প্রথমে নিজের সেই আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করে এবং পরে অপরকেও সমস্তরে উন্নীত করে নিজের দাবি প্রমাণ করুন। এর বদলে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত জন্মগর্ব লালন করেন এবং স্বদেশী বা বিদেশী যে কোন মতলববাজ এই মিথ্যাগর্ব ও জন্মগত আলস্যকে বিরক্তিকর কুতর্কের দ্বারা লালন করলে তাঁদের সবচেয়ে সন্তুষ্ট করেন বলে মনে হয়।

ব্রাহ্মণেরা সাবধান, এটি মৃত্যুর লক্ষণ! জেগে ওঠ, তোমাদের পৌরুষ দেখাও, দেখাও তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব—তোমাদের চারপাশের অব্রাহ্মণদের উন্নত কর—প্রভুভাবে নয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কুসংস্কার ও অহংকার মিশ্রিত দূষিত গলিত প্রবঞ্চকের

আত্মাভিমান নিয়ে নয়,—কিন্তু দাসভাবে। যে ভালভাবে সেবা করতে জানে, সে ভালভাবে শাসন করতেও জানে।

অব্রাহ্মণরাও তাদের শক্তি ব্যয় করছেন বর্ণবিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে—সমস্যা সমাধানের পক্ষে যা অর্থহীন, কার্যকর—অহিন্দুরা যাতে ইন্ধনরাশি নিক্ষেপ করে আনন্দ লাভ করে।

বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কলহ দ্বারা এক পদও অগ্রসর হওয়া যাবে না, একটি অসুবিধাও দূরীভূত হবে না। এই বিরোধের আগুন যদি প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে সকল কল্যাণমূলক অগ্রগতিই পেছিয়ে যাবে, সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দীর জন্য। সেটি বৌদ্ধদের রাজনৈতিক ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে।

এই অজ্ঞতার কোলাহল ও ঘৃণার মাঝে আমরা দেখে আনন্দিত হই যে পণ্ডিত ডি. শবরীরয়ান একমাত্র ন্যায্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য পথ অনুসরণ করছেন। মূর্খোচিত ও নিরর্থক বিবাদের মধ্যে অমূল্য প্রাণশক্তির অপব্যয়ের বদলে তিনি 'সিদ্ধান্ত-দীপিকা'তে 'আর্য ও তামিলের সংমিশ্রণ' নামক এক প্রবন্ধে অতি সাহসী পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্‌দের সৃষ্ট মতবাদের কুয়াশাই শুধু দূর করেননি, বরং দক্ষিণের জাতি-সমস্যা ভালভাবে বোঝার পথ নির্মাণ করেছেন।

ভিক্ষা করে কেউ কখনও কিছু পায় না। যেটি পাবার আমরা যোগ্য, শুধু সেটিই পাই। যোগ্য হবার প্রথম ধাপ পাওয়ার ইচ্ছা; আমাদের সেই ইচ্ছাই সফল হয়, যেটির জন্য আমরা নিজেদের উপযুক্ত মনে করি।

আর্য মতবাদের মাকড়সার জাল ও তার সব আনুষঙ্গিক দোষগুলি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে পরিষ্কার করার একান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য। সেই সঙ্গে প্রয়োজন আর্যজাতির অন্যতম মহান পূর্বপুরুষ—মহান তামিলভাষীদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে যথার্থ গৌরব বোধ।

নানা পাশ্চাত্য মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে 'আর্য' শব্দটির যে সংজ্ঞা দেখতে পাই এবং যার দ্বারা বর্তমানে হিন্দু নামে অভিহিত বিরাট জনসমষ্টিকে বোঝায়, সেই সংজ্ঞাটিই আমরা গ্রহণ করি। এই আর্যজাতি কথাটি সব হিন্দু সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য, যারা সংস্কৃতভাষী ও তামিলভাষী এই দুটি বৃহৎ জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। কয়েকটি স্মৃতিতে শূদ্রদের যে এই অভিধা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কিছুই নেই, শুধু বোঝায় যে শূদ্ররা অতীতে এবং বর্তমানেও শুধু অপেক্ষমাণ আর্য—শিক্ষানবিশী করা আর্য।

যদিও আমরা জানি যে পণ্ডিত শবরীরয়ান কিছুটা অনিশ্চয়তার পথে পদক্ষেপ করছেন, যদিও বৈদিক নাম ও জাতিগুলি সম্বন্ধে তাঁর বহু আলোড়নকারী ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা একমত নই, তবুও আমরা আনন্দিত যে তিনি ভারতীয় সভ্যতার মহীয়সী মাতার—যদি সংস্কৃতভাষী জাতিকে পিতা বলা হয়—সংস্কৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আমরা আরও আনন্দিত যে, তিনি প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো সুমেরীয়গণের জাতিগত ঐক্য সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়েছেন। এর

ফলে অন্য সব সভ্যতার আগে যে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল—যার সঙ্গে প্রাচীনত্বের তুলনায় আর্য সেমিটিক সভ্যতা শিশুমাত্র—তার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধের কথা ভেবে গর্ব বোধ করছি।

আমরা আরও বলব, মিশরবাসীদের পণ্ট দেশ শুধু মালাবার নয়, বরং মিশরীয় জাতি মালাবার থেকে সমুদ্র পার হয়ে ব-দ্বীপে প্রবেশ করে নীলনদের গতিপথ ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছিল। এই পণ্টকে তারা সর্বদা পবিত্রভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করত।

এই প্রচেষ্টা ঠিক পথে চলেছে। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান যতই আবিষ্কৃত হবে, ততই আরও বিশদ ও নিখুঁত আলোচনা দেখা দেবে। তামিল ভাষার বৈশিষ্ট্য যাঁরা মাতৃভাষার মত আয়ত্ত করেছেন, তাঁদের চেয়ে যোগ্যতর এ কাজে আর কাকে পাওয়া যাবে?

বৈদান্তিক ও সন্ন্যাসী আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ববোধ করি, গর্ব বোধ করি আমাদের তামিলভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য, যাঁদের সভ্যতা আজ পর্যন্ত জ্ঞাত সব সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন! এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোন পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত; মানবজাতির প্রথম গোষ্ঠী প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রধারী আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত; আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তাহলে আমাদের সেই পশু পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত, যারা মানুষের চেয়েও প্রাচীন। আমরা গর্বিত যে আমরা সমগ্র জড় বা চেতন বিশ্বজগতের উত্তর-পুরুষ। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি, কাজ করি, যন্ত্রণা পাই, সেজন্যও গর্বিত—আরও বেশি গর্ব বোধ করি যে, কর্ম শেষ হলে আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই রাজ্যে প্রবেশ করি যেখানে আর কোন বিভ্রান্তি বা মায়া নেই।

চক্রাকারে আবর্তনশীল স্থিতি ও অস্থিতি

[প্রথমবার আমেরিকা পরিভ্রমণকালে জনৈক পাশ্চাত্যশিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী এটি লেখেন]

এই নিখিল বিশ্ব ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার একটি দৃষ্টান্ত। সমতাবস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য বিপর্যস্ত বিশ্বের যে টানাপোড়েন তাই হচ্ছে গতি, ভারসাম্য নিজে গতি হতেই পারে না। অন্তর্জগতের ক্ষেত্রেও এমন একটি অবস্থা আছে যা চিন্তার অগম্য স্থল, কারণ চিন্তা নিজেই একটি গতি। এখন, প্রসার ঘটানোর মধ্য দিয়ে সব কিছুই যখন পূর্ণ ভারসাম্যে পৌঁছনর দিকে চলেছে এবং সমগ্র বিশ্বই সেই অভিমুখে ধাবমান তখন আমাদের একথা বলার কোনও অধিকারই নেই যে, কখনও ঐ স্থিতির অবস্থা অর্জন করা যাবে না। আবার ভারসাম্যাবস্থা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন তার মধ্যে বিভিন্নতা থাকা সম্ভব নয়।

তাকে সমগোত্রীয় হতেই হবে, কারণ এমনকি দু'টি পরমাণু থাকলেও তা পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করবে ও ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেবে। অতএব, ভারসাম্যের পরিস্থিতি হোল ঐক্য, স্থিতি ও সমগোত্রীয়তার অবস্থা। অন্তর্জাগতিক ভাষায়, এই সাম্যাবস্থা চিন্তা নয়, দেহ নয়, যাকে আমরা গুণ বলি তার কিছুই নয়। কেবল মাত্র যা বলতে পারি তা হল, সত্তার উপস্থিতি, আত্মবোধ ও অমৃতাস্বাদী ভাবস্বরূপই টিঁকে থাকবে।

একই ভাবে এই স্থিতির অবস্থাও দুটি হতে পারে না। একে অবশ্যই ঐকিক হতে হবে, যেহেতু আমি, তুমি ইত্যাদি কাল্পনিক ভেদাভেদ, সব ধরনের বিভিন্ন বিবিধতা পরিবর্তনাবস্থা বা মায়া তাই এদের অবলুপ্ত হতেই হবে। এর আগে স্বরূপ স্থিতি ও মুক্তির অবস্থায় ছিল দেখিয়ে বলা যেতে পারে যে, এখনই তার এ ধরনের পরিবর্তিত অবস্থা হয়েছে, বলা যেতে পারে বর্তমানের ভেদাত্মক অবস্থাই একমাত্র প্রকৃত অবস্থা, এবং যার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনশীল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে সে সমজাতীয়তার অবস্থা আদিমতম অপরিণত অবস্থা, এবং আরও বলা যেতে পারে যে অভেদাত্মক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অর্থই হোল নিছক অধঃপতন। সমগ্র কালে এই দ্বিবিধ অবস্থা অর্থাৎ সমরূপাবস্থা ও বহুরূপাবস্থা একবারই সংঘটিত হয় এ যদি প্রমাণ করা যেত তবে এ কথার কিছুটা গুরুত্ব থাকত। যা একবার ঘটছে বারংবার তা ঘটবেই। স্থিতির পর পরিবর্তন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু এই স্থিতির পূর্বে নিশ্চিত ভাবেই পরিবর্তন ছিল, আবার এই পরিবর্তনের পরেই আর এক স্থিতি আসবেই। একটি স্থিতিকাল ছিল এবং তারপরেই এই পরিবর্তন এসেছে যা অনন্তকাল চলবে একথা চিন্তা করাও হাস্যকর। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকণা দেখায় যে তারা বারবার স্থিতি ও অস্থিতির কাল-পর্বে ঘুরে ফিরে আসে।

স্থিতির এক পর্ব থেকে আর এক পর্বের ব্যবধানকে বলা হয় কল্প। কিন্তু কল্পের এই স্থিতি পূর্ণ সমজাতীয় হতে পারে না, কারণ তা হলে যে কোনও ভবিষ্যৎ বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটত। পরিবর্তনের বর্তমান অবস্থা পূর্ববর্তী স্থিতির অবস্থার তুলনায়

বেশ প্রাগ্রসর বলা নিছকই বাজে কথা, কারণ তাহলে আগামী স্থিতির অবস্থা সময়ের দিক থেকে আরও অগ্রগামী বলে আরও বেশী যথার্থ হবে! প্রকৃতিতে কোনরূপ এগোন পিছানোর ব্যাপার নেই। একই রূপকে প্রকৃতি বারংবার প্রদর্শন করে। আসলে পৃথিবীর নিয়ম বলতে একথাই বোঝায়। কিন্তু আত্মার বেলায় অগ্রগমন আছে। অর্থাৎ আত্মাসমূহ নিজ নিজ স্বরূপের নিকটবর্তী হয়, এবং প্রতি কল্পে তাদের বৃহৎ অংশ চক্রবৎ আবর্তনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হিসাবে একক আত্মা বার বার আসা যাওয়া করবে, তাই আত্মার কোন মুক্তি থাকতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস হতে হবে। উত্তর হচ্ছে একক আত্মা মায়ার কল্পনা মাত্র, এবং প্রকৃতি ছাড়া এর কোনও সত্তা নেই। বাস্তবতঃ, একক আত্মা হচ্ছে নির্বিশেষ পরম ব্রহ্ম।

প্রকৃতিতে যা সত্য তাই ব্রহ্ম, মায়ার প্রভাবেই এর বা প্রকৃতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মায়া বিভ্রম বলে তাকে সত্য বলা যেতে পারে না। তবু মায়া দৃশ্য ঘটনাবলী সৃষ্টি করছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, মায়া নিজেই বিভ্রম হওয়া সত্বেও এইসব সৃষ্টি করল কি ভাবে, আমাদের উত্তর যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সবই অজ্ঞানতা, সৃষ্টিকারিণীও অবশ্যই তাই। জ্ঞানের দ্বারা কিভাবে অজ্ঞানতার সৃষ্টি হতে পারে? তাই এই মায়া অবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (আপাতঃ জ্ঞান) এই দুইভাবে কাজ করছে। এবং এই বিজ্ঞান অবিজ্ঞান বা অজ্ঞতাকে ধ্বংস করার পরে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। এই মায়া নিজেকে ধ্বংস করে এবং যা থাকে তা হল পরমেশ্বর, অস্তিত্বের স্বাদ, জ্ঞান ও পরমানন্দ। এখন প্রকৃতিতে যা কিছু সত্য তা হোল এই পরম ব্রহ্ম, এবং তিন রূপে প্রকৃতি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বর, চেতন ও অচেতন অর্থাৎ ঈশ্বর, অহং আত্মা এবং অচেতন জীবসকল। এসবের মধ্যে পরম ব্রহ্মই সত্য, মায়ার মধ্য দিয়ে এর বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। তবে ঈশ্বর দর্শনই সর্বোত্তম এবং সত্যের নিকটতম অবস্থা। মানুষ যে ভাব পেতে পারে তার মধ্যে ব্যক্তি ঈশ্বরের রূপই সর্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরে আরোপিত গুণগুলি প্রকৃতির গুণাবলীর সম অর্থেই সত্য। তবু আমাদের কখনও ভোলা উচিত নয় যে মায়ার প্রভাবে দেখা পরম ব্রহ্মই ব্যক্তি ঈশ্বর।

বৌদ্ধ ভারত

[সেক্সপীয়র ক্লাব, পাসাডেনা, কালিফোর্নিয়াতে ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০-তে প্রদত্ত ভাষণ]

আজ সন্ধ্যায় আমাদের আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধ ভারত। সম্ভবতঃ আপনারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবের জীবনের ওপর লেখা এড্‌ুইন আর্নল্ডের পদ্য পড়েছেন, এবং অনেকেই বোধ হয় এ বিষয়ে আরো পাণ্ডিত্যসুলভ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, কারণ ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর প্রভূত রচনা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম স্বতঃই সবচেয়ে বেশী উৎসাহোদ্দীপক বিষয়, কারণ বিশ্ব-ধর্ম-ক্ষেত্রে এটিই ঐতিহাসিকভাবে প্রথম স্ফুরণ। বৌদ্ধধর্মের আগেও ভারতবর্ষ ও অন্যত্র মহান সব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, কিন্তু সে সকলই কম বেশী— নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রাচীন হিন্দু বা প্রাচীন ইহুদী অথবা প্রাচীন পারসিক এদের সকলের ধর্মই মহান ধর্ম কিন্তু এসব ধর্মই মূলত গোষ্ঠীনির্ভর। বৌদ্ধধর্ম দিয়েই ধর্মের দ্বারা বিশ্বজয়ের মত অদ্ভুত ঘটনা আরম্ভ হোল। এই ধর্মের শিক্ষণীয় মতবাদ ও সত্য এর প্রদত্ত বাণী ছাড়াও আমরা এর মধ্যে পৃথিবীর প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করি। এই ধর্মের উৎপত্তির মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নগ্নপদ মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সভ্য জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন, এমন কি দূর দেশে একদিকে ল্যাপল্যাণ্ড অপর দিকে ফিলিপাইন পর্যন্ত তাঁরা প্রবেশ করলেন। বুদ্ধের জন্মের মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়লেন; এবং একমাত্র ভারতবর্ষেই বুদ্ধের ধর্ম একসময়ে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষ কোন সময়ই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল না। তা বহির্ভারতে ছিল। ইহুদীদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের যে সম্পর্ক এখানেও বৌদ্ধধর্মের ভাগ্যে তাই ঘটেছিল, ইহুদীদের অধিকাংশ খ্রীষ্টধর্মের বাইরে ছিল। এই ভাবে ভারতবর্ষের ধর্ম বেঁচে ছিল। যাই হোক এই তুলনা বন্ধ করা যাক। খ্রীষ্টধর্ম যদিও ইহুদী জাতিকে পুরোপুরি তার আওতায় আনতে পারেনি সে পুরো দেশটি দখল করে নিয়েছে। যে সব জায়গায় ইহুদীদের ধর্ম ছিল সে সব জায়গা অতি অল্পকালের মধ্যেই খ্রীষ্টানরা দখল করে নিল, পুরানো ধর্ম হটে গেল আর তাই ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই বৃহদাকার শিশুটিকে কালক্রমে তার জন্মদাত্রী মাতাই গ্রাস করে নিল,এবং আজ বুদ্ধের নামই ভারতে প্রায় অপরিচিত। নিরানব্বুই শতাংশ ভারতীয়ের তুলনায় আপনারা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বেশী জানেন। ভারতীয়রা বড় জোর জানে, 'ওঃ তিনি একজন মহান অবতার ছিলেন—ঈশ্বরের মহান প্রবক্তা ছিলেন।' এখানেই জ্ঞানের সমাপ্তি। সিংহল দ্বীপ বুদ্ধের ধর্মে আছে এবং হিমালয়ের দেশগুলিতে এখনও কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রয়েছেন। এর বাইরে কেউই নেই। কিন্তু বাদ বাকী এশিয়ার সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল।

তবুও যে কোনও ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের লোক পৃথিবীতে বেশী, এবং এই ধর্ম পরোক্ষভাবে অন্য সব ধর্মকে সংশোধিত করেছে। এশিয়া মাইনরে বৌদ্ধদের একটি ভাল অংশ প্রবেশ করেছিল। সেখানে বৌদ্ধরা থাকবে না খ্রীষ্টধর্মের পরবর্তী গোষ্ঠী স্থায়ী হবে তা নিয়ে এক সময় নিয়ত সংগ্রাম চলত।

প্রথম যুগের খ্রীষ্টানদের নস্টিক (Gnostic) ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির প্রবণতা কমবেশী বৌদ্ধদের অনুরূপ ছিল, এবং সেই আশ্চর্য নগরী আলেকজান্দ্রিয়ায় এরা সব বিমিশ্রিত হয়, এই ধর্ম সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে রোমক আইনের অধীনে খ্রীষ্টান ধর্ম দেখা দেয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকে বৌদ্ধধর্ম তার ধর্মমত ও আচরণগত দিকের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়, এবং বিপুল শক্তিসম্পন্ন বিশ্বজয়ী ধর্ম হিসাবে তার প্রথম আবির্ভাব, তাও খুবই আকর্ষক।

এই বক্তৃতায় আমি মূলতঃ ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক; আর বৌদ্ধধর্ম ও তার উত্থান সম্পর্কে কিছুমাত্র বুঝতে গেলেও এই মহান্ ধর্মগুরুর জন্মকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সামান্য কিছু ধারণা থাকা দরকার।

সেদিনের ভারতবর্ষে এক সুসম্বদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ—বেদ-ভিত্তিক এক বহুবিস্তৃত ধর্ম বিরাজ করছিল, আর এ বেদসমূহ সমবেত সাহিত্যরূপেই বর্তমান ছিল, গ্রন্থরূপে নয়—যেমনটা আপনারা বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এ দেখতে পান। এখন, বাইবেল হোল গিয়ে বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের সমষ্টি, নানা লোক এর প্রণেতা। এটি একটি সঙ্কলন। আর, বেদসমূহও বিশৃঙ্খল সংগৃহীত সঙ্কলন। আমি জানি না, এর সব গ্রন্থই আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা—কেউই এর সব গ্রন্থ দেখেন নি, এমনকি ভারতবর্ষেও কেউ সব বই চোখে দেখেননি, যদি সব বই-এর কথা জানা থাকত তবে এই ঘরখানা তাতে পূর্ণ হয়ে যেত। এ হোল বিপুল আকারের সাহিত্য সৃষ্টি, ভগবান এই শাস্ত্র দান করেছেন আর বংশপরম্পরায় তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই ভারতবর্ষে শাস্ত্র সম্বন্ধে ধারণা প্রচণ্ড গোঁড়ামিপূর্ণ। আপনারা গ্রন্থ পূজা বিষয়ে আপনাদের গোঁড়ামি নিয়ে অনুযোগ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হিন্দুদের ধারণা যদি জানেন তবে আপনাদের কী যে দশা হবে? হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, বেদ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকাশ, বেদের মাধ্যমেই ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে এবং বেদে নিহিত আছে বলেই তার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। এই জগতে একটি গাভী বিরাজ করছে; কারণ 'গাভী' শব্দটি বেদে আছে; বেদে 'মানুষ' শব্দটি আছে বলেই তার বাইরে জগতে মানুষ রয়েছে। এর মধ্যেই আমরা সেই তত্ত্বের প্রারম্ভ অবস্থা দেখতে পাই যে তত্ত্বকে পরবর্তী কালে খ্রীষ্টানরা বিকশিত করেছিল এবং এই কথার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল: 'সৃষ্টির প্রারম্ভপর্বে ছিল শব্দ, আর সে শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ছিল।'—এ তত্ত্ব ভারতবর্ষের পুরাতন, প্রাচীন তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সকল শাস্ত্রের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। এবং মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি শব্দই ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ। শব্দ কেবল বস্তুবিশ্বের বাহ্যিক প্রকাশমাত্র। সুতরাং, সকল প্রকাশই কেবলমাত্র বস্তুজগতের প্রকাশ, আর শব্দ মাত্রেই বেদ, ও সংস্কৃতই দেবভাষা।

ঈশ্বর একবারই ভাষা উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতই বলেছেন, আর তাই তা দৈবীভাষা। তাই ভারতীয়রা মনে করেন যে, সংস্কৃত ছাড়া অন্য সব ভাষা পশুর ডাক ছাড়া কিছুই নয়। এবং তাকে বোঝাবার জন্যই যে সব জাতি সংস্কৃত বলে না তাদের ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হয়েছে, গ্রীকদের ভাষায় বর্বর শব্দটির মতই এই ম্লেচ্ছ শব্দ। তারা পশুর ডাক ডাকে, তারা কথা বলে না, কিন্তু সংস্কৃত হচ্ছে দৈবীভাষা।

এখন, বেদ কোন ব্যক্তি-মানুষের রচনা নয়; তা দেবতাদের সঙ্গে শাশ্বত সান্নিধ্যে গড়ে উঠেছিল। ঈশ্বর অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত, আর এই জ্ঞানের মধ্য দিয়েই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয়দের নীতিবোধ, ভালমন্দ জ্ঞান সবই অনুশাসন মেনে চলে। সব কিছু ঐ গ্রন্থ দ্বারা আবদ্ধ—ওর বাইরে কিছুই ঘটতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানের উর্ধ্বে তুমি যেতে পার না। এটাই ভারতীয় গোঁড়ামি।

বেদের শেষ অংশে শীর্ষতম আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাওয়া পাওয়া যায়। প্রথম অংশে স্থূলতর বিষয়। বেদের একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে আপনারা বলেন, 'এটি ভাল নয়।' কিন্তু কেন? 'এতে নিশ্চিত মন্দ অনুশাসন নিহিত' বলে? এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত আপনাদের ওল্ড টেস্টামেন্টেও দেখতে পাবেন। প্রাচীন সব গ্রন্থে এমন সব ঘটনা ও উদ্ভট ধ্যানধারণা থাকে যা বর্তমান দিনে আমরা মানতে পারি না।

'এই মতবাদটি মোটেই ভাল নয়, কেন না, এ আমার নীতিবোধকে ক্ষুণ্ণ করে।' এ ধরনের ধারণা আপনাদের কিভাবে হতে পারে। কেবল মাত্র স্ব স্ব চিন্তার ফলেই কি ধারণার সৃষ্টি? তা হলে দূর হটো। যদি এটি ঈশ্বরের নির্দেশ হয়, তবে প্রশ্ন করার তোমার কি অধিকার আছে? বেদ যখন বলে, 'এটি করোনা, এটি নীতি বিগর্হিত' ইত্যাদি, তখন তোমার প্রশ্ন করার কোন অধিকারই থাকে না। আর বিপদটাও এখানেই। কোন হিন্দুকে যদি আপনি বলেন, 'আমাদের বাইবেলে তো একথা বলে না।' উত্তর হবে 'ও তোমাদের বাইবেল? ইতিহাসে তাতো শিশু। বেদ অতিরিক্ত তাতে আর কি থাকতে পারে? বেদ ছাড়া অন্য গ্রন্থই-বা কি হতে পারে? ভগবানেই সমস্ত জ্ঞান নিহিত। আপনি কি বলতে চান যে ভগবান দুই বা ততোধিক বাইবেলের মাধ্যমে শেখাতে যাবেন? বেদ গ্রন্থের মাধ্যমেই তাঁর শিক্ষার প্রথম প্রকাশ। আপনি কি মনে করেন তিনি ভুল করেছিলেন, তবে? তারপর যখন ভুল ধরতে পারলেন তখন তিনি আরও ভাল কিছু করতে চাইলেন এবং তাই অন্য জাতিকে অন্য এক বাইবেল শেখালেন? বেদের মত প্রাচীন কোন গ্রন্থ দেখাতে পারবেন না। পরবর্তী অন্য বইগুলিতে সব তা থেকেই নকল করা হয়েছে।' হিন্দুরা আপনার কথা শুনবেই না। খ্রীষ্টানরা বাইবেল এনে উপস্থিত করলে তারা বলবে, 'এটা প্রতারণাপূর্ণ। ভগবান একবারই বলেন, কারণ তিনি কখনও ভুল কিছু বলেন না।'

এখন, এসব চিন্তা করে দেখুন। এই গোঁড়ামি অতি ভয়ঙ্কর। আর যদি কোন হিন্দুকে বলেন যে তাকে সমাজের সংস্কার ঘটাতে হবে এবং এই এই করতে হবে,

সে বলবে, 'এসব কি শাস্ত্রগ্রন্থে আছে? তা যদি না হয়, তাহলে আমি পরিবর্তনের কথা ভাবিই না। অপেক্ষা করুন, আগামী পাঁচ শতাব্দী পরেই দেখতে পাবেন যে আমাদের পথই উত্তম।' তাকে যদি বলেন, 'তোমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ নয়।' সে বলবে, 'কি করে জানলেন?' সে তারপর বলবে, 'এই বিষয়ে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান শ্রেয়োত্তর। পাঁচ শতাব্দী ধৈর্য ধরুন দেখবেন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু ঘটবে। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনই আসল পরীক্ষা। পৃথিবীতে এমন কোনও জাতিগোষ্ঠী নেই যারা একাদিক্রমে পাঁচ শতাব্দী টিঁকে থাকে। আর দেখ! আমরা অনন্তকাল ধরে অধিষ্ঠিত আছি।' তারা একথাই বলবে। এ ভয়ঙ্কর গোঁড়ামি। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি সেই গোঁড়ামির সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি।

এই গোঁড়ামিই ছিল ভারতবর্ষে। আর কি ছিল? সব কিছু ছিল বিভক্ত, সমস্ত সমাজ আজকের মতই বিভক্ত, তখন এই জাতিভেদ প্রথা আরো বেশী কঠোর ছিল। লক্ষণীয় আরো একটি জিনিস আছে। এই পাশ্চাত্যেও অধুনা জাতিতে বিভক্ত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আর আমি নিজে—নিজে আমি জাতিত্যাগী। আমি সব কিছু ভেঙেচুরে দিয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে জাতের ভিন্নতায় বিশ্বাস করি না। জাতের ভাল দিকও আছে, কিন্তু ভগবানের দোহাই—আমি যেন জাতের বন্ধনে জড়িয়ে না পড়ি। জাত বলতে আমি কি বোঝাতে চাই সম্ভবতঃ আপনারা তা উপলব্ধি করছেন। আপনারা অতি দ্রুত এই জাতপ্রথা করতে চাইছেন। হিন্দুদের মধ্যে জাতপ্রথা বংশগত বৃত্তিনির্ভর। প্রাচীন যুগে হিন্দুরা জীবনকে সাবলীল ও সচ্ছন্দ বলে মনে করত। সব কিছুকে জীবন্ত করে তুলতে পারে কোন জিনিস? তা হোল প্রতিযোগিতা। কিন্তু বংশগত বৃত্তি প্রতিযোগিতাকে মেরে ফেলে। তুমি সূত্রধর? উত্তম, তোমার পুত্র কেবলমাত্র সূত্রধরই হতে পারবে। তুমি কি? তুমি কর্মকার? কর্মকার বৃত্তি তো জাতব্যবসায়, তোমার সন্তানরাও কর্মকার হবে। এক বৃত্তির মধ্যে অন্য কোন বৃত্তির লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না, তাই সেখানেই নিরুপদ্রবে থেকে জীবন কাটাতে হয়। তুমি সেনাবাহিনীর লোক, একজন যোদ্ধা? তোমার জন্য এক জাত গড়। তুমি পুরোহিত? তোমার একটি জাত গড়ে তোল। পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক। অন্য সব বৃত্তিও তাই। এগুলি ঋজুবদ্ধ, উচ্চ ক্ষমতাশীল। এর একটা বিরাট দিক আছে আর তা হোল—প্রকৃতই তা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পরিহার করে। এই জাতের ভাগাভাগির জন্যই অন্য সব জাতি বিলুপ্ত হলেও ভারতীয় জাতি বেঁচে আছে। এর একটা বড় ক্ষতিও আছে, এ প্রথা ব্যক্তিত্বকে ব্যাহত করে। আমি সূত্রধর হয়ে জন্মেছি বলে আমাকে সূত্রধরেরই কাজ করতে হবে—আমি পছন্দ না করলেও তা করতে হবে। শাস্ত্রে একথা আছে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই এ অবস্থা ছিল। এখন আমি আপনাদের প্রাক্-বুদ্ধ যুগের কথাই বলছি। তোমরা যাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলে তার চেষ্টা করছ; এ হোল তাই। পরিণামে এর ফলশ্রুতিও হয়তো ভালই হবে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন একটা থেকে যাবে বই কি? স্বাধীনতাই মূলমন্ত্র। মুক্ত হও। দেহে মুক্ত, মুক্ত মানস ও মুক্ত আত্মা—এই তো আমি আজীবন চেয়ে

এসেছি। আমি স্বাধীনতা নিয়ে মন্দ কাজও করতে রাজি, পরাধীনতার মধ্যে থেকে ভাল কাজও করতে চাই না।

যাই হোক, পাশ্চাত্যে যে সব জিনিস করার জন্য এখন কলরব উঠেছে, ভারতে বহু যুগ আগে তাই করা হয়েছে। ভূমি জাতীয়করণ করা হয়ে গিয়েছিল। দৃঢ়বদ্ধ জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করা হোত। ভারতের মানুষ মনেপ্রাণে সমাজতন্ত্রবাদী। এরও উর্ধ্বে ভারতে একটি সম্পদ ছিল, তা ব্যক্তিসত্তার। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশাসন সত্বেও তারা প্রচণ্ড ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিল। কি ভাবে আহার করবে, কি ভাবে পান করবে, নিদ্রা যাবে বা মৃত্যু কি ভাবে হবে সব কিছুর জন্য বিধি নিয়ম। সেখানে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত, ভোর থেকে স্থুরু করে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত সর্বদা তোমাকে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ করতে হবে। বিধান, বিধান, বিধান। ভাবতে পারা যায় যে একটা জাতি এ ধরনের নিয়ম শৃংখলার মধ্যে বেঁচে থাকবে? আইন তো প্রাণহীন। সেজন্যই যে দেশে যত বেশী আইন সে দেশ তত বেশী খারাপ। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আমরা পাহাড় পর্বতে যাই, সেখানে কোন আইন নেই, নেই কোন সরকার। যত বেশী আইন তৈরী হবে, তত বেশী পুলিশ থাকবে, সমাজবাদের নিয়ন্ত্রণ তত বেশী হবে, ততই থাকবে বৈরী প্রহরী। ভারতবর্ষে আইনের এই বিধিনিষেধ প্রবল। জন্মগ্রহণ করেই শিশু জানে যে সে দাস, প্রথমতঃ জাতের দাসত্ব, তারপর জাতির দাসত্ব। দাস, দাস, দাস। পানাহার থেকে সব কিছু ক্রিয়াকলাপে দাস। নিয়মিত প্রণালীতে তাকে খেতেই হবে; প্রথম গ্রাসে এক মন্ত্র, দ্বিতীয় গ্রাসে এক, তৃতীয় গ্রাসে অপর মন্ত্র এবং জল পান করার মুহূর্তে আর এক মন্ত্র। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা! এই ভাবে দিনের পর দিন ধরে তা চলত।

কিন্তু তাঁরা মননশীল ছিলেন। ভারতীয়রা জানতেন যে এর দ্বারা প্রকৃত মহত্বে পৌছন যাবে না। তাই যাঁরা মহান হতে চান তাঁদের জন্য পথ খোলা রাখলেন। সর্বোপরি, তাঁরা বুঝেছিলেন যে এই সব বিধি-নিয়ম পার্থিব ও সাংসারিক জীবন-যাপনের জন্য। যখনই তুমি অর্থ আকাঙ্ক্ষা করবে না, সন্তান চাইবে না—সাংসারিক জীবনের কোনও কাজই করবে না—তুমি পূর্ণ মুক্ত জীবনে যেতে পার। যাঁরা এই ভাবে বেরিয়ে গিয়েছেন তাঁদেরই সন্ন্যাসী বলা হত—এঁরা তাঁরাই যাঁরা ত্যাগ করেছেন। তাঁরা কোনদিন নিজেদের সংগঠিত করেন নি, এখনও করেন না। তাঁরা সেই সব মুক্ত পুরুষ ও নারী যাঁরা বিবাহ করতে চান না, সম্পত্তির অধিকার চান না, কোনও বিধি বা নিয়ম তাঁদের জন্য নয়—এমন কি বেদের অনুশাসনেও তাঁরা বদ্ধ নন। তাঁরা বেদের উর্ধ্বে। আমাদের সামাজিক সংস্থাগুলির থেকে বিপরীত মেরুতে তাঁদের অবস্থান। তাঁরা জাত বর্ণের উর্ধ্বে। তাঁরা সব কিছুর বাইরেই বেড়ে উঠেছেন। তাঁরা এতই বড় যে এই ক্ষুদ্র বিধি-নিয়ম ও বিষয়ের মধ্যে তাঁদের বেঁধে রাখা যায় না। তাঁদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অবশ্যই মেনে চলতে হবে: তাঁরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবেন না এবং বিবাহ করতে পারবেন না। যদি বিবাহ কর বা গৃহস্থ হও তো সঙ্গে সঙ্গে বিধি-নিয়ম তোমার ঘাড়ে চাপবে; কিন্তু এই দুইয়ের একটিও না করলে তুমি

মুক্ত। এঁরাই ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর জীবন্ত ঈশ্বর, এবং আমাদের দেশের মহামানব ও মানবীদের শতকরা নিরানব্বই জনই এঁদের মধ্যে থেকে এসেছেন।

সব দেশেই, আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব বলতে অসামান্য ব্যক্তিত্বকেই বোঝায়, আর এ ধরনের ব্যক্তিত্ব সামাজিক জীবনে পাওয়া যায় না। বিকাশোন্মুখ এই ব্যক্তিত্ব সমাজকে বিচূর্ণ করতে চায়। সমাজ যদি তাকে দাবিয়ে রাখতে চায় তবে তা সমাজকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে চায়। তাই ভারতীয়রা একটি সহজ পন্থা স্থির করলেন। তাঁরা বললেন: "বেশ, সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তুমি যদৃচ্ছা প্রচার করতে পার, শিক্ষা দিতে পার। দূর থেকে আমরা শুধু তোমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করব। ফলে তখন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ও নারীরা আবির্ভূত হলেন, এবং তাঁরাই সকল সমাজের শীর্ষে অবস্থান করলেন। মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক বসন সন্ন্যাসী সামনে উপস্থিত হলে রাজারাও আসনে বসে থাকতে সাহসী হতেন না, তাঁদের উঠে দাঁড়াতেই হত। আবার এই সন্ন্যাসীই আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ত দরিদ্রতম প্রজার কুটিরে গিয়ে হাজির হ'তেন, একটুকরো রুটি খেয়েই বেশ আনন্দে থাকতেন। সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গেই তাঁদের মিশতে হোত, এখন সে একজন দরিদ্রের কুটিরে রাত্রি যাপন করলেন; কালই তিনি রাজার মনোরম শয্যায় নিদ্রা যাবেন। একদিন তিনি রাজপ্রাসাদে স্বর্ণ পাত্রে আহার করেন, পরের দিনই তাঁর আহার্য জোটে না, তাঁকে গাছের তলায় ঘুমোতে হয়। সমাজ এঁদের অতিশয় শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কোনও কোনও সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য সমাজ-সাধককে আহত করতে পারে এমন কাজ করত। কিন্তু সমাজ এতে বিব্রত হত না, কারণ সে শুধু দেখতে চাইত—পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও ত্যাগব্রতীর নিঃস্বতা রক্ষা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না।

এই সব সন্ন্যাসীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুব প্রবল ছিল বলে তাঁরা নিয়ত নতুন চিন্তা ও তত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রয়াসী হতেন—দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁদের অভিনব কিছুর অনুধ্যান করতেই হত, তাঁরা পুরাতনের গণ্ডীতে ফিরে যেতে পারেন না। এঁরা ছাড়া অন্যরা সকলেই পুরোনো গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে চাইত—একই ধরনের চিন্তা করতে চাইত। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তাঁর নির্বুদ্ধিতার চেয়ে বড়। আমাদের দুর্বলতার চেয়ে সবলতা অনেক ক্রিয়াশীল, অসদ্বস্তুর তুলনায় সদ্বস্তু অধিক শক্তিশালী। তাই যদি সকল মানুষকে একই ধরনের চিন্তায় গ্রথিত করা সম্ভব হত তবে আমরা আর নতুনতর চিন্তা করতে পারতাম না; আমাদের মানস-মৃত্যু ঘটত।

বস্তুতঃ এখানে এমন একটি সমাজ ছিল যার কোন জীবনীশক্তি ছিল না, যার অধিবাসীরা নিয়মের শৃংখলে শৃংখলিত ছিল। পরস্পরকে সাহায্য করতে তারা বাধ্য ছিল। সেখানে তাদের কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকতে হত: এমন কি, কি ভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে, কি ভাবে হাতমুখ ধুতে হবে, কিভাবে স্নান করতে হবে, দাঁত মাজতে হবে কি ভাবে, এইভাবে আমৃত্যু তাঁকে বিধি-নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। এই নিয়মের নিগড়ের বাইরে ছিল সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এবং প্রতিদিনই এইসব ক্ষমতাশালী নর-নারীদের মধ্য থেকে নতুন নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব

হোত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এদের কথা লেখা আছে। এক নারীর কাহিনী আছে—তিনি বয়স্কা ছিলেন, অস্বাভাবিক ছিল তাঁর চিন্তা, সব সময় তিনি নতুন ধরনের চিন্তা করতেন, কখনও কখনও তিনি অন্যের দ্বারা সমালোচিত হতেন, কিন্তু লোকে তাঁকে সমীহ করে চলত, নীরবে তাঁর নির্দেশ পালন করত। প্রাচীনকালে এ ধরনের নর-নারীর সংখ্যা অনেকই ছিল।

নিয়ম-শাসিত এই সমাজে ক্ষমতা ছিল পুরোহিতদের হাতে। সামাজিক স্তর-বিন্যাসে—পুরোহিতরাই হতেন বর্ণশ্রেষ্ঠ। তাঁদের যে কাজ ছিল—তাকে পুরোহিত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও শব্দে অভিহিত করতে আমি জানি না। অবশ্য এ দেশে যে অর্থে পুরোহিত শব্দটি ব্যবহৃত হয় আমাদের দেশে তা সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না, কারণ আমাদের দেশের পুরোহিতরা ধর্ম বা দর্শন শিক্ষা দিতেন না। সমাজের নির্দিষ্ট বিধি-বিধানগুলি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা ও পালন করাই পুরোহিতের কাজ ছিল। বিবাহ দেওয়া, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা ও উপাসনায় যোগ দেওয়া তাঁর কাজ ছিল। অর্থাৎ নর বা নারীর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বধরনের ক্রিয়াকর্মে তাঁকে থাকতেই হবে। সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য আশ্রমই ছিল শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হত।' এটাই ছিল নিয়ম। বিবাহ ছাড়া কোন মানুষেরই কোনরূপ ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার থাকত না। তাকে অর্ধ-মানুষ বলে বিবেচনা করা হোত। কোন কাজের অধিকারই তার থাকত না, এমন কি বিবাহ না করলে পুরোহিত নিজেই পুরোহিতের কাজ করতে পারত না। সমাজে অর্ধ-মানুষ বেমানান বলে বিবেচিত হত।

এ সময়ে পুরোহিতের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল।...আমাদের জাতির বিধান-কর্তাদের সাধারণ নীতিই ছিল পুরোহিতকে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া। এখন আপনারা যে ধরনের সামাজিক পরিকল্পনা করার চেষ্টা করছেন সে কালে ভারতে তাই ছিল যার ফলে এদের বেশী অর্থ-উপার্জন পথ নিয়ন্ত্রিত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, পুরোহিতদের সামাজিক মর্যাদাটাই বড় হোক, আর্থিক মর্যাদা নয়। মনে রাখবেন, পুরোহিতরা সর্ব দেশেই সামাজিক স্তরে সর্বোচ্চ স্থানে থাকেন, ভারতবর্ষেও অনুরূপ মর্যাদার জন্যই দরিদ্রতম ব্রাহ্মণ জন্মগত ভাবে দেশের সব চেয়ে বড় রাজার চেয়েও বেশী সম্মানার্হ। তিনিই ভারতবর্ষে মহান ব্যক্তি। কিন্তু অনুশাসন তাঁকে ধনী হতে দেবে না। সামাজিক অনুশাসন তাঁকে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করবে, আবার তাঁকে প্রাপ্য সম্মানও দেবে। তাঁদের জীবনাচরণের ক্ষেত্রে সহস্র নিষেধ ছিল, সমাজে যত উচ্চবর্ণ ভোগের সংখ্যাও ততই নিয়ন্ত্রিত। যার বর্ণ যত উচ্চ সে তত কম খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে পারবে, বর্ণ যত উঁচু খাদ্যের পরিমাণও তত কম হবে, তার বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগও কম হবে। আপনাদের কাছে তাঁদের জীবন একটি অন্তহীন কঠোরতার নিদর্শন বলে মনে হবে। আহারে-বিহারে, পানে সর্বত্র অফুরন্ত বিধিনিষেধ। এবং নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তিও নিম্নবর্ণের তুলনায় উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে শতগুণ বেশী ছিল। নিম্নতম বর্ণের কেউ মিথ্যা কথা বললে তার দণ্ড যদি এক ডলার হয় তো মিথ্যা ভাষণের জন্য ব্রাহ্মণের দণ্ড হবে একশ ডলার—কারণ সে যে বেশী জানত।

প্রারম্ভিক সময়ে এ ব্যবস্থাটি উত্তমই ছিল। কিন্তু উত্তরকালে এমন সময় এল যখন এই পুরোহিতরা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তাঁদের ক্ষমতার রহস্য দারিদ্র্যের মধ্যে নিহিত এই মূল কথাটাই ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন যে, তাঁরা এমন সব মানুষ যাঁদের জ্ঞান আহরণ, অধ্যাপন ও অনুধ্যানের জন্য সমাজ তাঁদের অসনে-বসনে তৈরী করে তুলেছে। কিন্তু কালক্রমে এ সবের বদলে তাঁরা সমাজে ধন আহরণের জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁরা অর্থগৃধ্নু অর্থাৎ আপনাদের ভাষায় money grabber হয়ে উঠলেন এবং এসব কথা বিস্মৃত হলেন।

এঁদের পরবর্তী দ্বিতীয় বর্ণ হোল ক্ষত্রিয়, রাজকীয় বর্ণ, এঁরা যোদ্ধ বর্ণের। এঁদের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা! শুধু তাই নয়—এঁরাই আমাদের দেশের সকল বড় বড় মনীষীর জন্ম দিয়েছেন—ব্রাহ্মণরা নন। এ খুবই অদ্ভুত ঘটনা। আমাদের দেশের সব অবতাররাই এই রাজার বর্ণ থেকে এসেছেন, একটিও ব্যতিক্রম ঘটেনি। মহান কৃষ্ণের জন্ম এই বর্ণে; রামও তাই; এবং আমাদের দেশের খ্যাতনামা সব দার্শনিকই রাজসিংহাসনে বসেছেন, এঁরাই পরবর্তী কালে ত্যাগব্রতী দার্শনিক হয়েছেন। ঐ রাজসিংহাসন থেকেই নিয়ত 'ত্যাগ কর' ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। এই যোদ্ধারাই দেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁরাই দার্শনিক আবার তাঁরাই উপনিষদের প্রবক্তা। চিন্তায়, ধীশক্তিতে এঁরা পুরোহিতদের তুলনায় উন্নত ছিলেন, তাঁরা অধিকতর শক্তিধর ছিলেন —ছিলেন রাজা, তবু পুরোহিতরা সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল এবং এঁদের ভীতি প্রদর্শনেরও চেষ্টা চালাত। ফলে পুরোহিত ও রাজা এই দুইয়ের মধ্যে, দুই বর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল।

আর একটি ব্যাপার আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার প্রথম ভাষণটি শুনেছেন, তাঁরা জানেন যে ভারতবর্ষে দুটি বড় জাতি আছে। একটিকে বলে আর্য, অপরটি অনার্য। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি বর্ণ, বাকীদের একটি নামেই অভিহিত করা হয়, তা হোল শূদ্র, তাঁরা বর্ণ নয়। তাঁরা আসলে আর্যই নয়। অনেক বিদেশী ভারতবর্ষে গিয়ে শূদ্রদেরই দেখেছেন—এঁরা ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী। যাই হোক এমন হতে লাগল যে অনার্যদের বিশাল জনসমষ্টি ও অন্যান্য সঙ্কর জাতিগোষ্ঠী ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠতে লাগল এবং আর্যদের অনুরূপ অধিকার লাভের জন্য প্রয়াসী হল। তারা আর্যদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশাধিকার চাইল, তারা আর্যদের মত পবিত্র উপবীত ধারণের অধিকার চাইল, আর্যদের মত ক্রিয়া কর্ম উৎসবাদি করার অধিকার চাইল, চাইল আর্যদের মত ধর্ম ও রাজনীতিতে সম অধিকার।

অবশ্য সকল ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বাভাবিক ভাবেই এই দাবির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলেন। দেখবেন, সব দেশেই পুরোহিতদের প্রকৃতিই এই—স্বাভাবিকতঃ তাঁরা সবচেয়ে বেশী রক্ষণশীল। আর যতদিন পৌরোহিত্য একটি বৃত্তি থাকবে ততদিন তাঁদের স্বার্থেই তাঁরা রক্ষণশীলতা বজায় রাখবেন। সুতরাং আর্য-জনতার বাইরের এই দাবি ও বিক্ষোভ দমন করার জন্য পুরোহিতগণ সর্ব-শক্তি নিয়োগ করলেন। আবার আর্যগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচণ্ড ধর্মদ্রোহ দেখা দিল, এই বিদ্রোহ পরিচালনা করলেন যোদ্ধবর্ণ।

ভারতবর্ষে জৈন নামের এক বর্ণগোষ্ঠী ছিল এবং এখনও পূর্বের মত তাঁরা সনাতনী রক্ষণশীল শক্তি। এঁরা খুব প্রাচীন গোষ্ঠী। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, বেদের প্রামাণিকতা এঁরা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা নিজেরাই গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন এবং বললেন: আমাদের গ্রন্থই একমাত্র মৌলিক গ্রন্থ, মূল বেদ, আর এখন বেদ নাম নিয়ে যে গ্রন্থ চালু আছে তা জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য ব্রাহ্মণদের রচনা অবশ্য তাদের কর্ম-পন্থাও একই ধরনের ছিল। মনে রাখবেন, নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে হিন্দুদের যুক্তি নিরসন করা সহজসাধ্য নয়। জৈনরাও দাবি করেছে যে, পৃথিবী এই সব শাস্ত্র গ্রন্থের মাধ্যমেই সৃষ্ট। এই সব গ্রন্থ জনসাধারণের ভাষায় লেখা হয়েছে। তখনই সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। আধুনিক ইতালীয় ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার যে সম্পর্ক দেখা যায় সংস্কৃতের সঙ্গে কথ্যভাষারও ঠিক সেই সম্পর্কই ছিল। তাই তাঁরা পালি ভাষায় তাঁদের গ্রন্থসমূহ রচনা করেন এবং যখন কোন ব্রাহ্মণ তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লেখা কেন?' উত্তরে তাঁরা বলতেন, 'সংস্কৃত মৃতের ভাষা।'

আবার আচরণবিধিতেও তাঁরা স্বতন্ত্র ছিলেন। বস্তুত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ এই বেদ এক বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ। এর কিছুটা স্থূল কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিকতা শেখানো হয়েছে তা ধর্মজ্ঞানে পূর্ণ। আর এসব সম্প্রদায়ের সকলের বেদের ঐ সার অংশটুকু প্রচার করে বলে দাবি করে থাকে। এখন, প্রাচীন বেদে আবার তিন স্তর আছে। প্রথমে কর্ম, দ্বিতীয়ে উপাসনা, তৃতীয়ে জ্ঞান। যখন মানুষ কর্ম ও উপাসনা দ্বারা নিজেকে পবিত্র করে তখন ঈশ্বর তার অন্তরে অধিষ্ঠিত হন। সে তখন অনুভব করতে পারে যে ঈশ্বর তার অন্তরেই আছেন। সে ঈশ্বরকে অন্তরে দেখতে পায় কারণ তার মন কর্ম ও উপাসনার সাহায্যে পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে। এটাই সব। মুক্তি তখন তার করায়ত্ত। আমরা এ কথা জানি না। অতএব কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিনটিই স্তর। কর্মদ্বারা অপরের শুভ করা বোঝায়। অবশ্যই এ কথার মধ্যে কিছু তাৎপর্য আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কাছে কর্ম কথার অর্থ হোল এই সব বহুল বিস্তৃত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা: গো, বৃষ, ছাগ আদি প্রাণীকে বলিদান বা যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা। জৈনরা এসে ঘোষণা করলেন, 'এসব কোন কর্মই নয়, কারণ অন্যকে আঘাত দেওয়া কখন কর্ম হতে পারে না।' তাঁরা আরো বললেন, 'তোমাদের বেদ যে মিথ্যা এটাই তার প্রমাণ, এসব পুরোহিতদের কথা কারণ কোনও সৎ গ্রন্থই মানুষকে প্রাণিহত্যা বা এ ধরনের কাজ করতে বলতে পারে না। ও সবকে বিশ্বাস করো না। তাই এইসব প্রাণিহত্যা ও অন্যান্য কর্মের কথা ব্রাহ্মণদের দ্বারা লিখিত কারণ এর দ্বারা তারা কেবল লাভবান হতেন। কেবল এই পুরোহিতরাই টাকা পকেটে পুরে বাড়ী চলে যায়! কাজেই এসব পুরোহিতদের কারসাজ।

জৈনদের আর একটি মত হোল, ভগবানের অস্তিত্ব নেই: 'পুরোহিতরাই ঈশ্বরের আবিষ্কর্তা, সাধারণ মানুষ যাতে ভগবানকে বিশ্বাস করে তাদের অর্থ দেয় তাই তাঁরা এদের সৃষ্টি করেছেন। সবই বাজে ব্যাপার, ভগবান বলে কিছুই নেই। প্রকৃতিজগৎ আছে আর আছে আত্মা, ব্যাস এই-ই সব কিছু। আত্মা এই জীবনের সঙ্গে একীভূত

হয়ে আছে, আর যাকে দেহ বলা হয় তা বসনের মত তাকে ঘিরে আছে। যাও, এখন সৎ কর্ম কর।' এই মতবাদ থেকেই স্বাভাবিক ভাবেই যা কিছু জড় তাই খারাপ এই ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। এরাই কৃচ্ছ্রসাধনার প্রথম শিক্ষক। দেহ যদি অশুদ্ধতার ফল হয় তো দেহ অপকৃষ্ট বস্তু হবে না কেন? কেউ যদি কিছুক্ষণের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—'বেশ, সেটা তার শাস্তিস্বরূপ।' যদি অকস্মাৎ দেয়ালে মাথা ঠুকে যায় তবে—'বাঃ বেশ, এটিও খুব ভাল শাস্তি।' একদা ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পুরুষ এদের অন্যতম সেই ফ্রান্সিস তাঁর একজন সঙ্গীকে নিয়ে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন; তাঁরা দুজনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, বিষয় ছিল সেই ব্যক্তি তাঁদের অভ্যর্থনা সহ গ্রহণ করবেন কি না। সহযাত্রী বললেন যে সম্ভবতঃ তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন। সেই ফ্রান্সিস বললেন: 'বন্ধু, এটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমরা যখন তাঁর দ্বারে গিয়ে করাঘাত করি এবং যদি তখন বেরিয়ে এসে আমাদের ঠেলে তাড়িয়ে দেন তবেও তা যথেষ্ট হবে না। তিনি যদি একে আমাদের বেঁধে ফেলার আদেশ দেন এবং আগাগোড়া বেত্রাঘাত করেন তবুও তা যথেষ্ট হবে না। তবে তিনি যদি আমাদের হাত-পা বেঁধে আমাদের রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত চালিয়ে যান এবং রক্তাপ্লুত আমাদের বাইরে বরফের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন তা হলেই তা যথেষ্ট হবে।'

ঠিক এই ধরনের কৃচ্ছ্রতার ধারণা সেই সময় প্রচলিত ছিল। এই জৈনরাই প্রথম সবচেয়ে বড় কৃচ্ছ্রতার সাধক, তবে তাঁরা কিছু বড় কাজও করেছেন।

"কারোকে আঘাত করো না, যথাশক্তি অন্যের উপকার কর, এই-ই নীতিবোধ ও সদাচার, এসকলই কর্ম বাকী সব কিছুই বাজে জিনিস—ব্রাহ্মণরা তৈরী করেছেন। সেসব বর্জন কর।" এই বলে তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত হলেন এবং এই একটি নীতিকেই পূর্বাপর বিস্তৃত করে চললেন। এ এক আশ্চর্য আদর্শ: আমরা আঘাত না করা ও সদাচার পালন করাকে নৈতিকতা বলে থাকি, আর তা থেকেই এঁরা এক মহান আদর্শ গড়ে তুলল।

বুদ্ধের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আর বুদ্ধদেব খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচশ বছর পূর্বে জন্মেছিলেন। এই জৈনরা সমগ্র প্রাণিজগৎকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন: নিম্নতম প্রাণীর একটি মাত্র ইন্দ্রিয়, সেটি স্পর্শেন্দ্রিয়। তার উপরের স্তরের রয়েছে স্পর্শ ও আস্বাদন ইন্দ্রিয়। তারও উপরে স্পর্শ স্বাদ ও শ্রবণেন্দ্রিয়। পরবর্তী স্তরে স্পর্শ, স্বাদ, শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়। তারপরের স্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়-যুক্ত প্রাণী। প্রথম দুটি স্তর, এক বা দুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্টদের খালি চোখে দেখা যায় না, এবং তারা জলের সর্বত্র থাকে। এদের এই অতি নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদের হত্যা করা অতি ভয়াবহ কার্য। আধুনিক বিশ্বে এই অণুপ্রমাণ জীবের তত্ত্ব মাত্র গত বিশ বছরে জানা গেছে, এর আগে কেউই এদের সম্পর্কে কিছু জানতেন না। জৈনরা জানতেন যে, নিম্নতম স্তরের প্রাণীরা এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, তা হোল স্পর্শেন্দ্রিয়, আর কিছু নয়। পরবর্তী বৃহত্তর স্তরও অদৃশ্য। তাঁরা আরও জানতেন যে আমরা যদি জল ফুটিয়ে পান করি তবে এরা সব মারা যাবে। সুতরাং এই সন্ন্যাসীরা তৃষ্ণায় মরে

গেলেও জল ফুটিয়ে পান করবে না। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে জল যাচ্ঞা করলে, তিনি যদি তাঁকে ফুটানো জল দিতেন এঁরা তা পান করতেন কারণ প্রাণিহত্যার পাপটা তখন গৃহস্থের—জলপানের এই সুযোগটি শুধু এঁরা গ্রহণ করছেন। প্রাণিবধের ধারণাটিকে তাঁরা এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন, স্নান করলে গাত্রমার্জনার সময় অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে তাই কখনও স্নান করবেন না। এঁরা নিজেরাই মরতে প্রস্তুত ছিলেন কারণ মৃত্যু এঁদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার ছিল। আর অন্য প্রাণীকে বধ করার বিনিময়ে ওঁরা বেঁচে থাকতে চাইতেন না।

এই জৈনরা সেই ভারতবর্ষে ছিলেন। কৃচ্ছ্র সাধনার অপরাপর বহু সম্প্রদায় তখন ছিল, এবং তখন একদিকে যখন এইসব চলছিল অন্যদিকে তখন পুরোহিত ও রাজাদের রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব দানা বাঁধছিল। আর তখনই এইসব বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হচ্ছিল। আরও বড় এক সমস্যা তখন ছিল: জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ আর্যমত সমান অধিকার দাবি করছিল। প্রকৃতির নিত্য প্রবহমান স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে জলপানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া তাঁদের কাছে অসহ্য লাগছিল।

এই সময়েই সেই মানুষটির জন্ম হোল—সেই মহামানব বুদ্ধ। আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সম্পর্কে, তাঁর জীবন সম্পর্কে অবগত আছেন। সাধারণতঃ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যে অলৌকিকতা ও গল্পকথা প্রচারিত হয় বুদ্ধ সম্পর্কেও তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথমতঃ ইতিহাস স্বীকৃত মহাপুরুষগণের অন্যতম। দুজন মহাপুরুষই ঐতিহাসিক—এক সুপ্রাচীন বুদ্ধদেব, অপরজন মহম্মদ, শত্রুমিত্র উভয়েই এঁদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে একমত। অতএব আমরা স্থির নিশ্চিত যে এ ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ছিল। অন্যদের সম্পর্কে আমরা শুধু তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যদের উক্তি উদ্ধৃত করা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না। আমাদের কৃষ্ণ—আপনারা জানেন তিনি একজন হিন্দু অবতার, তাঁর অস্তিত্ব পুরাণ কাহিনী নির্ভর। তাঁর জীবনের এক বৃহদংশ এবং তৎসম্পর্কীয় সব কিছুই কেবলমাত্র তাঁর শিষ্যদের লেখা, মনে হয় এরপরে আরও তিন চার জনের জীবনকথা একীকৃত হয়ে গেছে। আমরা অনেক অবতার সম্পর্কেই খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু এই বুদ্ধদেবের সম্পর্কে যেহেতু শত্রু-মিত্র উভয়েই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাই তাঁর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। এবং এ জগতে মহামানবদের সম্পর্কে সাধারণতঃ যেসব গল্পকথা ও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত সে সবগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যাবে যে বাহ্য কাহিনীসমূহের অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সত্তা, একটি অন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে। কিন্তু এই মানুষটির সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন নি, কখনও না! এর দ্বারা বোঝা যায় যে যখনই কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে কোন গল্পকথা গড়ে ওঠে তখনই তা সেই মহাপুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনুরঞ্জিত হয়। বুদ্ধদেবের বেলায় এই ধরনের কাহিনীতে তাঁর সম্পর্কে কোনও দোষ বা নীতিহীনতার কথা নেই। এমনকি তাঁর শত্রুরাও তাঁর সম্পর্কে অনুকূল মূল্যায়ন করেছে।

বুদ্ধদেবের জন্ম থেকেই তিনি এত পবিত্র ছিলেন যে, যেই তাঁর মুখশ্রী দর্শন করেছে সেই ধর্মকর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল ও পরিত্রাণ লাভ করেছিল। অতএব দেবতারা এক সভা ডাকলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা অসহায়'। কারণ দেবতাদের অধিকাংশই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এইসব যজ্ঞানুষ্ঠান দেবতাদের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হত, আর সেসবই চলে গেল। তাদের ক্ষমতা চলে যাওয়ার কারণেই দেবতারা অনশনে কাটাতে লাগলেন। তাই দেবতারা ঘোষণা করেছিলেন, "যেমন করেই হোক বুদ্ধকে পতিত করতে হবে। তার পবিত্রতা আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে খুবই মারাত্মক।" এবং তখন দেবতারা এসে বললেন, "ভো মহাশয়, আমরা তোমাকে কিছু নিবেদন করতে এসেছি। আমরা একটি বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করতে চাই, সে জন্য একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, এই অগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য আমরা সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছি তবু প্রজ্জ্বলনযোগ্য পবিত্র স্থান খুঁজে পেলাম না, এখনই আমরা সে স্থানের সন্ধান পেলাম। তুমি যদি শায়িত হও তবে তোমার বক্ষের উপরে আমরা সে অগ্নি জ্বালতে পারি।"

বুদ্ধদেব বললেন, "তথাস্তু। যজ্ঞ আরম্ভ করুন।" তখন দেবতারা বুদ্ধের বুকের উপর সুউচ্চ লেলিহান অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন, এবং ভাবলেন যে বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তা হল না। বুদ্ধ মরলেন না। তখন তাঁরা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলতে লাগলেন, "হায় আমরা ব্যর্থ।" সমস্ত দেবতারা মিলে তখন তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই হল না। তাঁরা তাঁকে হত্যা করতে পারলেন না। তখন অগ্নিকুণ্ডের নীচে থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আপনারা এসব বৃথা চেষ্টা করছেন কেন?" উত্তর হল, "যেই তোমার দর্শন লাভ করে সেই পবিত্র হয়ে যায়, আর কেউই আমাদের উপাসনা করে না।" বুদ্ধ বললেন, "তাহলে আপনাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ, কারণ পবিত্রতাকে হত্যা করা যায় না।" এই উপকথাটি বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের লেখা। এবং সমগ্র উপকথাটির মধ্য দিয়ে বুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি দোষই আরোপিত হয়েছে, সে হল তিনি কেবলমাত্র শুদ্ধতারই বড় প্রচারক ছিলেন।

তাঁর মতবাদ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য কিছু জানেন। আপনারা যাঁদের অজ্ঞেয়বাদী বলে থাকেন সেই সব আধুনিক মনীষীদের অনেকের কাছেই তাঁর মতবাদের আবেদন আছে। মানবজাতির বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান্ প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর বক্তব্য, "আর্য বা অনার্য, বর্ণ বা বর্ণহীন, যে কোনও সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে ঈশ্বর, ধর্ম ও স্বাধীনতার উপর। তোমরা সকলে এগিয়ে এস।" কিন্তু এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তিনি ছিলেন কঠোর অজ্ঞেয়বাদী। বলতেন "বাস্তববাদী হও।" এক সময় জাতে ব্রাহ্মণ পাঁচজন যুবক একটি প্রশ্নে তর্কবিতর্ক করতে করতে তাঁর কাছে এল। সত্যলাভের পন্থা কি, এই ছিল তাদের প্রশ্ন। তাদের মধ্যে একজন বলল, "আমার পূর্বপুরুষরা সত্যলাভের এই পথের কথা বলেছেন, এটাই পথ।" অপর একজন বলল, "আমি এ ধরনের শিক্ষা পেয়েছি, এবং এটিই একমাত্র পথ।" "হে আচার্য, এখন বলুন কোনটি সঠিক পথ।"

"আচ্ছা, তুমি বলছ তোমার পূর্বপুরুষরা শিখিয়েছেন যে এটি সত্য, এবং এটিই ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি কি ভগবানকে দেখেছ ?"

"না, প্রভু।"

"তাঁরা কেউ ঈশ্বরকে দেখেন নি ?"

"না, দেখেন নি।"

"বেশ, তোমাদের শিক্ষকরা, তাঁরাও কেউ ঈশ্বর-দর্শন করেন নি ?"

"না।"

বুদ্ধ অন্যদেরও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সকলেই ঘোষণা করল যে কেউই ভগবানকে দেখেনি।

বুদ্ধ বললেন, "বেশ, একবার এক গ্রামে একটি তরুণ কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বিলাপ করতে করতে এসে উপস্থিত হল। সে বলছে, 'ও হো হো, আমি তাকে কত ভালবাসি, আমি তাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসি।' তখন গ্রামবাসীরা এসে উপস্থিত, তারা জিজ্ঞেস করল 'কাকে তুমি ভালবাস ? কে সে ?' 'তা আমি জানি না, তবে আমি তাকে খুবই ভালবাসি।' এই বলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে তরুণরা, এই যুবকটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি ?" তারা সবাই সমস্বরে বলল, "কেন মশাই, ও তো একটি আস্ত নির্বোধ। নইলে যে নারীকে কখনই দেখেনি তার সম্পর্কে অমন উচ্চৈস্বরে কান্নাকাটি করা বা তাঁর অস্তিত্ব আছে কি কি নেই তা না জেনেই বা তাকে না দেখেই ভালবাসা, এসব কি ?" "তোমরাও কি একই রকম নও ? তোমরা বলছ যে এই ঈশ্বরকে তোমার পিতা বা পিতামহ কেউই কখনও দেখেননি, আর এখন এমন এক বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছ যার সম্পর্কে তোমরা বা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কেউই কিছু জানেন না এবং এই নিয়ে তোমরা একে অপরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চাইছ।" তখন সেই তরুণরা জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে এখন আমাদের কি করা উচিত তাই বলুন ?" বুদ্ধ বললেন, "তাহলে আমায় বল, তোমাদের পূর্বপুরুষরা কি কখনও শিখিয়েছেন যে ভগবান কোপনস্বভাব ?"

"না, মহাশয়।"

"তোমাদের পূর্বপুরুষরা কি বলেছেন যে ভগবান অসৎ প্রকৃতির ?"

"না, মহাশয়, তিনি চির পবিত্র।"

"বেশ, এখন এই সব আলোচনা না করে পরস্পরের টুঁটি না টিপে তোমরা যদি সৎ হও, পবিত্র হও, তবে তোমরা কি মনে কর না যে তোমরা সেজন্যই ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারবে। তাই আমি বলি : পবিত্র হও, সৎ হও, শুদ্ধ হও আর সকলকে ভালোবাসো, এইই সব, এই সার কথা।"

মনে রাখবেন, বুদ্ধের জন্মের সময়েই প্রাণিহত্যা না করা বা জীবে দয়া প্রদর্শন করার নীতি আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদের জন্য তিনি যে প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন সেটিই ছিল নতুন কিছু। অন্য যে নতুন

জিনিস তিনি করেছিলেন, তা হোল: তিনি তাঁর চল্লিশ জন শিষ্যকে পৃথিবীর নানাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "বৎসগণ, যাও সকল জাতি ও দেশের মানুষের সঙ্গে মিশবে এবং সকলের কল্যাণের জন্য, শুভর জন্য চমৎকার এ বাণী প্রচার করবে।" অবশ্য তিনি এজন্য হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হন নি। তিনি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি অতি কঠোর জীবন যাপন করেছেন, কখনও তিনি দুর্বলতার কাছে নতি স্বীকার করেন নি। আমি তাঁর বহু মতবাদকে বিশ্বাস করি না। না, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যে প্রাচীন হিন্দুদের বেদান্তবাদ আরও অধিক চিন্তাপূর্ণ, তা জীবনদর্শনের আরও চমৎকার নিদর্শন। আমি তাঁর কর্মপদ্ধতি পছন্দ করি, কিন্তু আমি তাঁর যে জিনিসটি সর্বাধিক পছন্দ করি তা হচ্ছে মানবজাতির সমস্ত মহামানবদের মধ্যে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যাঁর মস্তিষ্কে কোনরূপ জটিলতা ছিল না, এবং ছিলেন দৃঢ় ও বুদ্ধিমান। যখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য তাঁর পাদমূলে তখনও তিনি একই মানুষ, একই তাঁর মনোভাব 'আমি দশজনেরই মত একজন মানুষ'। আপনারা জানেন, হিন্দুরা মানুষ পূজার জন্য দেহত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে। যদি আপনারা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকেন তবে দেখতে পাবেন আমি তাঁদের দ্বারা পূজিত হচ্ছি। যদি কেউ তাঁদের ধর্মশিক্ষা দিতে যায় তো মৃত্যু পূর্বে সে তাঁদের পূজো পাবে। কাউকে না কাউকে তাঁরা সব সময়ই পূজা করবেই। অথচ তাঁদের মধ্যে বাস করেই জগৎবিখ্যাত বুদ্ধ আজীবন একথাই বলে গেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। মনুষ্য ব্যতীত তিনি অন্য কিছু এ ধরনের কথা তার কোন ভক্তই তাঁর মুখ দিয়ে বার করতে পারেন নি।

তাঁর অন্তিম কথাগুলি সর্বদাই আমার হৃদয়ে আনন্দ স্পন্দন সৃষ্টি করে। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, তিনি ছিলেন রুগ্ন, ছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী, ঠিক সেই সময়ে একজন অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল; যে গলিত মাংসভোজী। হিন্দুরা সেই জাতের কাউকে লোকালয়ে প্রবেশ করতে দেয় না। সেই জাতের একজন সশিষ্য বুদ্ধকে তাঁর বাড়িতে রাত্রের আহার গ্রহণ করার নিমন্ত্রণ করেছিল, সেই হতভাগ্য চন্দা, সে তাঁর মহান শিক্ষককে তাঁর যথাসাধ্য উত্তম আপ্যায়নে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল। তাই সে তাঁর জন্য প্রচুর শূকর মাংস ও অন্ন প্রস্তুত করেছিল, আর বুদ্ধ একবার সেই আহার্যের দিকে তাকালেন। শিষ্যরা সকলেই ইতস্ততঃ করছিল, প্রভু বুদ্ধ বললেন: "ঠিক আছে, তোমরা আহার ক'রো না, তোমাদের তাতে আঘাত লাগতে পারে।" এই বলে তিনি শান্তভাবে আসন গ্রহণ করলেন ও তা আহার করলেন।

সমদর্শনের শিক্ষক তিনি, তাঁকে যে অন্ত্যজ চন্দার ভোজ গ্রহণ করতেই হবে, হোক তা শূকর মাংস। তিনি বসে পড়লেন, তা আহার করলেন।

তিনি তখন মরণাপন্ন। মৃত্যু আসন্ন উপলব্ধি করে বললেন, "ঐ বৃক্ষের নিচে আমার জন্য কিছু বিছিয়ে দাও, আমি বুঝতে পারছি আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে।" এবং তখন তিনি সেই বৃক্ষমূলে গেলেন, সেখানে শয্যাগ্রহণ করলেন, তিনি কোনক্রমেই আর বসে থাকতে পারছিলেন না। সেখানে গিয়েই তিনি প্রথম যা করলেন তা হোল, তিনি বললেন, "ওই চন্দার কাছে গিয়ে তাকে বল যে সে

আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু, তার খাদ্য গ্রহণ করেই আমি নির্বাণ লাভ করতে চলেছি।" এর পরে অনেক লোক তাঁর কাছে উপদেশ লাভের জন্য এসেছিল, একজন শিষ্য তাদের বলল, "প্রভুর কাছে তোমরা যেও না, তিনি এখন মহানির্বাণ লাভ করতে চলেছেন।" এবং সেকথা শোনামাত্র ভগবান বুদ্ধ বলে উঠলেন, "ওদের আসতে দাও।" আবার কিছু লোক এল, তখন শিষ্যরা তাদের বাধা দিল। কিন্তু তারা আসতেই লাগল। তখন মৃত্যুপথযাত্রী ভগবান বুদ্ধ বললেন, "বৎস আনন্দ, আমি চলে যাচ্ছি, আমার জন্য শোক ক'রো না। আমার জন্য চিন্তা ক'রো না। আমি গত হলাম। তোমরা নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা কর। আমি যা তোমরা প্রত্যেকেই ঠিক তা-ই। আমি তোমাদেরই একজন ছাড়া আর কিছু নই। আমি আজ যা হয়েছি তা আমার নিজেকে তৈরী করতে হয়েছে। কষ্ট কর, আমি যা হতে পেরেছি তোমরাও তা হতে পারবে।"

বুদ্ধের চিরস্মরণীয় বাণী হল: "শাস্ত্রগ্রন্থ প্রাচীন বলেই তাকে প্রামাণ্য বলে বিশ্বাস ক'রো না। তোমার পূর্বপুরুষরা বলেছে তোমার বিশ্বাস করা উচিত একথা মেনে নিও না। তোমার মত অন্যান্য ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে বলেই তুমি তা বিশ্বাস ক'রো না। সবকিছু পরীক্ষা কর, যাচাই কর, তারপর বিশ্বাস কর। তারপর তুমি যদি মনে কর যে তা বহুজনের হিতসাধন করবে, তাহলে সকলকে তা বিতরণ কর।" এই বাণী উচ্চারণ করেই প্রভু বুদ্ধ নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এই মানুষটির স্থিতপ্রজ্ঞা লক্ষ্য করুন। তিনি দেবতা নন, দেবদূত নন, দানব নন—কিছু নন। এসব কিছুই নন। তিনি শুধু দৃঢ়চিত্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি—মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ পরিপূর্ণ নিখুঁত, অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্তও তাই। কোনও বিভ্রম তাতে নেই। আমি তাঁর মতবাদের অনেক কিছুর সঙ্গেই একমত নই। আপনারাও অনেকে হয়ত একমত হতে পারবেন না। কিন্তু আমায় মত হোল—ওহো তাঁর মহাশক্তির এক বিন্দুও যদি আমি পেতাম! পৃথিবীতে যত দার্শনিক এসেছেন তাঁর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী স্থিতপ্রাজ্ঞ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাজ্ঞতম শিক্ষক। এবং এই মানুষটি কখনও নত হননি, এমনকি অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের কাছেও নয়। কখনও তিনি নত হন নি। সহজ ঋজু সর্বত্রই একরকম: দুঃখীর জন্য অশ্রুমোচন করছেন, দুঃখীকে সাহায্য করছেন, সঙ্গীতের আসরে সঙ্গীতজ্ঞ, শক্তের কাছে শক্ত এবং সর্বত্র সেই একই স্থিতপ্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানী মানুষটি।

এবং এসব সত্ত্বেও আমি তাঁর মতবাদ বুঝতে পারি না। আপনারা জানেন হিন্দু-মতে মানুষের যে আত্মা তাকে তিনি স্বীকার করতেন না। এখন, আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা স্থায়ী, যা অপরিবর্তনীয়, যা অনন্তকাল স্থায়ী থাকে। মানুষের এই পদার্থটিকেই আমরা বলি আত্মা, এর আদি নেই, অন্তও নেই। আমরা আরও বিশ্বাস করি, প্রকৃতিতেও এমন কিছু আছে যা চিরস্থায়ী, তাকেই আমরা ব্রহ্ম বলি, এরও আদি অন্ত কিছুই নেই। কিন্তু বুদ্ধদেব উভয়কেই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলতেন, কোন বস্তুরই চিরস্থায়িত্বের কোন প্রামাণিকতা নেই। এসব কিছু নিতান্তই পরিবর্তনের সমষ্টি। নিত্যপরিবর্তনশীল চিন্তার

সমষ্টিকেই আমরা মন বলি। একটি মশাল যেন একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করছে। কিন্তু ঐ অলাতচক্রটি মায়া। অথবা নদীর উপমা গ্রহণ করা যাক। নদী নিয়তই বয়ে চলেছে, প্রত্যেক মুহূর্তেই নতুন নতুন জলরাশি প্রবাহিত হচ্ছে। জীবনও অনুরূপ, সমস্ত দেহ, মন সবই এইরকম।

তবে, আমি তাঁর মতবাদ বুঝতে পারি না—আমরা হিন্দুরা কখনই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। কিন্তু আমি এর পিছনের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারি। অহো, কি বিরাট মহান সে উদ্দেশ্য। প্রভু বুদ্ধ বলতেন যে স্বার্থপরতাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। স্বার্থযুক্ত উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। একটি নদীর মত আমরা প্রবাহিত হয়ে চলেছি—এ এক চলমান ঘটনা। ঈশ্বর নয়, আত্মা নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াও। সংকাজ করার জন্যই সংকাজ কর কোনও শাস্তির ভয়ে নয়, কোনও আকাঙ্ক্ষিত লোকে যাবার জন্যও নয়।

সুবুদ্ধি নিয়ে, মতলব ছেড়ে দাঁড়াও। উদ্দেশ্য হবে : সংকাজ করা ভাল এজন্যই আমি সংকাজ করতে চাই। অসাধারণ! অদ্ভুত! আমি তার আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্পর্কে মোটেই সহানুভূতিশীল নই; কিন্তু যখন আমি তাঁর নৈতিক শক্তির কথা ভাবি তখন ঈর্ষা অনুভব করি। নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন, তাঁর মত সামর্থ্য ও সাহস নিয়ে আপনাদের একজনও এক ঘণ্টা অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন কিনা। আমি তো পাঁচ মিনিট থাকতে পারিনা। আমি ভীরু হয়ে পড়ি, একটা কিছু অবলম্বন চাই। আমি দুর্বল—আমি ভীরু। এবং আমি এই প্রচণ্ড শক্তিধর সম্পর্কে চিন্তা করে উষ্ণতা পাই। সেই শক্তির কাছাকাছি যাওয়ারও ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে পৃথিবী এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেনি। আমি নিজে এখন পর্যন্ত তাঁর মত শক্তিধরের সাক্ষাৎ পাইনি। আমরা সবাই জন্মভীরু। আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারলে অন্য কিছুর দিকে ফিরেও তাকাই না। সব সময়ে অন্তরে রয়েছে প্রচণ্ড ভয়, অতীব উদ্দেশ্যপরায়ণতা। আমাদের নিজ নিজ স্বার্থপরতা আমাদের জঘন্য ভীরু করে তুলেছে, আমাদের স্বকীয় স্বার্থপরতাই ভয় ও ভীরুতার বড় কারণ। এবং এর মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি বলছেন সৎ বলেই সংকার্য কর। আর প্রশ্ন করো না, ওই-ই যথেষ্ট। গল্পে, উপাখ্যানে, সংস্কার সহায়ে মানুষকে সংকার্যে প্রণোদিত করা হয়ে থাকে। তবু সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে অসংকার্যে প্রবৃত্ত হবে। যে সংকার্য করার জন্যই সদনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তিই সৎ এবং এই-ই মানুষের প্রকৃত চরিত্র।

প্রভু বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হল, "মৃত্যুর পর মানুষের কি অবশিষ্ট থাকে?"

"সব কিছুই থাকে, সব কিছু। কিন্তু মানুষের অন্তরস্থিত বস্তুটি কি? দেহ নয়, আত্মা নয়, তা হোল চরিত্র। এই চরিত্রই সর্বকালের জন্য টিঁকে থাকে। যাঁরা তিরোহিত হয়েছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা সকলেই আমাদের জন্য তাঁদের চরিত্র-মাহাত্ম্য রেখে গেছেন, মানবজাতির জন্য অনন্ত সম্পদ এই সব চরিত্র; আর এই চরিত্র প্রভাবই কাজ করে চলেছে, কালাতিক্রমী কাজ। বুদ্ধই বা কি, নাজারেথের যীশুই বা কি? সমগ্র বিশ্ব তাঁদের চরিত্র মহিমায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য শক্তিময় তাঁদের মতবাদ;

আসুন আমরা একটু আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে যাই, প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়ে পৌঁছুই-ই নি (সকলের হাস্য)। তাই আজ এ সন্ধ্যায় আমাকে অবশ্যই আরো কয়েকটি কথা না বললেই নয়।···

এখন, তিনি কি করেছিলেন। তাঁর কর্মপদ্ধতি কি—সংগঠন প্রক্রিয়া কি? আজ আপনারা গির্জা সম্পর্কে যে ধারণা পান—তা তাঁরই চরিত্রের অনুরূপ। তিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছিলেন। সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করে একটি সংঘ তৈরী করেছিলেন। সেই সংঘে খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশত ষাট বৎসর পূর্বেও ব্যালটে ভোটদানের ব্যবস্থা ছিল। নিখুঁত সংগঠন। প্রচলিত ধর্মপীঠ ছেড়ে এই নূতন সংঘ প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয় এবং ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রভূত সেবামূলক কাজ করেছিল। এর তিনশত বৎসর পরে খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত বছর পূর্বে মহান সম্রাট অশোক আবির্ভূত হলেন, আপনাদের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা যাঁকে দেবোপম সম্রাট বলেছেন সেই অশোক পুরোপুরি বৌদ্ধ মতে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন, এবং তিনি তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাটে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন আলেকজান্দারের সমসাময়িক, আর এই আলেকজান্দারের সময় থেকে ভারতবর্ষ গ্রীক দেশের সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গ সম্পর্কে অন্বিত ছিল।···এখন প্রায় প্রত্যহই মধ্য এশিয়ায় কোন না কোন শিলালিপি বা অনুরূপ কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষ বুদ্ধ বা অশোক বা সব কিছুর কথাই ভুলে গেছে। অথচ এখানে স্তম্ভগাত্রে, শিলাখণ্ডে প্রাচীন হরফে বহু বাণী উৎকলিত ছিল, যার পাঠোদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। মুঘল সম্রাটদের কেউ কেউ ঘোষণা করেছিলেন যে, যে কেউ এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবে তাকেই নিযুত মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হবে। গত তিরিশ বছরের মধ্যে মাত্র যেসব লিপির পাঠ উদ্ধার হয়েছে, সে সকল পালি ভাষায় লেখা।

প্রথম শিলালিপিটি হোল: '...'

অতঃপর যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দুঃখের কথা বিবৃত করে শিলালিপি লেখা হয়েছে। এরপরই অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন: "এখন থেকে আমার বংশধরদের কেউই জাতি বিজয়ের মাধ্যমে যশোলাভের অভিলাষ করতে পারবে না। তারা যদি যশ চায় তো তারা যেন অন্য জাতিকে সাহায্য করে, তারা যেন বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও ধর্মের শিক্ষকদের প্রেরণ করে। তরবারির সাহায্যে যে যশ পাওয়া যায়, তা যশই নয়।" আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এরপরই তিনি আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত ধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেছিলেন। আর ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে কি দ্রুততার সঙ্গে দেশের সেই সব অঞ্চলে ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—এরা থেরাপুত্ত, এসিনি প্রভৃতি নামে খ্যাত। এই সব সম্প্রদায় কঠোর নিরামিষাশী। এই মহান্ সম্রাট অশোক—মানুষ ও পশু উভয়ের জন্যই চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। নানা শিলালিপিতে এই সব চিকিৎসালয় স্থাপনের নির্দেশ দেখা যায়। অর্থাৎ যখন কোন গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়বে এবং দারিদ্র্য হেতু তার প্রতিপালন সম্ভব হবে না, তখন তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে হত্যা না করে এই হাসপাতালে

পাঠাতে হবে। সেসব চিকিৎসালয় জনসাধারণের দানেই পরিচালিত হত। বহির্বাণিজ্যের ব্যবসায়ীরা বিক্রীত বস্তুর ওজনের উপর যে শুল্ক দিত তা সবই এইসব হাসপাতাল পরিচালনায় ব্যয়িত হত, তাতে কারো ওপর হাত পড়ত না। তোমার গাভীটি বৃদ্ধ হয়েছে বা অন্য-কোনভাবে অসমর্থ, তুমি আর তাকে ঘরে রাখতে চাও না, তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও, তারা তাকে রেখে দেবে, এমনকি ছোট বড় সব ধরনের ইঁদুর বা বিড়াল পর্যন্ত তুমি পাঠাতে পার। আপনারা জানেন যে, আমাদের ঘরের মেয়েরা এদের মেরে ফেলে। তারা প্রায়শই দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে বিষাক্ত খাদ্য প্রয়োগে এই সব জীবদের মেরে ফেলে। কিন্তু অশোক বলতেন সরকার যেমন মানুষের জীবন রক্ষা করবে সেইরূপ পশুপক্ষীর জীবন রক্ষাও তার দায়িত্ব। প্রাণিহত্যা কেন বরদাস্ত করা হবে? প্রাণিহত্যার কোন হেতু নেই। তিনি বলেন, মানুষের আহার্য হিসাবে পশুহত্যা নিষিদ্ধ করতে হলে তার জন্য উপযুক্ত সবজির ব্যবস্থা করতে হবে। তাই তিনি সবধরনের সবজি সংগ্রহ করতে লোক পাঠালেন, সংগ্রহ করলেন এবং ভারতবর্ষে তার চাষ করলেন। এবং যেইমাত্র চাষ-আবাদ শেষ হল সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারি করলেন: এখন থেকে যে প্রাণীহত্যা করবে তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে। সরকারকে যোগ্য প্রশাসক হতে হবে; প্রাণিদেরও অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। নিজের আহারের জন্য গো ছাগ বা অন্য প্রাণী হত্যা করার কি অধিকার মানুষের আছে?

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মতবাদ একটি অসাধারণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল। কালক্রমে অবশ্য এই প্রবল ধর্মপ্রচারের ধারা বিপর্যস্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবে ধর্মপ্রচারের জন্য তাদের কখনই তরবারি ধারণ করতে হয়নি; তাদের এই কৃতিত্বের উল্লেখ করতেই হবে। একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ছাড়া জগতে আর কোনও ধর্মই রক্তপাত না করে এক পা'ও অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। আর কোন ধর্মই কেবলমাত্র বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে—শত সহস্র মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। না, কোন যুগে কোন কালে কেউ তা পারে নি। এখন আপনারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ঠিক এ জিনিসটিই করতে চলেছেন। আপনাদের পদ্ধতি হোল, তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরিত কর। আপনাদের ধর্মযাজকরা এই-ই প্রচার করছেন। তাদের জয় করে, হত্যা করে ধর্মান্তরিত কর। ধর্মপ্রচারের এক বিচিত্র প্রণালীই বটে!

আপনারা জানেন, কিভাবে মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই মহান্ সম্রাট তার যৌবনকালে খুব একটা ভাল ছিলেন না। তাঁরা দু-ভাই ছিলেন। দুই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই ছিল, অন্য ভাই অশোককে পরাস্ত করল, তখন সম্রাট অশোক প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন। তিনি খবর পেলেন যে তাঁর ভাই এক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কত যে পবিত্র তা আমি আপনাদের বলেছি, কেউই তাদের কাছে আসতে চাইতেন না। অশোক নিজে গিয়ে সেই বৌদ্ধ-বিহারে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, "ওকে আমার হাতে দিয়ে দাও।" তখন বিহারের সন্ন্যাসী তাঁকে উপদেশ দিলেন: "প্রতিহিংসা ভাল নয়। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর। ক্রোধ কখনও ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারে না। ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে দূর করাও সম্ভব নয়। প্রেম দ্বারা ঘৃণাকে

বিনাশ কর। হে বন্ধু, একটি অন্যায়ের বদলে তুমি যদি আর একটি অন্যায় কর, তাতে প্রথম অন্যায়ের প্রশমন হয় না, পৃথিবীতে একটি অন্যায়ই সংযোজিত হয় মাত্র। সম্রাট বললে: "সবই ঠিক! কিন্তু তুমি একটি মূর্খ! এই ব্যক্তির জন্য তুমি কি তোমার প্রাণ বিসর্জন করতে রাজি আছ—এই ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে আত্মবিসর্জন?" সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন, বললেন, "আমি প্রস্তুত।" সম্রাট তার তরবারি কোষমুক্ত করলেন, বললেন: "প্রস্তুত হোন।" এবং ঠিক যখন তিনি তাঁকে আঘাত করতে যাবেন সেই মুহূর্তে সন্ন্যাসীর মুখের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। চোখের একটি পলক পর্যন্ত পড়ছে না এত শান্ত সে মুখমণ্ডল। সম্রাট থেমে গেলেন, বললেন, "হে সন্ন্যাসী! বল বল তুমি এত শক্তি কোথা থেকে পেলে, নিঃস্ব ভিক্ষুক তোমার চোখের তারা একটু কাঁপল না?" তারপর পুনরায় তিনি বললেন, "হে সন্ন্যাসী, তুমি তোমার বাণী বলে যাও।" বললেন, "তোমার বাণী ভারি সুন্দর।" স্বভাবতই তিনি প্রভু বুদ্ধের চমৎকার ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি জিনিস আছে: বুদ্ধ স্বয়ং, তাঁর অনুশাসন, তাঁর সংঘ। প্রথমে তা ছিল সরল। প্রভু বুদ্ধ যখন নির্বাণ লাভ করলেন, তখন মৃত্যুকালে শিষ্যরা বললেন, "আপনার ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি?" "কিছুই না।" "আপনার জন্য স্মৃতি-স্তম্ভ কিরূপ হবে।" তিনি বললেন: "যদি তোমরা চাও তো আমার চিতার উপর একটি মাটির স্তূপ নির্মাণ করো, অথবা কিছুই কোর না। কিন্তু কালক্রমে বড় বড় মন্দির স্তূপাদি নির্মিত হতে লাগল। বৌদ্ধদের আগে লোকে মূর্তিপূজার ব্যাপার জানতই না। আমি বলছি, তাঁরাই প্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন করলেন। বুদ্ধ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের উপবেশনরত, প্রার্থনারত নানা মূর্তি রয়েছে। এবং সংঘের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব জটিলতাও বহুগুণিত হতে লাগল। ক্রমশঃ এই বৌদ্ধ মঠগুলি প্রচুর ধনের অধিকারী হল। তাদের পতনের প্রকৃত হেতুও এইখানেই নিহিত রইল। সন্ন্যাস অল্প কিছু যোগ্য ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা ভাল। তবে সেই সন্ন্যাস যখন এমনভাবে প্রচারিত হতে থাকে যে, যে কোনও পুরুষ বা নারী ইচ্ছা করলেই সামাজিক জীবন ছেড়ে দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে, যখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৌদ্ধ-বিহার ও মঠ গড়ে উঠেছে, এদের কোন কোনটিতে শত সহস্র সন্ন্যাসী বাস করছে—কখনও একই দালানে বিশ হাজার সন্ন্যাসী বাস করেন—অবশ্যই এগুলি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল, তখনই যথার্থ বিপদের কাল—কারণ তখন সমাজে জাতিকে বংশধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কে আর অবশিষ্ট থাকে? কেবলমাত্র দুর্বল ব্যক্তিরাই সমাজে থেকে যান। সবল মানসিকতা ও বিক্রমশালী ব্যক্তিরা সব সমাজের বাইরে চলে যান। এবং তখনই শুধুমাত্র বীর্যবত্তার অভাবেই জাতীয় জীবনে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দেয়।

আমি আপনাদের এই চমৎকার সঙ্ঘ ভ্রাতৃত্বের কথা বলব। এই ভ্রাতৃত্ববোধ খুবই বৃহৎ। তবে মতবাদ ও ধারণা এক কথা আর তা প্রকৃতপক্ষে কার্যকরা অন্য কথা। অহিংসা মৈত্রী ইত্যাদি তত্ত্ব হিসাবে উত্তম, কিন্তু আমরা সবাই যদি সত্যি সত্যি অহিংস নীতি অবলম্বন করার জন্য পথে বেরিয়ে পড়ি তাহলে শহরে খুব কমই অবশিষ্ট

থাকবে। অর্থাৎ মতবাদটি খুবই ভাল, কিন্তু কিভাবে তা কার্যকর করা যাবে সে সম্পর্কে কেউ এখনও সমাধানের বাস্তব পথ দেখান নি।

বর্ণবিচার সম্পর্কে কিছু বলার আছে, বর্ণবিচার বলতে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তের বিচার বোঝায়, বংশধারার কথা বোঝায় ততক্ষণ পর্যন্ত তা অবশ্যই সমর্থ-যোগ্য। বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনারা নিগ্রো বা রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ চান না? প্রকৃতি আপনাদের এ ব্যাপারে বাধা দেবে। প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতার জন্যেই আপনারা তাদের সঙ্গে রক্তে সংমিশ্রণ ঘটাতে চান না। অজ্ঞাত কোন শক্তিই যেন জাতিসমূহকে রক্ষা করে চলেছে। এটিই আসলে আর্যদের বর্ণবিভাগ। মনে রাখবেন, আমি বলতে চাই না যে নিম্ন বর্ণের লোকেরা আমাদের সমকক্ষ নয়। তারা অবশ্যই সমান সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সব কিছু পাবে, তবে আমরা জানি যে রক্তের অবাধ মিশ্রণে জাতির অবনতি ঘটে। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে কঠোর বর্ণ-বিচার থাকা সত্ত্বেও বর্ণভেদের দেয়াল কিছুটা নুইয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারই ফলে একাধিক বহিরাগত জাতি তাদের সব বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। তাদের কথা মনে করুন: তাদের পোশাক পরিচ্ছদে যথার্থ শালীনতা ছিল না, তারা মৃত গলিত মাংস ভক্ষণ করত। পরবর্তী কালে এদের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, নরবলি প্রথা, গোষ্ঠীগত কদাচার সবই এদের পিছু পিছু এসে সমাজে প্রবেশ করল। তারা এগুলিকে প্রথমে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, কয়েক বছর তারা শান্ত সংযত ছিল। তারপরে সব কিছুকে তারা সামনা সামনি এনে উপস্থিত করল। এবং ফলে সমগ্র জাতি অবনমিত হল। তারপর রক্তের মিশ্রণ ঘটল, সব ধরনের মিলন অনুপযোগী জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ চালু হল। তাতে সমগ্র জাতি পতিত হল। কিন্তু কালক্রমে, এর পরিণতি শুভ বলে প্রমাণিত হল। যদি আপনারা এখন নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ ঘটান, তবে নিশ্চিতভাবেই আপনাদের জাতির সভ্যতার পতন ঘটবে। কিন্তু ত' সাময়িক, শত শত বছর পরে এই সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই দুর্ধর্ষ এক জাতির উদ্ভব হবে যার মত শক্তিশালী জাতি কোন দিনই ছিল না। কিন্তু সাময়িকভাবে আপনাদের ক্ষতি ভোগ করতে হবে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে— আমার মনে হয় তা এক বিচিত্র বিশ্বাস, তা হোল তারা বিশ্বাস করে যে একটিই মাত্র সভ্যজাতি আছে—সে জাতি আর্যজাতি; এর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই, এর বিরুদ্ধে কিছু বলার মত তথ্যও আমার জানা নেই। এই আর্যজাতি অন্য জাতিকে শোণিত মিশ্রণের অধিকার না দিলে ঐ জাতি সভ্য হতে পারবে না। কোন রকমের শিক্ষাই তা করতে পারে না। আর্যরা একটি জাতিকে শোণিত মিশ্রণের অধিকার দিলেই তবে য জাতি সভ্য হবে। কেবল মাত্র শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। এই জাতিগঠনের দৃষ্টান্ত আপনাদের দেশেও হতে পারে; আপনারা কি নিগ্রো জাতিকে আপনাদের রক্ত মিশ্রণের অধিকার দেবেন? তাহলেই সে জাতি উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্পন্ন হবে।

হিন্দুরা বর্ণভেদপ্রথা পছন্দ করে। ঠিক বলতে পারি না, তবে সেই কুসংস্কারের ছোঁয়া হয়ত আমার মধ্যেও থাকতে পারে। আমি আমাদের গুরুদের আদর্শকে

ভালবাসি। সে আদর্শ মহান্। তার কার্যকারিতা বাস্তব হয়েছিল বলে আমি নিজে মনে করি না। এবং কালক্রমে ভারতীয় জাতির অধঃপতনের এটিও একটি বড় কারণ। কিন্তু পরবর্তী কালে এক প্রচণ্ড সংমিশ্রণও সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে এত সব বিভিন্ন জাতি সংমিশ্রিত হচ্ছে, মিলিত হচ্ছে—একজন আপনাদের মতই সাদা, অথবা সে পীত আবার অন্য একজন আমারই মত কালো, এবং এই দুই চরমবর্ণের মধ্যবর্তী সকল স্তরের বর্ণের মিলন হচ্ছে, এবং যেখানে প্রতিটি জাতি তাদের নিজ নিজ আচার-ব্যবহার সবকিছুই রক্ষা করে চলেছে এবং ক্রম পরিণতিতে একটি সংমিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে, তখন এই মিলনের মধ্য দিয়ে নির্ঘাত এক প্রচণ্ড উত্থান সম্ভব হবে; তবে সাময়িকভাবে, এই দৈত্যকে অবশ্যই ঘুমিয়ে থাকতে হবে। এই ধরনের সব মিলনেরই এই পরিণাম।

যখন বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটল তখন অনিবার্যভাবেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সমস্ত জগৎ একটি ঐক্যসূত্রে নিধৃত। এই বিশ্ব ঐকিক বিশ্ব। বিভিন্নতা মায়াজ্ঞান, সবই একত্বের প্রকাশ। ঐকিকতার ধারণা যাকে আমরা অদ্বৈত বলি—তা দ্বৈতকে বাদ দিয়েই—এই অদ্বৈতের ধারণাই ভারতীয় ধারণা। এই মতবাদ ভারতবর্ষে সর্বদাই ছিল। যখনই জড়বাদ বা নাস্তিকতা সব কিছু ভেঙে ফেলতে চেয়েছে তখনই এই অদ্বৈততত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্ম বিদেশী বর্বরতাকে, তাদের আচার ব্যবহারকে ভারতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে যখন নিজে লুপ্ত হতে চলল তখন ভারতবর্ষে এর এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল আর সেই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব করলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী—তিনি শঙ্করাচার্য। নতুন মতবাদ প্রচার না করে এবং সব সময় নতুন চিন্তায় মগ্ন না থেকে বা নতুন সম্প্রদায় গড়ে না তুলে তিনি ভারতীয় জীবনে বেদের পুনঃ প্রবর্তন করলেন। তাই আধুনিক হিন্দুধর্ম প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপাদান নিয়েই গঠিত এবং এর উপর বেদান্তের প্রাধান্য প্রবল। আপনারা জানেন যে, একবার যা মরে যায় আর তা ফিরে আসে না; হিন্দুধর্মের সেইসব উৎসবানুষ্ঠানও আর জীবন্ত ফিরে এল না। যদি বলি যে প্রাচীন হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান অনুযায়ী দেখতে গেলে যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ করে না সে খাঁটি নয়, তবে হয়ত আপনারা খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। কোন কোন উৎসবের দিনে হিন্দুকে গোহত্যা করতেই হবে এবং তা দেবতাকে উৎসর্গ করতে হবে। আর আজ এই প্রথা বিরক্তিকর বলে গণ্য হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অন্য ব্যাপারে অমিল থাকলেও একটি ব্যাপারে মিল আছে, তা হোল কেউ কখনই গোমাংস ভক্ষণ করবে না। প্রাচীন যুগের দেবদেবী, পশুবলি—সবই আজ ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত, বর্তমান ভারতবর্ষ কেবল বেদের আধ্যাত্মিক অংশটুকু গ্রহণ করেছে।

বৌদ্ধরাই ভারতবর্ষের প্রথম ধর্মসম্প্রদায়। তাঁরাই প্রথম বলেছিলেন: "আমাদের পথই একমাত্র পথ। যতক্ষণ আমাদের সঙ্ঘে যোগ না দিচ্ছ ততক্ষণে তোমার রক্ষা নেই।" তারা বলেছিল, "এই পথই সঠিক পথ।" কিন্তু, হিন্দু রক্তের মানুষ হওয়ার জন্যই তাঁরা অন্যান্য দেশের ধর্মসম্প্রদায়ের মত কঠিন হৃদয় সঙ্কীর্ণতাবাদী হতে পারেন নি। অন্যদেরও মুক্তি হবে, চিরকালের মত কেউই কুপথে থাকতে পারে না, না

কিছুতেই তা সম্ভব নয়। তারা এসবও বলতেন, কারণ তাঁদের ধমনীতে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত হত, তাঁদের হৃদয় প্রস্তরকঠিন ছিল না, কিন্তু তাদের সঙ্গে সকলকেই যোগ দিতে হবে—এই ছিল নির্দেশ।

আপনারা অবগত আছেন যে, হিন্দুদের মতে অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়া ঠিক নয়। যেখানেই থাক না কেন সেখান থেকেই কেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা শুরু করতে পার। এটিই ঠিক। হিন্দুধর্মের সুবিধা হোল : এই ধর্মের মূল কথাই হোল সে মতবাদ বা গোঁড়ামির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না, গুরুত্ব আরোপ করে জীবনের উপর। পৃথিবীতে যত উত্তম দর্শন সৃষ্টি হয়েছে সবকিছু সম্পর্কে প্রচার করেও তুমি যদি ব্যবহারে নির্বুদ্ধিতা দেখাও, হিন্দুরা তোমাকে গণ্যই করবে না। কিন্তু তোমার ব্যবহারে তুমি সৎ হলে তোমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। এই অবস্থা হলে বৈদান্তিকগণ সকলের জন্যই অপেক্ষা করতে পারেন। বেদান্তের শিক্ষা হোল, এক অদ্বয়ের অস্তিত্বই সত্য, তিনি সঠিক। এবং তিনিই ঈশ্বর। তিনি সকল কাল ও সীমার অতীত, সকল কার্যকারণাদির অতীত তিনি। আমরা সেই ঈশ্বরের সংজ্ঞা জানি না। আমরা কখনই বলতে পারি না যে তিনি এ ছাড়া আর কিছু। তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ। তিনিই একমাত্র সত্য। আমি, তুমি, এই দেয়ালটা, এখানের সব কিছুতে তিনি আছেন। তাঁর ভজনের উপরই সমস্ত জ্ঞান নির্ভরশীল। তাঁর আনন্দানুভবের উপরেই আমাদের আনন্দ নির্ভর করে, এবং তিনিই পরম সত্য। মানুষ যখন এই তত্ত্ব বুঝতে পারে, তখন সে উপলব্ধি করে, "আমিই প্রকৃত সত্য, কারণ আমি তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, একাত্ম।" অতএব যখন কোন মানুষ সত্যিকারের পবিত্র হয়, সৎ হয়, সকল দোষের ঊর্ধ্বে হয় যীশুর মত তখন সেও দেখে : "আমি এবং পরম পিতা একই।" প্রত্যেকের জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য বৈদান্তিকদের আছে। যেখানেই তুমি থাক না কেন তুমি পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে ; "আমি এবং পরম পিতা একই।" এই তত্ত্বকে বোঝ ; যদি মূর্তি এতে সাহায্যকারী হয় তো মূর্তিকে স্বাগত জানান যেতে পারে। যদি মহামানবের আরাধনা তোমাকে সাহায্য করে, তাঁর আরাধনা কর। যদি মহম্মদকে আরাধনা করে সাহায্য পাও তো তা'ই কর। কেবল একটি কথা, নিষ্ঠাবান হও। বেদান্তবাদ বলে, যদি নিষ্ঠাবান হও তবেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। কিছুই পড়ে থাকবে না। তোমার যে হৃদয়, যে হৃদয়ে সকল সত্যই বিধৃত, তা পর্বে পর্বে বিকশিত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত "আমি এবং বিশ্বপিতা এক। এই পরম সত্য জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এই উন্মেষ চলবে। আর মুক্তি কি? ঈশ্বরের সঙ্গে সহবাস। কোথায়? সর্বত্রই। এখানে, এই মুহূর্তে। অনন্তকালের একটি মুহূর্ত যেকোন মুহূর্তের মতই মূল্যবান। আপনারা জানেন, এ মতবাদ বেদের পুরাতন মতবাদ। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হবার পর এই মতবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম তাঁদের দানশীলতা, জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি ইত্যাদির জন্য ভারতবর্ষে একটি অক্ষয় চিহ্ন রেখে গেছে। এবং তারপর আজ বৈদান্তিক মতবাদ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পুনর্বিজয়াভিযান করে চলেছে।

কর্মযোগ

প্রথম অধ্যায়

চরিত্রের উপরে কর্মের প্রভাব

'কর্ম' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'কৃ' ধাতু থেকে, 'কৃ' ধাতুর অর্থ করা ; যে কোন কাজকেই কর্ম বলে। পারিভাষিক অর্থেও এই শব্দটি 'কর্মফল'কে বোঝায়। দার্শনিক দিক থেকে কখনো কখনো বোঝায়, আমাদের অতীত কর্মের ফল। কিন্তু কর্মযোগে আমরা 'কর্ম' কথাটিকে শুধু কাজ অর্থে ব্যবহার করব। মানবজাতির লক্ষ্য হল, জ্ঞান। প্রাচ্যদর্শন এই একটি আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সুখ মানুষের লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য জ্ঞান। সুখ স্থায়ী হয় না। সুখকে লক্ষ্য বলে মনে করা ভুল। পৃথিবীতে আমাদের সব দুঃখকষ্টের মূল হল, মানুষ মূর্খের মত ভাবে, সুখই তার জীবনের আদর্শ। এক সময়ে সে বুঝতে পারে, সে সুখ নয়, জ্ঞানের দিকে চলেছে এবং সুখ ও দুঃখ দুই-ই মহৎ শিক্ষক, সুখের মত দুঃখও তাকে অনেক শিক্ষা দেয়। সুখ-দুঃখ আমাদের মনের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে নানা ছবি এঁকে যায়, এই মিলিত ছবিগুলির সমন্বয়কে মানুষের "চরিত্র" বলা হয়। যদি কোনো লোকের চরিত্র আলোচনা করে দেখ, দেখবে প্রকৃতপক্ষে তা হল মানসিক প্রবণতার সমষ্টি, মনের প্রবৃত্তির সমন্বয় ; দেখবে, সেই চরিত্র-গঠনে সুখ ও দুঃখের সমান অংশ। চরিত্র-গঠনে ভাল ও মন্দের সমান অংশ এবং কয়েক ক্ষেত্রে সুখের চেয়ে দুঃখ বড় শিক্ষক। পৃথিবী যত মহৎ চরিত্রকে জন্ম দিয়েছে, তাঁদের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে বলতে পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে, সুখের চেয়ে দুঃখ বেশী শিক্ষাদায়ক, সম্পদের চেয়ে দারিদ্র্য এবং প্রশংসার চেয়ে অপমান অন্তরের শক্তিকে বেশী জাগিয়ে তোলে।

এই জ্ঞান আবার মানুষের সহজাত। বাইরে থেকে কোনো জ্ঞান আসে না, সব অন্তরে আছে। আমরা যখন বলি মানুষ "জানে", তখন সঠিক মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় বলা উচিত সে "আবিষ্কার করে" বা "উন্মোচিত করে" ; মানুষ যা "শেখে" তা আসলে সে "আবিষ্কার করে", অনন্ত জ্ঞানের খনি তার আপন আত্মার আবরণকে উন্মুক্ত করে।

আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছেন। মাধ্যাকর্ষণ কি ওঁর জন্যে এক কোণে অপেক্ষা করছিল? ছিল ওঁর মনে ; উপযুক্ত সময়ে সেটা জানতে পারলেন। পৃথিবী যা কিছু জ্ঞানলাভ করেছে, সব মন থেকে উৎপন্ন ; জগতের অনন্ত গ্রন্থাগার তোমার মনেই রয়েছে। বাইরের জগৎ শুধু তোমার মনকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দীপনা জোগায়, কিন্তু তোমার পর্যবেক্ষণের বিষয় হল তোমার মন। একটি আপেল পড়ার ঘটনা নিউটনকে উদ্দীপ্ত করল, তিনি নিজের মনে আলোচনা করলেন। মনে মনে চিন্তার সব পূর্বতন সূত্রগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে এক নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কার করলেন, তাকেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণের সূত্র। সে সূত্র আপেলে ছিল না, পৃথিবীর কেন্দ্রেও কোনো বস্তুতে ছিল না।

এতএব, আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সব জ্ঞানই মানুষের মনে রয়েছে। অনেক

ক্ষেত্রে তা আবিষ্কৃত হয় না, আবৃত থেকে যায়, আবরণ যখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়, তখন আমরা বলি, "আমরা শিখছি", এই উন্মোচনের অগ্রগতির উপরেই জ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে। যে মানুষের মন থেকে এই আবরণ সরে যাচ্ছে, সে বেশী জানে, যার মনে এই আবরণ ঘন, সে অজ্ঞান আর যার মনের আবরণ সম্পূর্ণ সরে গেছে, সে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী। সর্বদর্শী মানুষ ছিলেন এবং আমি বিশ্বাস করি, আবার হবে; ভাবী যুগে এরকম অনেক মানুষ আসবেন। চকমকি পাথরে সুপ্ত আগুনের মত জ্ঞান মনে সুপ্ত থাকে; উদ্দীপনই হল সেই ঘর্ষণ, যা তাকে জাগিয়ে তোলে। আমাদের সব অনুভূতি ও কাজ—হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, অভিশাপ-আশীর্বাদ, নিন্দা-প্রশংসা—নিজেদের মনকে শান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখব, প্রতিটি অনুভূতি নানা আঘাতে মন থেকে উৎপন্ন হয়। তারই ফল হল, আমাদের চরিত্র। এইসব আঘাতকে একত্রে কর্ম বলা হয়। আত্মার উদ্দেশে যে কোন মানসিক ও দৈহিক আঘাত আগুন জ্বালিয়ে তোলে, আত্মশক্তি ও জ্ঞানের উদ্বোধন ঘটে, তাই ব্যাপক অর্থে কর্ম। অতএব, আমরা সর্বদা কর্ম করছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছি: সেটা কর্ম। তুমি শুনছ: সেটা কর্ম। আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি: সেটাও কর্ম। হাঁটছি: কর্ম। দেহে অথবা মনে, যা কিছু করছি কর্ম, তা আমাদের উপরে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে।

কতকগুলি কাজ আছে, যেগুলি বহু ছোট ছোট কাজের সমষ্টি। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে নুড়ির গায়ে ঢেউয়ের আঘাত শুনলে মনে হয়, বিরাট গর্জন শুনছি, অথচ আমরা জানি, একটা ঢেউ আসলে লক্ষ লক্ষ ছোট ঢেউয়ের সমষ্টি। প্রতিটি ছোট ঢেউ শব্দ করছে, তবু আমরা শুনতে পাচ্ছি না; যখন ওরা একত্রে শব্দ করে, তখন শুনতে পাই। ঠিক তেমনি, হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনই হল কাজ। কতকগুলি কাজ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি; তারা কিন্তু কয়েকটি ছোট কাজের সমষ্টি। কোনো লোকের চরিত্র বিচার করতে হলে তার মহৎ কাজগুলিকে দেখো না। একজন মূর্খও কোনো না কোনো সময়ে বীরত্ব দেখাতে পারে। তার অতিসাধারণ কাজগুলি লক্ষ্য কর; ঐগুলির সাহায্যেই একজন মহৎ ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্রকে জানতে পারবে। হীনতম মানুষও কখনো কখনো মহৎ কাজ করে ফেলে, কিন্তু যে সর্বদাই মহৎ, সেই যথার্থ মহৎ মানুষ।

চরিত্রের উপরে কর্মের প্রভাবের ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, বিশ্বের সব শক্তিকে সে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে এবং সব শক্তি এই কেন্দ্রে মিলিত হয়ে এক বিরাট স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসছে। যথার্থ মানুষ হল এইরকম একটি কেন্দ্র—সে সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী—সারা বিশ্বকে সে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে; এদের দিয়ে চরিত্র গড়ে তুলে তাকে বাইরে প্রকাশ করে। তার যেমন আকর্ষণের শক্তি আছে, তেমন তা প্রকাশেরও শক্তি আছে।

পৃথিবীতে যা কিছু কাজ আমরা দেখি, মানবসমাজের সব গতি, চারিদিকের কাজ সবই চিন্তার প্রকাশ, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ। যন্ত্রপাতি, শহর, জাহাজ সব মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ; এই ইচ্ছাকে সৃষ্টি করে চরিত্র আর চরিত্রকে সৃষ্টি করে কর্ম।

জগৎ যত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্ম দিয়েছে, তাঁরা সবাই বিরাট কর্মী ছিলেন—তাঁদের আত্মা ছিল বিশাল, তাঁদের ইচ্ছায় পৃথিবী উল্টে যাওয়া সম্ভব ছিল, যুগ-যুগব্যাপী কর্মের ফলে এই ইচ্ছা তাঁরা পেয়েছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মনের দৃঢ়তা একজীবনে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ ওঁদের পিতারা কিরকম মানুষ ছিলেন, আমরা জানি। তাঁদের পিতারা কখনো মানবজাতির কল্যাণের জন্য একটা কথাও বলেছেন বলে কেউ শোনে নি। যোসেফের মত লক্ষ লক্ষ ছুতোর চলে গেছে; লক্ষ লক্ষ এখনো বেঁচে আছে। বুদ্ধের পিতার মত লক্ষ লক্ষ ছোট রাজা পৃথিবীতে ছিল। যদি এটা উত্তরাধিকারের ঘটনা হত, তাহলে এই যে ছোট রাজা, যাকে হয়ত তার ভৃত্যরাও মানত না, সে কি করে এমন ছেলের জন্ম দিল, যাকে অর্ধেক জগৎ পূজা করে? যে ছুতোরের ছেলেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঈশ্বর বলে পূজা করে তার সঙ্গে তার বাবার তফাৎকে কি করে ব্যাখ্যা করবে? উত্তরাধিকারের সূত্র দিয়ে এর সমাধান করা যায় না। বুদ্ধ আর যীশু পৃথিবীতে যে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, সে শক্তি কোথা থেকে এসেছিল? এই শক্তির প্রবলতা কি করে এল? নিশ্চয় যুগ যুগ ধরে তা প্রবল হয়ে শেষে বুদ্ধ অথবা যীশুরূপে সমাজে প্রকাশ পেয়েছে এবং আজো তার অস্তিত্ব রয়েছে।

এই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে কর্ম, কাজ। উদ্যমী না হলে কেউ কিছু পায় না। এটা চিরন্তন নিয়ম। হয়ত কখনো ভাবতে পারি যে, এরকম ঘটে না, কিন্তু শেষে আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। কোনো লোক হয়ত সারাজীবন টাকাপয়সার জন্য চেষ্টা করল; হয়ত হাজার হাজার লোককে ঠকিয়ে শেষে দেখল, সে ধনী হওয়ার উপযুক্ত নয়, তখন নিজের জীবন তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। দৈহিক সুখের জন্য হয়ত আমরা নানা জিনিস জড়ো করতে পারি, কিন্তু যা নিজে চেষ্টা করে পাই, তাই আমাদের প্রকৃত নিজস্ব। কোনো মূর্খ লোক যদি পৃথিবীর সব বই কিনে নিজের গ্রন্থাগারে রাখে, তবু যেটুকু তার যোগ্যতা সেইটুকুই সে পড়তে পারবে; এই যোগ্যতাকে সৃষ্টি করে কর্ম। আমাদের কতটা প্রাপ্য, কতটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, তা স্থির করে কর্ম। আমরা যা হয়েছি, তার জন্য আমরাই দায়ী; এবং আমরা যা হতে চাই তা হওয়ার শক্তি আমাদের আছে। এখন আমরা যা হয়েছি, তা যদি আমাদের অতীত কর্মের ফল হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যা হতে চাই, তা নিশ্চয় স্থির হবে বর্তমান কাজের ফলে; সুতরাং, কিভাবে কাজ করা উচিত তা আমাদের জানতে হবে। তোমরা বলবে, "কি ভাবে কাজ করতে হয়, তা শিখে কি হবে? এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে কাজ করে।" কিন্তু আমাদের শক্তি নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন রয়েছে। কর্মযোগ সম্বন্ধে গীতা বলেন যে, এটি হল বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করা; কিভাবে কাজ করতে হয় জানলে খুব বেশী ফল পাওয়া যায়। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, সব কাজের উদ্দেশ্য হল, মনের শক্তিকে বিকশিত করা, আত্মাকে জাগ্রত করা। সে শক্তি এবং জ্ঞান প্রত্যেকের মধ্যে আছে; বিভিন্ন কাজগুলি যেন আঘাত দিয়ে সেই প্রবল শক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

মানুষ নানা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। উদ্দেশ্যবিহীন কাজ হতে পারে না। অনেকে খ্যাতি চায়, তারা খ্যাতির জন্য কাজ করে। কেউ টাকা চায়, সে টাকার জন্যে কাজ করে। কেউ ক্ষমতা চায়, সে ক্ষমতার জন্য কাজ করে। অনেকে স্বর্গে যেতে চায়, তারা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে। অনেকে মৃত্যুর পরে নামকে স্থায়ী করে যেতে চায়, যেমন চীনদেশে মৃত্যুর আগে কেউ সম্মান পায় না; আমাদের চেয়ে ঐ নিয়মটাই ভাল। ও দেশে কেউ খুব ভাল কাজ করলে তার মৃত পিতা বা পিতামহকে সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয়। অনেকে এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। কয়েকটি মুসলিমগোষ্ঠীর অনুগামীরা মৃত্যুর পরে বড় স্মৃতিসৌধ তৈরীর জন্য সারাজীবন পরিশ্রম করে। এমন গোষ্ঠীর কথা জানি, সেখানে শিশুর জন্মের সঙ্গেই তার সমাধিসৌধ তৈরী হয়; তাদের কাছে, এটি মানুষের সবচেয়ে দরকারী কাজ এবং সমাধি যত বড় আর সুন্দর হয়, ততই সেই ব্যক্তিকে ধনী মনে করা হয়। অনেকে এ কাজ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ করে; তারা সবরকম অসৎ কাজ করে মন্দির তৈরী করে কিংবা পুরোহিতদের অর্থ দিয়ে স্বর্গের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে। তারা ভাবে, অন্যায় করা সত্ত্বেও এইভাবে নিশ্চিন্তে ছাড়া পেয়ে যাবে। কাজের এরকম বহু উদ্দেশ্য থাকে।

কাজের জন্যই কাজ কর। কিছু লোক আছেন যাঁরা সব দেশেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁরা কাজের জন্য কাজ করেন, তাঁরা নাম চান না, খ্যাতি চান না, এমনকি স্বর্গেও যেতে চান না। তাঁরা শুধু মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। কিছু লোক আছেন যাঁরা দরিদ্রের মঙ্গল করেন, মানুষের উন্নতিতে সাহায্য করেন। কারণ, তাঁরা কল্যাণকর্মে বিশ্বাস করেন এবং কল্যাণ ভালবাসেন। (খ্যাতি সাধারণতঃ সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না; বৃদ্ধবয়সে জীবনের প্রায় শেষে খ্যাতি আসে। কেউ যদি স্বার্থপর উদ্দেশ্য না নিয়ে কাজ করে, তাহলে কি সে কিছু লাভ করে না? হাঁ, সে-ই সবচেয়ে বেশী লাভ করে। পরার্থপরতা বেশী লাভজনক, তবে লোকের তা অভ্যাস করার মত ধৈর্য নেই। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও এটা বেশী লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থপরতা শুধু নীতি কথা মাত্র নয়, আমাদের মহত্তম আদর্শ, কারণ, ওতেই রয়েছে শক্তির প্রকাশ। প্রথমতঃ, যে লোক কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য না রেখে, ভবিষ্যতের কথা, স্বর্গ বা শাস্তির কথা না ভেবে পাঁচদিন, এমনকি পাঁচ মিনিটও কাজ করতে পারে, তার প্রবল নৈতিক বলে বলী হওয়ার ক্ষমতা আছে। এটা করা কঠিন, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরা এর মূল্য এবং সুফলকে উপলব্ধি করি। এ হল শক্তির মহত্তম প্রকাশ—এই প্রচণ্ড সংযম; আত্মসংযম হল শক্তির সর্বাধিক বিকাশ। একটা চারঘোড়ার গাড়ি বল্গাহীন হয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে পারে, আবার গাড়োয়ান তাদের সংযত করতে পারে। কোন্‌টাতে শক্তির বেশী পরিচয়, ওদের ছেড়ে দেওয়ায় না ধরে রাখায়? একটা কামানের গোলা অনেকদূর উড়ে গিয়ে পড়ে যায়। আরেকটা গোলা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়, তার ফলে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। স্বার্থপর উদ্দেশ্যযুক্ত সব উদ্যম অপচয়িত হয়; তোমাদের কাছে ফিরে আসার শক্তি তার হবে না; কিন্তু সংহত হলে তা শক্তি গড়ে তোলে। এই আত্মসংযম এক প্রবল ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি করবে, সৃষ্টি করবে খ্রীষ্ট

বা বুদ্ধের মত চরিত্র। মূর্খ লোকেরা এ রহস্য জানে না; অথচ তারা মানবজাতিকে শাসন করতে চায়। কাজ করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে মূর্খও সারা জগৎকে শাসন করতে পারে। সে কয়েক বছর অপেক্ষা করে শাসন করার মূর্খ কল্পনাকে সংযত করুক; সে কল্পনা সম্পূর্ণ চলে গেলে, সে জগতে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমরা অধিকাংশ লোক কয়েকবছরের বেশী ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না, ঠিক যেমন কিছু জন্তু কয়েক পদক্ষেপের বেশী দেখতে পায় না। একটা ছোট্ট বৃত্ত হল আমাদের জগৎ। আমাদের সামনে তাকাবার ধৈর্য নেই, তাই আমরা নীতিবিহীন হয়ে পড়ি। এই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের অক্ষমতা।

হীনতম কাজটিও ঘৃণ্য নয়। যে অজ্ঞ, সে খ্যাতির জন্য স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করুক; কিন্তু প্রত্যেককে আরো মহত্তর উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে হবে। "আমাদের কাজ করার অধিকার আছে, তার ফলে অধিকার নেই।" ফলের কথা ছেড়ে দাও। ফল নিয়ে চিন্তা কেন? যদি কাউকে সাহায্য করতে চাও, তাহলে তোমার প্রতি তার ব্যবহার কিরকম হবে, ভেবো না। কোন বড় বা ভাল কাজ করতে চাইলে তার ফল নিয়ে চিন্তা করো না।

কর্মের এই আদর্শের ক্ষেত্রে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রবল কর্মতৎপরতার প্রয়োজন; আমাদের সর্বদা কাজ করতে হবে। কাজ ছাড়া একমুহূর্তও আমরা থাকতে পারি না। তাহলে বিশ্রামের কি হবে? কাজ হল জীবনযুদ্ধের একটা দিক—তার চারিদিকে আমরা দ্রুত ঘুরছি। অন্যদিকে রয়েছে শান্ত বিশ্রাম: সব শান্তিময়, শব্দ বা আড়ম্বর নেই, আছে শুধু প্রকৃতি আর তার প্রাণিজগৎ, ফুল, পর্বত। কোনো দিকটিই সম্পূর্ণ নয়। নির্জনতায় অভ্যস্ত লোক জগতের প্রচণ্ড আবর্তনে পড়লে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়; ঠিক যেমন, গভীর সমুদ্রের মাছ জলের ওপরে এলে জলের চাপের অভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যে জীবনের উদ্দামতায় অভ্যস্ত সে কি শান্ত জায়গায় থাকতে পারে? তার কষ্ট হবে, হয়ত মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সে-ই আদর্শ লোক যে গভীরতম নিস্তব্ধতাতেও প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার সন্ধান পায় এবং প্রবল কাজের মাঝে পায় মরুভূমির নৈঃশব্দ। সে সংযমের রহস্য জেনেছে, নিজেকে সংযত করেছে। সে যানবাহনে ভরা বিরাট শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও তার মন কোনো গুহাবাসীর মত শান্ত থাকে; অথচ সে সর্বদা বহু কাজ করে চলেছে। এই হল কর্মযোগের আদর্শ, যদি এই আদর্শ লাভ করতে পার, তাহলে কাজের রহস্য জানা হবে।

কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে একেবারে গোড়া থেকে, সব কাজকে গ্রহণ করে প্রতিদিন নিজেকে আরো নিঃস্বার্থ হতে হবে। কাজ করে কাজের উদ্দেশ্য জানতে হবে; এবং কয়েক বছরের মধ্যেই দেখব, আমাদের সব উদ্দেশ্যই স্বার্থকেন্দ্রিক; কিন্তু ক্রমশঃ ধৈর্য ধরে এই স্বার্থপরতা কমাতে হবে, শেষে এমন এক সময় আসবে যখন সত্যিই আমরা স্বার্থবিহীন কাজ করতে পারব। আমরা আশা করতে পারি, জীবনের পথে সংগ্রাম করতে করতে এক সময়ে আমরা সম্পূর্ণ স্বার্থবিহীন হয়ে উঠব, সে অবস্থা এলে আমাদের সব শক্তি সংহত হয়ে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রত্যেকে আপনক্ষেত্রে মহান

সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি তিনটি শক্তির সাহায্যে গঠিত, সংস্কৃতে তাদের বলে সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ। বাস্তব জগতে এদের আমরা বলতে পারি সাম্য, কর্মপরায়ণতা এবং জড়তা। তমঃ হল অন্ধকার বা আলস্য; রজঃ হল কাজ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ রূপে তার প্রকাশ; আর সত্ত্ব হল এ দুয়ের সমতা।

প্রত্যেকের মধ্যে এই তিনটি শক্তি রয়েছে। কখনো তমসের প্রাধান্য ঘটে। আমরা অলস হয়ে পড়ি, নড়াচড়া করতে পারি না, বসে বসে নানা চিন্তা করি বা শুধু কুঁড়েমিই করি। আবার কখনো কাজের প্রাধান্য দেখা দেয়, কখনো বা দুয়ের সাম্য ঘটে। আবার, এক এক জনের মধ্যে এক একটি শক্তি প্রবল হয়। একজনের বৈশিষ্ট্য অলসতা, কর্মহীনতা; আরেকজনের কাজ, ক্ষমতা, উদ্যমের বিকাশ; আবার, কারোর হয়ত বৈশিষ্ট্য মাধুর্য, শান্তভাব, কাজ ও কর্মহীনতার সামঞ্জস্যের ফল। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টিতে—প্রাণীতে, উদ্ভিদে, মানুষে এই শক্তিগুলির অল্পবিস্তর প্রকাশ দেখি।

এই তিনটি বিষয়ে কর্মযোগ বিশেষভাবে আলোচনা করে। ঐ শক্তিগুলি কি এবং কিভাবে ওদের কাজে লাগাতে হয়, তা শিখিয়ে আমাদের কাজকে উন্নত করে। মানবসমাজ হল নানা স্তরে বিভক্ত একটি সংগঠন। আমরা সবাই নীতির কথা জানি, কর্তব্যের কথা জানি, কিন্তু দেখি বিভিন্ন দেশে নীতির তাৎপর্যে অনেক প্রভেদ। এক দেশে যা নীতি, অন্য দেশে তা একেবারে দুর্নীতি বলে মনে করা হতে পারে। যেমন, এক দেশে হয়ত ভাই-বোনে বিবাহ হয়; অন্য দেশে, সেটা হয়ত খুব অনৈতিক; এক দেশে হয়ত ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা চলে; অন্যদেশে হয়ত সেটা দুর্নীতি; কোথাও লোকে মাত্র একবার বিবাহ করতে পারে; অন্যত্র, হয়ত বহুবার বিবাহ করতে পারে—ইত্যাদি। সেরকম, নীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, অনেক প্রভেদ—অথচ, আমাদের ধারণা, নীতির একটি সার্বজনীন মান থাকা উচিত।

কর্তব্যের ক্ষেত্রেও তাই। কর্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন রকম। এক দেশে কিছু কাজ আছে, সেগুলি না করলে, লোকে বলবে অন্যায় হয়েছে; আবার, সেইগুলিই অন্য দেশে করলে লোকে বলবে, সে ঠিক করে নি—অথচ আমরা জানি, কর্তব্যের একটা সার্বজনীন ধারণা থাকা দরকার। ঠিক সে রকম, কোনো সমাজ-ব্যবস্থায় কিছু কাজকে কর্তব্য বলে মনে করা হয়, আবার অন্য সমাজব্যবস্থায় ঠিক তার বিপরীত ধারণা, সেখানে ঐ সব কাজ করলেই লোকে ভয় পাবে। দুটি পথ আমাদের কাছে খোলা—একটি হল, মূর্খ লোকদের পথ, তারা ভাবে সত্যের একটিই পথ, আর সব ভুল, অন্যটি হল জ্ঞানীদের পথ, তারা স্বীকার করে, আমাদের মানসিক গঠন বা অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী আমাদের নীতি ও কর্তব্যে প্রভেদ দেখা দিতে পারে। কর্তব্য ও নীতির স্তর আছে, এটা জানা দরকার—জানা দরকার

যে, জীবনের এক অবস্থায়, এক পরিস্থিতিতে যা কর্তব্য তা অন্য অবস্থায় চলতে পারে না।

যেমন: সব মহৎ শিক্ষকরা বলেছেন—"অন্যায়কে বাধা দিও না," নির্বিরোধী থাকাই শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। আমরা জানি, যদি কিছু লোক ঐ কথাটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি তাহলে সমস্ত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, দুষ্ট লোকেরা আমাদের সম্পত্তি এবং জীবন কেড়ে নেবে, যা খুশি তাই করবে। মাত্র একদিন নির্বিরোধী থাকলেও বিপদ ঘটবে। তবু অন্তরের গভীরে আমরা এ উপদেশের সত্যকে অনুভব করি। এটিকে মনে হয়, শ্রেষ্ঠ আদর্শ; অথচ, এ মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার অর্থ, মানবজাতির বিরাট অংশের শত্রুতা করার সমান। শুধু তাই নয়, এর ফলে মানুষের মনে হবে সে সর্বদা শত্রুতা করছে, তার সব কাজে দেখা দেবে বিবেকের দ্বন্দ্ব; সে দুর্বল হয়ে পড়বে, এই অবিরাম আত্মাবমাননা বহু দোষের সৃষ্টি করবে। যে নিজেকে ঘৃণা করে, তার কাছে অবনতির পথ খুলে গেছে; জাতির ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

আমাদের প্রথম কাজ হল, নিজেকে ঘৃণা না করা, কারণ এগোতে হলে আগে চাই ঈশ্বর-বিশ্বাস, তারপর আত্মবিশ্বাস। যার আত্মবিশ্বাস নেই, তার ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকতে পারে না। সুতরাং আমাদের পক্ষে একমাত্র বিকল্প হল, এইটা স্বীকার করা যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্তব্য ও নীতির বিভিন্নতা ঘটে; যে অন্যায়ের বিরোধিতা করছে, সে যে সর্বদা অন্যায় করছে তা নয়, বরং ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরোধিতা করাই তার কর্তব্য হতে পারে।

ভগবদ্‌গীতা পড়তে গিয়ে পাশ্চাত্য দেশে তোমরা অনেকে হয়ত দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে অবাক হয়েছ, যেখানে অর্জুন বন্ধু ও আত্মীয়দের শত্রুতা করতে হবে বলে যুদ্ধ করতে চাইছেন না। বলছেন, অপ্রতিরোধ হল প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভণ্ড, কাপুরুষ বলছেন। সব বিষয়ে যে দুটি চরম অবস্থাকে একই মনে হয়, এটা আমাদের বিরাট শিক্ষা। চরম ইতিবাচক ও চরম নেতিবাচক অবস্থা সর্বদা এক হয়। আলোর স্পন্দন খুব কম হলে আমরা দেখতে পাই না, খুব দ্রুত হলেও দেখতে পাই না। শব্দের ক্ষেত্রেও তাই; খুব মৃদু হলে শুনতে পাই না; খুব জোরে হলেও শুনতে পাই না। বিরোধিতা ও অপ্রতিরোধের মধ্যে তফাৎও সেই রকম। একজন দুর্বল, কুঁড়ে বলে বাধা দিতে পারে না; আরেকজন জানে, ইচ্ছে করলে সে প্রবল আঘাত হানতে পারে; তবু সে শত্রুকে আঘাত না করে আশীর্বাদ করে। যে দুর্বল বলে বাধা দেয় না, সে অন্যায় করে, সে এর কোনো সুফল পায় না; অন্যজন বাধা দিলে অন্যায় আচরণ হয়। বুদ্ধ সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, সেটা যথার্থ ত্যাগ; কিন্তু যে ভিখিরী, যার কিছু নেই, তার ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং এই অপ্রতিরোধ আর আদর্শ প্রেমের কথা বলার সময়ে কি বোঝাতে চাইছি, সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। প্রথমে বুঝতে হবে, বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না। ক্ষমতা থাকলেও যদি বাধা না দিই তাহলে সেটা গভীর প্রেমের প্রমাণ; কিন্তু বাধা না দিয়ে যদি নিজেদের এই বলে ছলনা করি

যে, আমরা মহত্তম প্রেমের দ্বারা চালিত, তাহলে ঠিক উল্টোটাই হবে। অর্জুন বিরাট যুদ্ধসজ্জা দেখে ভয় পেয়েছিলেন; তাঁর "প্রেম" তাঁকে দেশের ও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছিল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভণ্ড বলেছিলেন: 'তুমি জ্ঞানীর মত কথা বলছ, কিন্তু তোমার কাজ কাপুরুষের মত; সুতরাং ওঠ, যুদ্ধ করো!'

এই হল কর্মযোগের মূল ভাব। কর্মযোগী বুঝতে পারেন, অপ্রতিরোধ হল মহত্তম আদর্শ, তিনি জানেন, এটিই শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং এও জানেন যে, যাকে অন্যায়ের প্রতিরোধ বলা হয়, তা আসলে এই শ্রেষ্ঠ শক্তির দিকে একটি পদক্ষেপমাত্র। এই শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌঁছবার আগে মানুষের কর্তব্য হল অন্যায়ে বাধা দেওয়া; সে কাজ করুক, যুদ্ধ করুক, আঘাত করুক। তারপর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করলে তখন অপ্রতিরোধ তার গুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমার দেশে একজনকে দেখেছিলাম, তাকে আগে খুব বোকা বলে জানতাম, সে কিছু জানত না, জানার ইচ্ছেও ছিল না, পশুর মত জীবনযাপন করত। সে আমার কাছে জানতে চাইল, ঈশ্বরকে জানবার জন্যে সে কি করবে, কি ভাবে মুক্তি পাবে। আমি বললাম, "তুমি মিথ্যে বলতে পার?" সে বলল, "না।" "তাহলে মিথ্যে বলা শিখতে হবে। জন্তু বা কাঠের টুকরোর মত থাকার চেয়ে মিথ্যে বলা ভাল। তুমি জড়; সব কাজের অতীত সেই শান্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই তুমি পৌঁছাও নি; অন্যায় কাজ করার ক্ষমতাও তোমার নেই।" অবশ্য এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না, আমি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম; কিন্তু আমি বলতে চেয়েছিলাম, চরম শান্তিতে পৌঁছবার জন্যে মানুষকে কর্মতৎপর হতে হবে।

জড়তাকে সবরকমে এড়িয়ে চলতে হবে। কাজ মানেই প্রতিরোধ। মানসিক, শারীরিক সবরকম অন্যায়কে বাধা দাও; তাতে সফল হলে শান্তি আসবে। "কাউকে ঘৃণা ক'রো না, অন্যায়কে বাধা দিও না", বলা খুব সহজ, কিন্তু বাস্তবে করা কঠিন তা আমরা জানি। সমাজ আমার দিকে তাকালে আমি অপ্রতিরোধের ভান করতে পারি, কিন্তু মনে সর্বদা অশান্তি থাকবে। অপ্রতিরোধের শান্তি মনে অনুভব করতে পারব না; মনে হবে, বাধা দিলে ভাল হত। যদি ধন চাও অথচ বুঝতে পার, যে ধন চায় তাকে সমগ্র জগৎ খুব খারাপ লোক বলে মনে করে, তাহলে হয়ত ধন অর্জনের চেষ্টা করার সাহস হবে না, অথচ দিনরাত মন ছুটবে ধনের চিন্তার পিছনে। এটা ভণ্ডামি, এতে কোনো কাজ হয় না। জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ো, সব দুঃখ-সুখ ভোগ করার পরে ত্যাগ আসবে; তারপর আসবে শান্তি। সুতরাং ক্ষমতার এবং অন্যান্য বস্তুর বাসনা পূর্ণ কর, বাসনা পূর্ণ হলে এক সময়ে জানবে, ওসব অতি তুচ্ছ জিনিস; কিন্তু তার আগে কাজের মধ্য দিয়ে না গেলে শান্তি, সমর্পণের অবস্থা আসা অসম্ভব। এই ত্যাগ ও শান্তির ধারণা হাজার হাজার বছর ধরে প্রচার করা হয়েছে; প্রত্যেকে ছোটবেলা থেকে এসব কথা শুনেছে, অথচ এ অবস্থায় পৌঁছেছে এমন লোক খুব কমই আছে। আমি অর্ধেক পৃথিবী ঘুরেছি, তবু প্রকৃত শান্ত মানুষ কুড়িজনও দেখেছি কি না বলতে পারি না।

প্রত্যেকের উচিত নিজের আদর্শ পূর্ণ করার চেষ্টা করা। অন্য লোকের আদর্শ পূর্ণ করার আশা থাকে না, তার চেয়ে এটা উন্নতির নিশ্চিত উপায়। যেমন, আমরা একটি শিশুকে কুড়ি মাইল হাঁটতে বললাম। হয় সে মারা যাবে, নয় তো হাজারের মধ্যে একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়ে ক্লান্ত, অর্ধমৃত অবস্থায় পৌঁছবে। আমরা এ জগতে যা করার চেষ্টা করি তা এইরকম। যে কোনো সমাজের সব পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মনোভাব বা ক্ষমতা এক নয়; তাদের আদর্শ আলাদা আলাদা, তাকে আমাদের তুচ্ছ করার অধিকার নেই। প্রত্যেকে নিজের আদর্শে পৌঁছতে প্রাণপণ চেষ্টা করুক। আমাকে তোমার দৃষ্টিতে বা তোমাকে আমার দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। আপেল গাছকে ওক গাছের মানদণ্ডে বা ওক গাছকে আপেলের মানদণ্ডে বিচার করা উচিত নয়। আপেল গাছকে আপেলের এবং ওক গাছকে ওকের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, একের মধ্যে বৈচিত্র্য। পুরুষ ও স্ত্রীলোকে যতই পার্থক্য থাক, তার পিছনে রয়েছে ঐক্য। বিভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র সৃষ্টির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য। অতএব, এক মাপকাঠিতে তাদের বিচার করা উচিত নয় বা এক আদর্শ তাদের সামনে ধরা উচিত নয়। এতে অস্বাভাবিক সংগ্রামের সূচনা হয়, ফলে মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে, ধার্মিক ও সৎ হতে পারে না। আমাদের কাজ হল, প্রত্যেককে তার শ্রেষ্ঠ আদর্শের জন্য সংগ্রামে উৎসাহিত করা এবং আদর্শকে যতদূর সম্ভব বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা।

হিন্দু নীতিবিধানে আমরা দেখি, অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে এই সত্য স্বীকৃত হয়েছে; তাদের নীতিশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের মানুষ—গৃহস্থ, সন্ন্যাসী (যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন); ছাত্র—প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম আছে।

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের জগতের প্রতি কর্তব্য ছাড়াও নিজস্ব কর্তব্য আছে। হিন্দু জীবন শুরু করে ছাত্র হয়ে; তারপর বিবাহ করে সংসারী হয়, বৃদ্ধ বয়সে অবসর নেয় এবং শেষে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়। জীবনের এই প্রতিটি স্তরে কিছু কর্তব্য আছে। কোনো স্তর অন্যটির চেয়ে শ্রেয় নয়। বিবাহিত লোকের জীবন ধর্মপ্রাণ ব্রহ্মচারীর মতই মহৎ। রাস্তার ঝাড়ুদার সিংহাসনের রাজার মত মহৎ ও গৌরবময়। রাজাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ঝাড়ুদারের কাজ করিয়ে দেখো, কেমন করে। ঝাড়ুদার কেমন রাজত্ব করে দেখো। যে সংসারে আছে. তার চেয়ে যে সংসার ত্যাগ করেছে,সে বড়—একথা বলা নিরর্থক; সংসার ত্যাগ করে স্বাধীন জীবন যাপন করার চেয়ে সংসারে থেকে ঈশ্বর-সাধনাকরা অনেক কঠিন কাজ। ভারতবর্ষে জীবনের চারটি স্তর পরে কমে দুটি স্তরে দাঁড়ায়—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। গৃহস্থ বিবাহ করে নাগরিকের দায়িত্ব পালন করে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য হল, ধর্মপ্রচার ও ঈশ্বর-আরাধনায় সব উদ্যম উৎসর্গ করা। আমি এই বিষয়ে মহানির্বাণতন্ত্র থেকে কিছু অংশ তোমাদের পড়ে শোনাব, দেখবে গৃহস্থ হয়ে সব কর্তব্য ঠিক ভাবে করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

গৃহস্থ ঈশ্বরভক্ত হবে; ঈশ্বরকে জানাই হবে তার জীবনের উদ্দেশ্য। অথচ তাকে অবিরাম কাজ করতে হবে, সব কর্তব্য করতে হবে; তাকে কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে।

এ জগতে কাজ করে কর্মফলের চিন্তা না করা, কাউকে সাহায্য করে তার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, কোনো সৎ কাজ করে খ্যাতি বা কোনো কিছুর অপেক্ষা না করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। জগতের প্রশংসা পেলে চরম কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজ প্রশংসা করলে মূর্খও বীরত্ব দেখাতে পারে, কিন্তু আশেপাশের প্রশংসার অপেক্ষা না রেখে অবিরাম সৎ কাজ করে যাওয়া হল চরম আত্মত্যাগ। গৃহস্থের মহৎ কর্তব্য হল অর্থোপার্জন করা, কিন্তু দেখতে হবে, অন্যদের মিথ্যা বলে, ঠকিয়ে যেন সে উপার্জন না করে; এবং তাকে মনে রাখতে হবে, তার জীবন ঈশ্বর ও দরিদ্রের সেবায় উৎসর্গীকৃত।

মা এবং বাবাকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্তি জেনে সবরকমে তাঁদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। যে সন্তান কখনো মা-বাবাকে কঠোর কথা বলে না, সে হল প্রকৃত সন্তান।

তাঁদের সামনে ঠাট্টা করবে না, চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না, ক্রুদ্ধ হবে না। তাঁদের প্রণাম জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসতে না বললে বসবে না।

যদি বাবা-মা, সন্তান, স্ত্রী ও দরিদ্রদের ব্যবস্থা না করেই গৃহস্থ নিজের খাদ্য-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে, তাহলে সে পাপে লিপ্ত হয়। এই দেহের উৎস বাবা-মা; সুতরাং তাঁদের জন্য মানুষকে সহস্র কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

স্ত্রীর প্রতিও এই কর্তব্য। স্ত্রীকে তিরস্কার করবে না, মায়ের মত পালন করবে। চরমে বিপদেও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না।

যে পরস্ত্রীর চিন্তা করে, এমন কি শুধু মনে মনে তাকে স্পর্শ করলেও—নরকে যায়।

মেয়েদের সামনে অশোভন ভাষায় কথা বলবে না, নিজের ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করবে না। বলবে না, "আমি এই করেছি, ঐ করেছি।"

গৃহস্থ সর্বদা স্ত্রীকে অর্থ, বস্ত্র, প্রেম, বিশ্বাস ও অমৃতময় ভাষায় তুষ্ট করবে, কখনো তার বিরক্তি ঘটাবে না। যে পুরুষ সতী স্ত্রীর ভালবাসা পেয়েছে সে ধর্ম ও অন্য সব সদ্‌গুণে সফল হয়েছে।

সন্তানদের প্রতি কর্তব্য হল:

চারবছর বয়স পর্যন্ত পুত্রকে সস্নেহে পালন করবে; ষোলবছর পর্যন্ত শিক্ষাদান করবে। কুড়ি বছরে তার কাজে রত হওয়া উচিত; তখন বাবা তার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করবেন। ঠিক এক ভাবে কন্যাকেও পালন করতে হবে এবং অতি যত্নে লেখাপড়া শেখাতে হবে। বিবাহের সময়ে তাকে অলঙ্কার ও সম্পদ দান করা উচিত।

তারপর ভাইবোন, তাদের সন্তান, অন্যান্য আত্মীয়, বন্ধু ও ভৃত্যদের প্রতি কর্তব্য। তারপর একই গ্রামের অন্যান্য অধিবাসী, দরিদ্র এবং সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতি কর্তব্য। যথেষ্ট সচ্ছলতা সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ আত্মীয় ও দরিদ্রদের না দেখে তাহলে তাকে অমানুষ বলে জানবে; সে মানুষ নয়।

খাদ্য, বস্ত্রের অতিরিক্ত বিলাসিতা, দেহের অত্যধিক যত্ন, চুলের যত্ন এড়িয়ে চলা উচিত। গৃহস্থকে সর্বদা দেহে মনে পরিচ্ছন্ন এবং কর্মঠ হতে হবে।

শত্রুদের প্রতি তার আচরণ হবে বীরের মত। তাদের বাধা দিতে হবে। এটা গৃহস্থের কর্তব্য। এককোণে বসে কেঁদে অপ্রতিরোধের কথা বললে চলবে না। শত্রুদের প্রতি বীরত্বের ভাব না দেখালে সে কর্তব্যচ্যুত হবে। বন্ধু ও আত্মীয়দের প্রতি তার ব্যবহার হবে অতি শান্ত।

দুষ্টব্যক্তিকে সমীহ না করা গৃহস্থের কর্তব্য; কারণ, তাহলে সে অন্যায়কে সাহায্য করবে; এবং সম্মানীয় ও সৎলোকদের অশ্রদ্ধা করলে ভুল করা হবে। সে বন্ধুদের নিয়ে আত্মহারা হবে না; বন্ধু করার জন্য যে কোন জায়গায় ছুটে যাবে না; যাদের বন্ধু করতে চায়, তাদের কার্যকলাপ অন্যের প্রতি ব্যবহার লক্ষ্য করে মনে মনে আলোচনা করে বন্ধুত্ব করবে।

তিনটি বিষয়ে সে আলোচনা করবে না। নিজের খ্যাতির কথা, নিজের ক্ষমতার কথা, অর্থের কথা এবং তাকে যে গোপন কথা বলা হয়েছে, সে কথা প্রকাশ্যে বলবে না।

নিজেকে ধনী বা দরিদ্র বলবে না—ধনের জন্য গর্ব করবে না। নিজের পরামর্শ-দাতা রাখবে; এটা ধর্মীয় কর্তব্য। এ শুধু বাস্তব-বুদ্ধি নয়; এরকম না করলে তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যেতে পারে।

গৃহস্থ হল সমগ্র সমাজের ভিত্তি। সে প্রধান উপার্জনকারী। দরিদ্র, দুর্বল, শিশু এবং স্ত্রীলোক যারা উপার্জন করে না—তারা সবাই গৃহস্থের উপরে নির্ভরশীল; সুতরাং তাকে কিছু কর্তব্য করতে হবে, কর্তব্য করার তার শক্তি থাকা চাই, যেন মনে না হয় যে, আদর্শে পৌছতে পারছে না। কাজেই, কোনো ভুলভ্রান্তি ঘটলে তা প্রকাশ্যে বলবে না; যদি কোনো কাজে ব্যর্থতা নিশ্চিত বলে বোঝে, তবু সে কথা বলবে না। এরকম বলা শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, মানুষকে দুর্বল করে দেয়, জীবনের কর্তব্য পালনের অনুপযুক্ত করে দেয়। প্রথমতঃ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পদের জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এটা তার কর্তব্য, কর্তব্য না করলে সে মানুষ নয়। যে গৃহস্থ ধন অর্জনের চেষ্টা করে না, সে দুর্নীতিগ্রস্ত। যদি সে অলস হয়, আলস্যে জীবন কাটাতে চায়, তাহলেও সে দুর্নীতিপরায়ণ, কারণ তার ওপরে শত শত লোক নির্ভরশীল। সে সম্পদ অর্জন করলে বহু লোককে পালন করতে পারবে।

যদি এই শহরের শত শত লোক ধন অর্জনের চেষ্টা না করত, তাহলে এই সভ্যতা, দাতব্য গৃহ, বড় বড় বাড়ি কি করে হত?

অতএব ধন অর্জন খারাপ নয়, কারণ, এ ধন বিতরণের জন্য। গৃহস্থ জীবনও সমাজের কেন্দ্র। ধন উপার্জন করে তা সৎভাবে ব্যয় করাই তার উপাসনা, কারণ, সন্ন্যাসী গুহায় বসে প্রার্থনার দ্বারা যে কাজ করে গৃহস্থ সৎ উপায়ে ধন অর্জন করে সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করে সেই কাজই করে; কারণ, উভয়ক্ষেত্রেই ঈশ্বরভক্তিজাত আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ দেখতে পাই।

গৃহস্থকে সুখ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। সে জুয়া খেলবে না, অসৎসঙ্গে মিশবে না, মিথ্যা বলবে না এবং অন্যদের কষ্ট দেবে না।

প্রায়ই লোকে সাধ্যাতীত কাজ করার চেষ্টা করে, ফলে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তারা অন্যকে ঠকায়। তারপর সময়ের কথা মনে রাখতে হবে; এক সময়ে যা ব্যর্থ হয়, অন্যসময়ে তা খুব সফল হতে পারে।

গৃহস্থকে সত্যকথা বলতে হবে, মৃদুস্বরে কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, যে কথায় অন্যের উপকার হয়; অন্য লোকের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে না।

গৃহস্থ পুকুর খুঁড়ে, রাস্তায় গাছ লাগিয়ে মানুষ ও জন্তুর জন্য বিশ্রামাগার করে, রাস্তা ও সেতু তৈরী করে মহত্তম যোগীর মত একই লক্ষ্যে পৌঁছয়।

এটা কর্মযোগের এক অংশ—কর্মতৎপরতা, গৃহস্থের কর্তব্য। পরে এক অংশে বলা হয়েছে "যদি গৃহস্থ স্বদেশ বা স্বধর্মের জন্য সংগ্রাম করে মারা যায়, তাহলে ধ্যান করে যোগী যে লক্ষ্যে পৌঁছন, সেই লক্ষ্যেই পৌঁছয়।" এতে বোঝা যায়, সকলের কর্তব্য এক নয়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলছে না যে, এ কর্তব্যটা ছোট, ওটা বড়। প্রতিটি কর্তব্যের নিজস্ব জায়গা আছে, যেমন পরিস্থিতিতে আমরা পড়ি, সেই অনুযায়ী কর্তব্য করি।

এর থেকে একটি ধারণা গড়ে ওঠে—সব দুর্বলতা পরিহার করা। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্ম—সব ক্ষেত্রে এই ধারণাটি আমি পছন্দ করি। বেদ পড়লে দেখবে এই কথা বার বার বলা হয়েছে—ভয়হীনতা—ভয় পেও না। ভয় দুর্বলতার চিহ্ন। পৃথিবীর উপেক্ষাকে লক্ষ্য না করে কর্তব্য করতে হবে।

কেউ যদি ঈশ্বর-আরাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করে, তবে সে যেন না ভাবে, যারা সংসারে আছে, সংসারের কল্যাণের জন্য কাজ করছে, তারা ঈশ্বরের উপাসনা করছে না: যারা সংসারী, তারাও যেন না ভাবে, সন্ন্যাসীরা অপদার্থ ভবঘুরে। প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে মহান। একটা গল্পের সাহায্যে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একজন রাজা তাঁর রাজ্যে কোনো সন্ন্যাসী এলেই বলতেন, "যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে আর যে সংসারে থেকে গৃহস্থের কর্তব্য করছে, এদের মধ্যে কে বড়?" অনেক পণ্ডিত এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কেউ বললেন, সন্ন্যাসী বড়। তখন রাজা বললেন, প্রমাণ দিতে হবে। না পারলে তাদের বিবাহ করে গৃহস্থ হতে বললেন। তখন অনেকে বলল, "যে গৃহস্থের কর্তব্য করে সে বড়।" এবারেও রাজা প্রমাণ চাইলেন। তারা প্রমাণ দিতে না পারায় তাদেরও গৃহস্থ হতে বাধ্য করলেন।

শেষে এলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী, রাজা তাঁকেও প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, "মহারাজ, সকলেই আপন ক্ষেত্রে বড়।" রাজা বললেন, "প্রমাণ দাও।" সন্ন্যাসী বললেন, "প্রমাণ দেব, তবে কয়েকদিন আপনাকে আমার মত জীবন কাটাতে হবে, যাতে আমি আমার বক্তব্যের প্রমাণ দিতে পারি।" রাজা রাজী হয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিজের রাজ্য ছেড়ে বহু দেশ পেরিয়ে এক বিরাট রাজ্যে এলেন। সে রাজ্যের রাজধানীতে এক বিশাল উৎসব চলেছে। রাজা ও সন্ন্যাসী গানবাজনার শব্দ শুনতে

পেলেন ; লোকেরা ভাল জামাকাপড় পরে পথে পথে জড়ো হয়েছে, খুব হৈ-চৈ চলছে। কিন্তু ব্যাপার দেখার জন্য রাজা ও সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘোষক চীৎকার করে বলছে, ঐ দেশের রাজকন্যার স্বয়ম্বর হবে।

রাজকন্যাদের এভাবে স্বামী-নির্বাচন ভারতবর্ষের এক প্রাচীন প্রথা। প্রতি রাজকুমারীর স্বামী সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা থাকত। কেউ চাইত সুদর্শন পুরুষ, কেউ জ্ঞানী, কেউ ধনী ইত্যাদি। আশেপাশের সব রাজপুত্ররা সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে উপস্থিত হত। মাঝে মাঝে, তারা যেন নিজেদের রাজকন্যার উপযুক্ত মনে করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের নিজস্ব ঘোষক রাখত। রাজকুমারীকে অতিসুন্দর পোশাক পরিয়ে সিংহাসনে ঘোরানো হত, সব দেখানো ও শোনানো.হত। সব দেখেশুনে খুশী না হলে রাজকুমারী বাহকদের বলত "এগিয়ে চল"। প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীদের দিকে আর কেউ তাকাত না। কারোর প্রতি প্রসন্ন হলে রাজকুমারী তার গলায় মালা দিত, সে তার স্বামী হত।

সে দেশে আমাদের রাজা ও সন্ন্যাসী এসেছেন, সে দেশের রাজকন্যা এরকম একটা সুন্দর উৎসব করতে যাচ্ছেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী রাজ্যের রাজা হবেন। রাজকুমারীর ইচ্ছে, সবচেয়ে রূপবান পুরুষকে বিবাহ করবেন, কিন্তু পছন্দমত কাউকে পেলেন না। অনেকবার স্বয়ম্বরসভা হয়েছে, তবু রাজকুমারী স্বামী নির্বাচন করতে পারেননি। এবারের সভা সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ ; বহু লোক এসেছে। রাজকুমারীকে সিংহাসনে বহন করে বাহকরা এগিয়ে চলেছে। রাজকুমারী যেন কাউকে দেখছেন না, প্রত্যেকে হতাশ যে, এবারের সভাও ব্যর্থ হবে। ঠিক তখনি এলেন এক রূপবান তরুণ সন্ন্যাসী, মনে হল যেন মাটিতে সূর্যের উদয় হয়েছে, তিনি সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছেন, কি হচ্ছে। রাজকন্যা তাঁর কাছে এলেন, সুদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখেই থেমে গিয়ে তাঁর গলায় মালা দিলেন। তরুণ সন্ন্যাসী মালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "এসব কি ? আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে বিবাহের কি মূল্য ?" সে দেশের রাজা ভাবলেন, বোধহয় এ ব্যক্তি দরিদ্র বলে রাজকুমারীকে বিবাহ করতে সাহস করছে না। তাই বললেন, "এখন মেয়ের সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব দেব এবং আমার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ রাজত্ব পাবে !" তিনি সন্ন্যাসীকে আবার সেই মালা পরিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী আবার তা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, "আমি বিবাহ করতে চাই না", তারপর সেই সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

রাজকুমারী এই তরুণকে এত ভালোবেসেছিলেন যে, বললেন, "হয় একে বিবাহ করব, নয় আত্মহত্যা করব"; তিনি সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর পিছনে ছুটলেন। তখন আমাদের যে সন্ন্যাসী রাজাকে ঐ দেশে এনেছিলেন, তিনি বললেন, "মহারাজ, চলুন আমরাও ওদের পিছনে যাই"; সুতরাং ওঁরা চললেন একটু দূরত্ব রেখে। যে তরুণ সন্ন্যাসী রাজকুমারীকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়েছিলেন তিনি অনেক পথ হাঁটলেন। তারপর এক অরণ্যে প্রবেশ করলেন, রাজকুমারীও সেখানে ঢুকলেন, তাঁর পিছনে বাকী দুজন। এই তরুণ সন্ন্যাসীর ঐ অরণ্য অতিপরিচিত, তিনি

সেখানকার সব পথ চেনেন। হঠাৎ একটা পথে ঢুকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, রাজকুমারী তাঁকে খুঁজে পেলেন না। সন্ন্যাসীকে অনেকক্ষণ খুঁজে তিনি এক গাছের নীচে বসে কাঁদতে লাগলেন, কারণ, ফিরবার পথ তিনি চেনেন না। তখন আমাদের রাজা ও সন্ন্যাসী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, কাঁদবেন না; আমরা আপনাকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দেব, কিন্তু এখন এত অন্ধকারে পথ পাওয়া যাবে না। এখানে একটা বড় গাছ আছে; আসুন এর নীচে বিশ্রাম নিই, সকালে আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।"

এখন ঐ গাছের উপরে বাসায় একটি ছোট পাখি, তার স্ত্রী এবং তিনটি শিশু থাকত। এই ছোট পাখিটি নীচে তাকিয়ে তিনজনকে দেখে স্ত্রীকে বলল, "আমরা কি করব? বাড়িতে কয়েকজন অতিথি এসেছে, এখন শীতকাল, আমাদের কাছে আগুন নেই।" কাজেই সে উড়ে গিয়ে ঠোঁটে করে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ এনে অতিথিদের সামনে ফেলে দিল, তাঁরা ওতে কাঠকুটো দিয়ে বড় আগুন করে নিলেন। কিন্তু ছোট পাখিটি সন্তুষ্ট হল না। সে আবার স্ত্রীকে বলল, "আমরা কি করব? এঁদের খেতে দেওয়ার মত কিছু নেই, অথচ এঁরা ক্ষুধার্ত। আমরা গৃহস্থ; বাড়িতে কেউ এলে তাকে খাওয়ানো আমাদের কর্তব্য। কিছু আমায় করতেই হবে। আমার দেহকে ওঁদের দান করব।" সুতরাং সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেল। অতিথিরা তাকে পড়তে দেখে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

ছোট পাখিটির স্ত্রী তার স্বামীর কাজ দেখল, সে বলল, "তিনজন লোকের পক্ষে একটি পাখি যথেষ্ট খাদ্য নয়; স্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য হল, স্বামীর প্রচেষ্টাকে সফল করা; ওরা আমার দেহও লাভ করুক।" সেও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেল।

ছোট পাখি তিনটি দেখল, তখনো যথেষ্ট খাদ্য হয়নি, তারা বলল, "আমাদের বাবা-মা যথাসাধ্য করেছেন, তবু যথেষ্ট হয়নি। বাবা-মার কাজ অব্যাহত রাখা আমাদের কর্তব্য; আমাদের দেহও বিনষ্ট হোক।" তারাও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এসব দেখে বিস্মিত হয়ে ঐ তিনজন পাখিগুলিকে খেতে পারলেন না। তাঁরা উপবাসে রাত কাটালেন, সকালে রাজা ও সন্ন্যাসী রাজকুমারীকে পথ দেখিয়ে দিলে তিনি বাবার কাছে ফিরে গেলেন।

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আপনি দেখলেন, প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে মহান। যদি এই পৃথিবীতে থাকতে চান, তাহলে ঐ পাখিদের মত যে কোনো মুহূর্তে স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন। যদি সংসার ত্যাগ করতে চান, তাহলে তরুণটিকে অনুসরণ করুন, যার কাছে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং রাজত্বেরও মূল্য নেই। গৃহস্থ হতে চাইলে অন্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করুন; যদি ত্যাগের জীবন গ্রহণ করেন, তাহলে এমনকি সৌন্দর্য, অর্থ, ক্ষমতাকেও তুচ্ছ করুন। প্রত্যেকে আপন ক্ষেত্রে মহৎ, কিন্তু প্রত্যেকের কর্তব্য আলাদা।"

তৃতীয় অধ্যায়
কর্মরহস্য

অন্য লোকের দৈহিক প্রয়োজন পূর্ণ করা সত্যি মহৎ কাজ, কিন্তু প্রয়োজন যত বেশী হয় এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী হয়, ততই তা মহৎ। কোনো মানুষের এক ঘণ্টার অভাব মেটালে তা মহৎ কাজ; এক বছরের অভাব মেটালে তা মহত্তর; কিন্তু চিরকালের মত অভাব মেটালে তা শ্রেষ্ঠ সাহায্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞানই একমাত্র আমাদের দুঃখকে চিরকালের মত দূর করতে পারে; অন্য সব জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য আমাদের অভাব মেটায় মাত্র। একমাত্র আত্মিক জ্ঞান অভাবকে চিরকালের মত ধ্বংস করতে পারে; সুতরাং মানুষকে আধ্যাত্মিক সাহায্যদানই শ্রেষ্ঠ সাহায্য। যিনি মানুষকে আত্মিক জ্ঞান দান করেন, তিনি মানবজাতির মহত্তম কল্যাণকামী, তাই আমরা সর্বদা দেখি, যাঁরা মানুষকে আত্মিক সাহায্য দান করেন, তাঁরাই সবচেয়ে শক্তিশালী, কারণ, আধ্যাত্মিকতা হল আমাদের জীবনের সব কাজের যথার্থ ভিত্তি। আত্মিক বলে বলী লোক ইচ্ছা করলে সব ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করতে পারে। আত্মিক শক্তি না থাকলে দৈহিক তৃপ্তিও মেটে না। এরপর হল, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহায্য। খাদ্য-বস্ত্রের চেয়ে জ্ঞানদান অনেক মহত্তর কাজ; মানুষকে প্রাণ দেওয়ার থেকেও এ কাজ বড়, কারণ, জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত বাঁচিয়ে রাখে। অজ্ঞান হল মৃত্যু, জ্ঞানই জীবন। জীবন যদি অজ্ঞতার অন্ধকারে হাতড়ে কেটে যায়, তাহলে তার মূল্য খুব সামান্য। তারপর অবশ্য মানুষকে দৈহিক সাহায্যদানের প্রশ্ন আসে। সুতরাং অন্যকে সাহায্যদানের কথা ভাববার সময়ে আমাদের যেন এ ভুল না হয় যে, দৈহিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। ওটা সবে শুরু, কারণ এতে স্থায়ী তৃপ্তি আসে না। ক্ষুধার কষ্ট খেলেই মিটে যায়, কিন্তু আবার ক্ষুধা দেখা দেয়; আমার অভাব তখনই মিটবে, যখন সব অভাবের পারে যাব। তখন ক্ষুধা আমায় পীড়িত করবে না; কোন শোক, কোন দুঃখ আমায় বিচলিত করতে পারবে না। সুতরাং যে সাহায্য আমাদের আত্মিক শক্তি বাড়ায়, তাই শ্রেষ্ঠ সাহায্য, তারপর জ্ঞানদান এবং তারপর দৈহিক সাহায্য।

শুধু দৈহিক সাহায্য দিয়ে পৃথিবীর দুঃখ দূর করা যায় না। মানুষের প্রকৃতি না বদলালে এইসব দৈহিক প্রয়োজন বরাবর দেখা দেবে, দুঃখ চিরকাল থাকবে এবং কোন দৈহিক সাহায্য তাকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারবে না। একমাত্র সমাধান হল, মানবজাতিকে পবিত্র করা। অজ্ঞান সব পাপের এবং সব দুঃখের মূল। মানুষ জ্ঞান লাভ করুক, পবিত্র হোক, আত্মিক বলে বলী হোক, শিক্ষিত হোক, তখন জগৎ থেকে দুঃখ দূর হবে, তার আগে নয়। দেশের প্রতিটি বাড়িতে দাতব্য আশ্রম, দেশ জুড়ে হাসপাতাল করলেও মানুষের দুঃখ ঘুচবে না, যতক্ষণ না তার প্রকৃতি বদলায়।

আমরা বারবার ভগবদ্গীতায় পড়ি যে, অবিরাম কাজ করতে হবে। সব কাজই ভালমন্দে মেশানো। এমন কোন কাজ করতে পারি না, যাতে কোন না কোন উপকার হবে না; এমন কোন কাজ নেই, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি হবে না;

তবু আমাদের অবিরাম কাজ করে যেতে বলা হয়েছে। ভাল-মন্দ দুয়েরই ফল দেখা দেবে, দুয়েরই কর্মফল হবে। সৎ কাজ আমাদের ভাল ফল দেবে; অসৎ কাজ খারাপ ফল দেয়। কিন্তু ভাল-মন্দ দুটোই আত্মার বন্ধন। কাজের এই বন্ধনক্ষমতা সম্পর্কে গীতার সমাধান হল, আমরা যদি কর্মে নিজেদের জড়িত না করি, তাহলে তা আমাদের আত্মাকে বদ্ধ করবে না। কাজে 'আবদ্ধ' না হওয়া বলতে কি বোঝায়, তা বুঝবার চেষ্টা করব।

এটি গীতার কেন্দ্রীয় ভাবনা: অবিরাম কাজ করো, কিন্তু তাতে আবদ্ধ হয়ো না। সংস্কারকে "সহজাত প্রবণতা" বললে অনেকটা ঠিক বলা হয়। মন যেন একটি সরোবর, যত তরঙ্গ মনে ওঠে তা সম্পূর্ণ থেমে যায় না, একটা চিহ্ন রেখে যায়, রেখে যায় ভবিষ্যৎ তরঙ্গের সম্ভাবনা। এই পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাময় চিহ্নটিকেই সংস্কার বলা হয়। যে কোন কাজ আমরা করি, আমাদের প্রতিটি গতিভঙ্গী, চিন্তা মনে এরকম চিহ্ন রেখে যায়, বাইরে তা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও অবচেতন মনে সেগুলি যথেষ্ট জোরালোভাবেই থাকে। মনের এই চিহ্নগুলির সমষ্টি দিয়েই আমাদের প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট হয়। আমার অতীত জীবনের সমস্ত সংস্কার দিয়ে গড়ে উঠেছে আমার এই মুহূর্তের অস্তিত্ব। চরিত্র বলতে একেই বোঝায়; এইসব সংস্কারের সমষ্টি দিয়ে প্রতিটি মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে। যদি সৎ সংস্কারের প্রাধান্য ঘটে, তাহলে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কার হলে অসৎ হয়। যদি কোন লোক অবিরাম অসৎ কথা শোনে, অসৎ চিন্তা করে, অসৎ কাজ করে, তাহলে তার মন অসৎ সংস্কারে ভরে যায়; সেই সংস্কার আগেকার তার চিন্তা ও কাজকে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ এই অসৎ সংস্কারগুলি সর্বদা কাজ করছে, তার ফল অসৎই হবে, সেই লোকটিও হবে অসৎ; একে তার বদলাবার উপায় নেই। এই সংস্কারের সমষ্টি তার মনে অসৎ কাজের প্রবল বাসনা সৃষ্টি করবে। সে সংস্কারের হাতের পুতুল হয়ে পড়বে, তারা তাকে দিয়ে অসৎ কাজ করাবে। অনুরূপভাবে, কেউ ভালো চিন্তা ও ভালো কাজ করলে তার সংস্কার হবে সৎ; সেগুলিও তাকে জোর করে সৎ কাজ করতে বাধ্য করবে। যখন কেউ এত ভাল কাজ এবং এত ভাল চিন্তা করে যে, তার মনে সৎ কাজের অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা দেখা দেয়, তখন তার সংস্কারজাত মন তাকে অন্যায় কাজ করতে দেবে না; সংস্কারগুলি তাকে বাধা দেবে; সে তখন সম্পূর্ণরূপে সৎ ইচ্ছার অধীন। এক্ষেত্রে বলা যায়, লোকটির সৎ চরিত্র গড়ে উঠেছে।

কচ্ছপ যদি খোলার ভিতরে হাত-পা-মাথা ঢুকিয়ে রাখে, তাহলে ওকে মেরে টুকরো টুকরো করলেও সে বাইরে আসবে না, ঠিক তেমনই, যে লোকের চরিত্রের নিজের উদ্দেশ্যের উপরে কর্তৃত্ব রয়েছে, তার চরিত্রের আর বদল হয় না। সে মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে শিথিল করতে পারে না। অবিরাম সৎ চিন্তা, সৎ সংস্কারের ফলে, সৎ কাজের প্রবণতা দৃঢ় হয়, তখন আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে (অনুভবশক্তি, স্নায়ুকেন্দ্র) সংযত করতে সক্ষম হই। শুধু এইভাবেই চরিত্র গড়ে ওঠে, মানুষ সত্যকে লাভ করে। এরকম লোকের আর ভয়

থাকে না; সে কোন অন্যায় করতে পারে না। তাকে যে কোন লোকের সঙ্গে রাখ, কোন বিপদ হবে না। এই সৎ প্রবণতার চেয়েও একটা উঁচু অবস্থা আছে, সেটা হল, মুক্তির ইচ্ছা। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, সব যোগের উদ্দেশ্য হল, আত্মার মুক্তি, সব যোগই এক লক্ষ্যে নিয়ে যায়। বুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা বা খ্রীষ্ট প্রার্থনার দ্বারা যেখানে পৌঁছেছিলেন, শুধু কর্মের দ্বারাই মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মী ও জ্ঞানী, খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত, কিন্তু দুজনে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। এখানেই সমস্যা। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—সৎ ও অসতের বন্ধন থেকে মুক্তি। সোনার শিকলও লোহার শিকলের মত শিকলমাত্র। আমার আঙুলে একটি কাঁটা ফুটেছে, আরেকটা কাঁটা দিয়ে প্রথমটা বার করলাম; তারপর দুটোই ফেলে দিলাম; দ্বিতীয় কাঁটাটা রাখার কোন দরকার নেই, কারণ, দুটোই তো কাঁটা। সেরকম অসৎ প্রবণতাগুলিকে সৎ প্রবণতা দিয়ে বাধা দিতে হবে, সতের আঘাতে মন থেকে অসৎ সংস্কারকে সরাতে হবে, সব অসৎ চলে গেলে বা নিয়ন্ত্রিত হলে, সৎ প্রবণতাগুলিকেও জয় করতে হবে। এইভাবে "বদ্ধ" "মুক্ত" হয়। কাজ কর, কিন্তু কাজ বা চিন্তা মনে যেন গভীর ছাপ ফেলতে না পারে। তরঙ্গ উঠে মিলিয়ে যায়। পেশী আর মস্তিষ্ক বড় বড় কাজ করুক, কিন্তু তারা যেন আত্মায় গভীর চিহ্ন রাখতে না পারে।

এটা কিভাবে করা যাবে? আমরা দেখি, কোন কাজে আমরা আবদ্ধ হলে তার চিহ্ন থেকে যায়। সারাদিনে হাজার লোকের সঙ্গে দেখা হল, তাদের মধ্যে আমার প্রিয়জনকেও দেখলাম; রাতে যখন শুতে গেলাম, তখন সব মুখ মনে করার চেষ্টা করলেও যে প্রিয় মুখটি মাত্র এক মুহূর্ত দেখেছি, শুধু সেই মুখটি মনে পড়বে; আর সব মুখ মিলিয়ে গেছে। এই বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণের ফলে এই মুখটি মনে ছাপ রেখে গেছে। দৈহিক দিক দিয়ে সব মুখগুলি একভাবে দেখেছি; প্রতিটি মুখের ছবি অক্ষিপটে পড়েছে, মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করেছে, অথচ মনের উপরে সকলের প্রভাব সমান হয় নি। হয়ত অধিকাংশ মুখই নতুন, এদের কথা আগে কখনো ভাবি নি, কিন্তু একঝলক দেখা ঐ একটি মুখের সঙ্গে মনের যোগ রয়েছে। হয়ত বহুকাল ধরে মনে মনে ঐ মুখ দেখেছি, তার সম্বন্ধে অনেক কথা জানি এবং এবার তাকে নতুনভাবে দেখে আমার মনের শত শত ঘুমন্ত স্মৃতি জেগে উঠেছে; অন্যান্য মুখের চেয়ে এই একটি মুখের ছবি অনেক বেশীবার মনে জাগায় মনের উপরে এর প্রভাব খুব বেশী হবে।

সুতরাং "বদ্ধ" হয়ো না, কাজ হয়ে যেতে দাও; মস্তিষ্ক কাজ করুক; অবিরাম কাজ করুক, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনে চিহ্ন না রাখে। এমনভাবে কাজ করো যেন, এখানে তুমি একজন পথিক; সর্বদা কাজ করো, কিন্তু নিজেকে বেঁধো না; বন্ধন ভয়ঙ্কর বস্তু। এ জগৎ আমাদের বাসস্থান নয়, যে স্তরগুলি পেরিয়ে আমরা চলেছি, তারই একটি স্তরমাত্র। সাংখ্যের সেই মহৎ উপদেশ মনে রেখো, "সমগ্র প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়।" প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হল, আত্মার শিক্ষাদান; আর কোন অর্থ নেই; প্রকৃতি আছে, যাতে আত্মা জ্ঞানলাভ

করে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। এ কথা যদি সর্বদা মনে রাখি, তাহলে কখনো প্রকৃতিতে আবদ্ধ হব না; জানব যে, প্রকৃতি আমাদের পাঠ্যপুস্তক, প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা হয়ে গেলে সে পুস্তকের আর মূল্য নেই। তার বদলে আমরা নিজেদের প্রকৃতির সঙ্গে এক করে ফেলেছি; ভাবছি, আত্মা প্রকৃতির জন্য, দেহের জন্য, যাকে প্রচলিত কথায় বলে, "খাওয়ার জন্য বাঁচা", "বাঁচার জন্য খাওয়া" নয়। অনবরত আমরা এই ভুল করছি; প্রকৃতিকে আমাদের স্বরূপ বলে মনে করে তাতে আবদ্ধ হচ্ছি; যেই এই বদ্ধতা আসছে, তখনই আত্মায় তার গভীর চিহ্ন পড়ছে, সে চিহ্ন আমাদের ক্রীতদাসের মত কাজ করাচ্ছে।

এই শিক্ষার মূলকথা হল, প্রভুর মত কাজ কর, ক্রীতদাসের মত নয়; অবিরাম কাজ কর। কিন্তু ক্রীতদাসের কাজ নয়। কিভাবে প্রত্যেকে কাজ করছে, দেখতে পাচ্ছ না? কেউ সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাচ্ছে না; শতকরা নিরানব্বই জন দাসের মত খেটে দুঃখ পাচ্ছে; সব কাজ স্বার্থপ্রণোদিত। স্বাধীন হয়ে কাজ কর! প্রেমের সঙ্গে কাজ কর! "প্রেম" কথাটি বোঝা খুব কঠিন; মুক্তি না এলে প্রেম আসে না। দাসের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। যদি কোন দাসকে কিনে শিকলে বেঁধে কাজ করাও, তাহলে সে কাজ করবে, কিন্তু তার মনে কোন ভালবাসা থাকবে না। সুতরাং আমরা যখন দাসের মত কাজ করি, তখন আমাদের মধ্যে ভালবাসা থাকতে পারে না এবং আমাদের কাজ যথার্থ হয় না। আত্মীয়, বন্ধু এবং নিজেদের জন্য করা কাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। স্বার্থপর কাজ দাসের কাজ; একটা প্রমাণ দেখো। ভালবাসায় করা প্রতিটি কাজ সুখ নিয়ে আসে; এমন কোন প্রেমের কাজ নেই যাতে শান্তি ও আনন্দ দেখা দেয় না। যথার্থ অস্তিত্ব, যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ প্রেম চিরকাল পরস্পরযুক্ত: একটি থাকলে অন্য দুটিও থাকবে; সেই একের তিনটি রূপ— সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। এই সত্য আপেক্ষিক হলে তাকে জগৎরূপে দেখি; জ্ঞান জগতের বাস্তবজ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং আনন্দ মানবহৃদয়ের যথার্থ প্রেমের ভিত্তি হয়ে দেখা দেয়। অতএব, প্রকৃত প্রেম কখনো প্রেমিক বা প্রিয়কে দুঃখ দিতে পারে না। ধর, একজন পুরুষ একটি রমণীকে ভালবাসে; সে তাকে নিজের করে পেতে চায়, তার সম্বন্ধে খুব ঈর্ষান্বিত; চায় সেই রমণী তার কাছে বসে থাকুক, দাঁড়িয়ে থাকুক, তার আদেশে চলাফেরা করুক। সে নিজে ঐ রমণীর দাস, আবার রমণীটিকে নিজের দাসী করতে চায়। এ প্রেম নয়; এ হল দাসের অস্বাভাবিক আকর্ষণ, যা নিজেকে প্রেম বলে দেখাতে চায়। এ ভালবাসা হতে পারে না, কারণ এ কষ্টকর; মেয়েটি তার কথা না শুনলে সে কষ্ট পায়। ভালবাসায় কোন বেদনা নেই; সে শুধু আনন্দ দেয়; যদি না দেয়, তাহলে তা প্রেম নয়; অন্য কিছুকে ভুল করে প্রেম ভাবা হচ্ছে। যখন তোমরা তোমাদের স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সমগ্র বিশ্বজগৎকে এমন ভালবাসতে পারবে যে, কোন দুঃখ, ঈর্ষা বা স্বার্থপর মনোভাব থাকবে না। তখন মুক্তির যোগ্যতা লাভ করবে।

কৃষ্ণ বলেছেন, "অর্জুন, আমাকে দেখো! একমুহূর্ত যদি আমি কাজ না করি, তাহলে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজে আমার কোন লাভ নেই; আমি এক

ঈশ্বর, তবু কেন কাজ করি? কারণ, বিশ্বকে ভালবাসি।" ঈশ্বর ভালবাসেন বলে তিনি মুক্ত; যথার্থ প্রেম আমাদের মুক্ত করে। যেখানে বদ্ধতা, জগতের বস্তুতে মোহ, জানবে সেখানেই দৈহিক আকর্ষণ—তুটি বস্তুকে সর্বদা আকর্ষণ করছে, এবং কাছে আসতে না পারলে কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃত প্রেম দৈহিক আকর্ষণের উপরে নির্ভরশীল নয়। এরকম ব্যক্তিরা পরস্পরের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও তাদের প্রেম একই থাকে; তা মরে যায় না, বেদনারও সৃষ্টি করে না।

এই নির্লিপ্ত অবস্থায় পৌঁছানো সারা জীবনের সাধনা, কিন্তু এ অবস্থায় পৌঁছলে আমরা প্রেমের লক্ষ্য লাভ করে মুক্ত হই; প্রকৃতির বন্ধন খসে যায়, আমরা প্রকৃতিকে স্বরূপে দেখতে পাই; আর সে আমাদের বাঁধতে পারে না; আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হই, তখন কাজের ফল নিয়ে মাথা ঘামাই না; কি ফল হবে, তা কে ভাবে?

তোমরা সন্তানদের যা দিয়েছ, তার বিনিময়ে কি কিছু চাও? তাদের জন্য কাজ করা তোমাদের কর্তব্য, ওখানেই ব্যাপারটা মিটে গেল। সন্তানদের প্রতি তোমাদের যে মনোভাব, কোন বিশেষ ব্যক্তি, নগর, রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে গেলেও সেই মনোভাব গ্রহণ করবে—বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করো না। যদি নির্লিপ্ত হয়ে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে জগৎকে কিছু দিতে পার, তাহলে তোমার কর্ম তোমায় বদ্ধ করবে না। প্রত্যাশা থাকলেই বদ্ধতা আসে।

যদি ক্রীতদাসের মত কাজ করলে স্বার্থপরতা ও বদ্ধতা দেখা দেয়, তাহলে নিজের মনের প্রভু হয়ে কাজ করলে নির্লিপ্ততার আনন্দ দেখা দেবে। আমরা প্রায়ই ন্যায়ের কথা বলি, কিন্তু দেখি জগতে ন্যায়ধর্ম শুধু কথার কথা। তুটি বিষয় মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে: ক্ষমতা এবং করুণা। ক্ষমতা ব্যবহার হল স্বার্থপর আচরণ। সব পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিজেদের ক্ষমতা এবং সুবিধা যথাসাধ্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। করুণা হল স্বর্গ; সৎ হতে গেলে আমাদের করুণাময় হতে হবে। এমনকি ন্যায়ধর্মকেও করুণার ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। কাজের ফল পাবার চিন্তা থাকলেই উন্নতির বাধা ঘটে; শেষে দেখা দেয় তুঃখ। আরেক উপায়ে এই করুণা ও নিঃস্বার্থপর দানে অভ্যাস গড়ে তোলা যায়; যদি ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তা হলে কাজকে "পূজা" বলে মনে করা। এক্ষেত্রে আমরা সব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করি এবং তার ফলে মানুষের কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না। ঠিক যেমন জলে পদ্মপত্র সিক্ত হয় না, তেমন কাজ নিঃস্বার্থপর লোককে আবদ্ধ করতে পারে না। জনবহুল, পাপপূর্ণ শহরে থেকেও পাপ তাকে মলিন করতে পারে না।

এই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থবোধের উদাহরণ রয়েছে একটি কাহিনীতে: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবভ্রাতারা এক বিরাট যজ্ঞ করে দরিদ্রদের প্রচুর দান করলেন। যজ্ঞের বিশালতা ও আড়ম্বরে সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, পৃথিবীতে আগে এরকম যজ্ঞ কখনো হয় নি। কিন্তু অনুষ্ঠানের পরে এক নকুল সেখানে এল, তার দেহের অর্ধেক সোনা, অর্ধেক বাদামী; সে যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। চারপাশের লোকদের বলল, "তোমরা সবাই মিথ্যেবাদী; এটা কোন যজ্ঞই নয়।" তারা অবাক

হয়ে বলল, "কি! তুমি বলছ, এটা যজ্ঞ নয়; জান, দরিদ্রদের এত ধনরত্ন দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকে ধনী এবং সুখী হয়েছে? এমন আশ্চর্য যজ্ঞ কেউ কখনো করে নি।" কিন্তু নকুল বলল, "এক সময়ে একটা ছোট গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে বাস করতেন। তাঁরা খুব দরিদ্র ছিলেন, ধর্মোপদেশ ও শিক্ষাদান করে যা সামান্য পেতেন, তাই দিয়ে চলত। সেই দেশে তিনবছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দরিদ্র ব্রাহ্মণের খুব কষ্ট হতে লাগল। শেষে সপরিবারে কয়েকদিন উপবাসের পরে একদিন সকালে ব্রাহ্মণ ভাগ্যক্রমে কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন, সেটা সকলের জন্য চারভাগে ভাগ করলেন। তাঁরা ঐ ছাতু দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে খেতে যাবেন, এমন সময়ে দরজায় টোকা পড়ল। ব্রাহ্মণ দরজা খুললেন, একজন অতিথি দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতবর্ষে অতিথি পবিত্র ব্যক্তি; তাঁকে দেবতার মত সম্মান দেখাতে হয়। সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণ বললেন, "ভিতরে আসুন, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।" তিনি নিজের খাদ্য অতিথির সামনে রাখলেন, অতিথি দ্রুত তা খেয়ে নিয়ে বললেন, "মহাশয়, আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছেন; দশ দিন না খেয়ে আছি, এই সামান্য খাদ্যে ক্ষুধা যে বেড়ে গেল।" তখন স্ত্রী স্বামীকে বললেন, 'আমার অংশ ওঁকে দিন,' কিন্তু স্বামী বললেন, 'তা হবে না।' তবু স্ত্রী বললেন, 'ইনি দরিদ্র, গৃহস্থ হিসেবে আমাদের কর্তব্য এঁকে খাওয়ানো এবং আপনার খাদ্য যখন ফুরিয়ে গেছে, তখন স্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য আমার অংশ এঁকে দেওয়া।' তারপর স্ত্রী তাঁর অংশ অতিথিকে দিলেন, অতিথি খেয়ে বললেন, তখনো ক্ষুধায় তাঁর পেট জ্বলছে। সুতরাং পুত্র বলল, 'আমার অংশ নিন; পিতার প্রতিজ্ঞা-পূরণে পুত্রের সাহায্য করা কর্তব্য।' সে অংশ খেয়েও অতিথির ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না; সুতরাং পুত্রবধূও তার অংশ দিল। সেই অংশ খেয়ে তৃপ্ত হয়ে আশীর্বাদ করে অতিথি চলে গেল। সে রাতে ঐ চারজনের ক্ষুধায় মৃত্যু হল। সেই ছাতুর কিছু গুঁড়ো মাটিতে পড়েছিল; তার ওপরে গড়াগড়ি দিতে আমার দেহের অর্ধেক সোনা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তখন থেকে ঐরকম আরেকটি যজ্ঞ দেখার আশায় সারা পৃথিবী ঘুরছি, কিন্তু কোথাও পাই নি; কোথাও আমার বাকী দেহ সোনার হল না। তাই বলছি, এ কোন যজ্ঞ নয়।"

দানের এই ধারণা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছে; মহৎ ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রথম যখন ইংরাজী শিখছিলাম, তখন একটা ইংরাজী গল্পের বই পড়েছিলাম, তাতে একটি কর্তব্যপরায়ণ ছেলের কথা ছিল, সে রোজগার করে কিছু অর্থ তার বৃদ্ধা মাকে দিয়েছিল, তিন-চার পাতা জুড়ে তার প্রশংসা করা হয়েছে। এর অর্থ কি? কোন হিন্দু ছেলে এ গল্পের উপদেশ বুঝতে পারবে না। এখন যখন এই পাশ্চাত্য ধারণাটি শুনি যে—প্রত্যেকে নিজের জন্য—তখন ঐ কাহিনীর অর্থ বুঝতে পারি। কিছু লোক নিজেদের জন্য সব নিয়ে নেয়, বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তানদের কিছুই থাকে না। কোথাও, কখনো গৃহস্থের আদর্শ এরকম হওয়া উচিত নয়।

এখন বুঝতে পারছ কর্মযোগের অর্থ কি; নির্দ্বিধায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও মানুষকে সাহায্য করা। লক্ষবার ঠকলেও প্রশ্ন করবে না, কি করছ ভাববে না। দরিদ্রদের

প্রতি তোমার দান নিয়ে গর্ব করবে না অথবা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করবে না, বরং তারা তোমায় দান অভ্যাস করার সুযোগ নিয়েছে বলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। অতএব, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়ার চেয়ে আদর্শ গৃহী হওয়া অনেক কঠিন কাজ; যথার্থ ত্যাগের জীবনের চেয়ে যথার্থ কর্মজীবন কঠোরতর যদি না হয়, অন্ততঃ সমান কঠোর তো বটেই।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্তব্য কাকে বলে ?

কর্মযোগশিক্ষায় কর্তব্য কাকে বলে জানা দরকার। কোন কাজ করতে হলে জানতে হবে এটা আমার কর্তব্য, তারপর করতে পারব। কর্তব্যের ধারণা আবার এক এক জাতিতে এক একরকম। মুসলমান বলে, কোরানে যা লেখা আছে তাই তার কর্তব্য; হিন্দু বলে, বেদে যা আছে, তাই কর্তব্য আর খ্রীষ্টান বলে, বাইবেলে যা আছে তাই করণীয়। আমরা দেখছি, জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ এবং বিভিন্ন জাতি অনুযায়ী কর্তব্যের বিচিত্র ধারণা রয়েছে। যে কোন সার্বজনীন ভাবমূলক শব্দের মত "কর্তব্য" শব্দটিও স্পষ্ট করে বোঝানো অসম্ভব; আমরা শুধু তার বাস্তব কাজ ও ফল দেখে একটা ধারণা করতে পারি। যখন আমাদের সামনে কিছু ঘটনা ঘটে, তখন একটা বিশেষ আচরণ করার স্বাভাবিক বা অর্জিত প্রবণতা আমাদের দেখা দেয়; এই প্রবণতা হলে মন পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। কখনো সেই পরিস্থিতিতে একটা বিশেষভাবে কাজ করা তার ভাল মনে হয়; কখনো বা একই পরিস্থিতিতে ঐভাবে কাজ করা তার কাছে অন্যায় মনে হয়। সর্বত্র কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হল, প্রত্যেকের বিবেকের নির্দেশ অনুসরণ করা। কিন্তু কিভাবে একটা কাজ কর্তব্য হয়? যদি কোন খ্রীষ্টান সামনে একটুকরো গোমাংস পেয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে তা না খায়, বা অন্যের জীবন বাঁচাতে তাকে না দেয়, তাহলে তার মনে হবে, কর্তব্য করা হল না। কিন্তু কোন হিন্দু যদি ঐ মাংস খায় বা আরেকজন হিন্দুকে দেয়, তাহলে সে ভাববে, কর্তব্যে ত্রুটি হল; হিন্দুর শিক্ষা তাকে ঐভাবে ভাবতে বাধ্য করে। গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ঠগ নামে কুখ্যাত ডাকাতদল ছিল; তারা ভাবত, যে কোন লোককে মেরে টাকা কেড়ে নেওয়াই তাদের কর্তব্য; যত বেশী লোক মারত, ততই তারা খুশী হত। সাধারণভাবে, কোন লোক রাস্তায় বেরিয়ে আরেকজনকে গুলি করলে তার মনে হবে, সে অন্যায় করেছে। কিন্তু সেই লোকই যদি একজন নয়, বিশজনকে হত্যা করে সৈনিক হয়ে, তাহলে নিশ্চয় সে খুশী হয়ে ভাববে, দারুণভাবে কর্তব্য পালন করেছে। সুতরাং আমরা দেখছি, কাজ মাত্রেই কর্তব্য নয়। তাই কর্তব্যের বস্তুগত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ, ব্যক্তিগত কর্তব্য রয়েছে। যে কোন কাজ আমাদের ঈশ্বরাভিমুখী করে, তাই-সৎ কাজ, এবং আমাদের কর্তব্য; যে কাজ আমাদের নীচে নামায় তা অসৎ, অকর্তব্য। ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখি, কতকগুলি কাজ আমাদের মহৎ করে, আবার কিছু কাজ আমাদের নীচে নামায় ও বর্বর করে। কিন্তু সবরকম লোকের সব পরিস্থিতিতে কোন্ কাজের কি ফল, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য কর্তব্য সম্বন্ধে একটি ধারণা সমগ্র মানবজাতি সব যুগে, সব দেশে গ্রহণ করেছে, একটি সংস্কৃত উপদেশ বাক্যে তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে: "কাউকে আঘাত করো না; আঘাত না করা ধর্ম, আঘাত করা পাপ।"

ভগবদ্‌গীতা প্রায়ই জন্ম ও পরিস্থিতি-নির্ভর কর্তব্যের কথা বলেছেন। জীবনে এবং সমাজে জন্ম ও পরিস্থিতির ওপরেই প্রধানতঃ জীবনের বিভিন্ন কাজ-সম্পর্কে মানুষের মানসিক আর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে। অতএব আমাদের কর্তব্য হল, এমন কাজ করা যা আমাদের সমাজের আদর্শ ও কাজ অনুযায়ী আমাদের উন্নত করবে। কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, সব সমাজে এবং দেশে একই আদর্শ ও কাজ চলে না; এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার প্রধান কারণ হল, একজাতির প্রতি অন্য জাতির ঘৃণা। একজন মার্কিন ভাবে সে দেশের প্রথানুযায়ী যা করে, তা-ই শ্রেষ্ঠ, যে সেরকম না করে, সে অসৎ লোক। হিন্দু ভাবে তার প্রথাই ঠিক এবং জগতে শ্রেষ্ঠ, যারা এই প্রথা না মানে তারা নিশ্চয় অতি শয়তান। এই অতি স্বাভাবিক ভুল আমরা সবাই করি। কিন্তু এ ভুল খুব ক্ষতিকর; পৃথিবীর অর্ধেক সংকীর্ণতার এই হল কারণ। আমি যখন এ দেশে এসে শিকাগো মেলায় ঘুরছি, তখন একজন পিছন থেকে আমার পাগড়ী ধরে টানল। পিছন ফিরে দেখলাম, অতি ভদ্র চেহারার সুবেশ একটি লোক। তার সঙ্গে কথা বললাম; সে যখন দেখল আমি ইংরাজী জানি, তখন খুব লজ্জা পেল। আরেকবার ঐ মেলাতেই একজন আমাকে ধাক্কা দিল। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সেও লজ্জা পেয়ে আমতা আমতা করে ক্ষমা চেয়ে বলল, "ওরকম পোশাক পরেছেন কেন?" এসব লোকের সহানুভূতি নিজেদের ভাষা ও পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুর্বল জাতির উপরে সবল জাতির অত্যাচারের কারণ অনেকাংশে এই কুসংস্কার। এতে মানুষের প্রতি সৌহার্দ্য নষ্ট করে দেয়। সে জানতে চেয়েছিল আমি কেন তার মত পোশাক পরিনি এবং সে জন্য আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। সে হয়ত খুব ভাল লোক, কর্তব্যপরায়ণ পিতা, সৎ নাগরিক; তবু অন্য পোশাকে একজনকে দেখেই তার সহৃদয়তা চলে গেল। নবাগতরা সব দেশে দুর্ভোগে পড়ে, কারণ তারা আত্মরক্ষা করতে জানে না; তাই সেই দেশের লোকদের সম্বন্ধে তারা ভুল ধারণা নিয়ে ফিরে যায়। বিদেশে নাবিক, সৈনিক এবং বণিকরা অদ্ভুত আচরণ করে, অথচ স্বদেশে তারা ওরকম আচরণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না; বোধ হয় এই কারণে চীনারা ইউরোপীয় ও মার্কিনদের "বিদেশী শয়তান" বলে। ওরা যদি পাশ্চাত্য জীবনের সৎ, সহৃদয় দিকটি দেখত তাহলে এরকম বলতে পারত না।

অতএব, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অন্যের কর্তব্যকে আমরা অন্যের চোখ দিয়ে দেখব, নিজেদের মাপকাঠি দিয়ে তাদের প্রথাকে বিচার করব না। আমি বিশ্বের মানদণ্ড নই। জগতের সঙ্গে আমাকে মানিয়ে নিতে হবে, জগৎ নিজেকে আমার সঙ্গে মানিয়ে নেবে না। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, পরিবেশ কর্তব্যের ধরনকে বদলে দেয়, কোন বিশেষ সময়ে যা আমাদের কর্তব্য, তাই করাই শ্রেষ্ঠ। জন্মগত-ভাবে যা কর্তব্য, আমরা যেন তাই করি; তারপর জীবনে ও সমাজে যা কর্তব্য তাই করব। তবে মানুষের প্রকৃতিতে একটা বিরাট বিপদ আছে, সে কখনো আত্মসমীক্ষা করে না। সে ভাবে, সে রাজা হওয়ার উপযুক্ত। সে যোগ্যতা থাকলেও তাকে আগে দেখাতে হবে যে, নিজের কর্তব্য করেছে; তারপর আরো বড় কর্তব্য সে পালন

করবে। যখন আমরা জগতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে শুরু করি, তখন প্রকৃতি অবিরাম আঘাত করে আমাদের অবস্থা চিনিয়ে দেয়। অযোগ্য লোক দীর্ঘদিন শাস্তিতে কাজ করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে নালিশ করে লাভ নেই। নীচু কাজ করলেই মানুষ নীচু হয় না। কর্তব্যের ধরন দিয়ে কাউকে বিচার করা উচিত নয়, কিভাবে, কি মনোভাব নিয়ে কাজ করছে সেটা দেখা উচিত।

পরে আমরা দেখব, কর্তব্যের এই ধারণাও বদলে যায়, কাজের পিছনে উদ্দেশ্য না থাকলে সেটাই হল মহত্তম কাজ। তবু কর্তব্যপরায়ণতাই আমাদের কর্তব্যবিহীন কর্মের দিকে নিয়ে যায়; যখন কাজ হয়ে উঠবে পূজা—বা, পূজার চেয়েও মহত্তর—তখন কাজের জন্য কাজ করা হবে। আমরা দেখব, কর্তব্যের দর্শন নীতি বা প্রেম যে আকারেই থাক, অন্য সব যোগের অনুরূপ—তার উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র আমিত্বের উন্নতি, যাতে প্রকৃত বৃহৎ আমি প্রকাশ পায়—অস্তিত্বের নিম্নভূমিতে শক্তির অপব্যয় কমানো, যাতে আত্মা উচ্চতর ভূমিতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। হীন বাসনাগুলিকে কর্তব্যের দ্বারা অবিরাম দূর করে এই কাজ করা যায়। এইভাবে সচেতন বা অচেতন-ভাবে সমগ্র সমাজ কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বার্থপরতাকে সংযত করে উন্নত হয়, মানবপ্রকৃতির অসীম বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

কর্তব্য কচিৎ আকর্ষণীয় হয়। একমাত্র প্রেমের সাহায্যে কর্তব্যের চক্র মসৃণ গতিতে চলে; না হলে অনবরত সংঘর্ষ দেখা দেয়। কিভাবে বাবা-মা সন্তানদের প্রতি, স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি কর্তব্য করবে? প্রতিদিন আমাদের জীবনে কি সংঘর্ষ দেখা দেয় না? একমাত্র প্রেম কর্তব্যকে মধুর করে, স্বাধীনতার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে। তবু ভোগ, ক্রোধ, ঈর্ষা এবং শতসহস্র তুচ্ছ জিনিসের দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা? জীবনের পথে এই যে সব বাধার আমরা সম্মুখীন হই, সেখানে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হল, সহ্য করা। স্ত্রীলোকরা নিজেদের ক্রোধ, ঈর্ষার বশীভূত হয়ে স্বামীদের দোষারোপ করে এবং "স্বাধীনতা"র দাবি জানায়, তারা জানে না যে, এতে নিজেদের দাসত্ব প্রমাণিত হয়। যে স্বামীরা অবিরাম স্ত্রীদের দোষ দেখে, তাদেরও এই অবস্থা।

পুরুষ অথবা স্ত্রীর প্রধান গুণ হল পবিত্রতা, যত পতিতই হোক, তবু শান্ত, স্নেহ-শীলা, সতী স্ত্রীর চেষ্টায় সৎ পথে আসে না, এমন পুরুষ অতি বিরল। পৃথিবী এখনো তত খারাপ হয় নি। সারা পৃথিবীতে বর্বর স্বামী ও অধঃপতিত পুরুষের কথা অনেক শুনি, কিন্তু অতসংখ্যক বর্বর ও পতিতা রমণীও কি নেই? যদি সব স্ত্রীলোক যেমন দাবি করে, তেমন সৎ ও পবিত্র হত, তাহলে জগতে একটিও অসৎ পুরুষ থাকত না। এমন কোন্ পশুত্ব আছে, যা পবিত্রতার কাছে পরাভূত হয় না? যে সতী স্ত্রী নিজের স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষকে সন্তানের মত দেখে এবং সকলের সঙ্গে মায়ের মত ব্যবহার করে, তার পবিত্রতা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, কোন লোক যত পশুই হোক, তার উপস্থিতিতে পবিত্রতা অনুভব করবে। তেমনই প্রতি স্বামী নিজের স্ত্রী ব্যতীত সব স্ত্রীলোককে নিজের মা, মেয়ে বা বোন বলে ভাববে। যে ধর্মগুরু হতে চায় সে সব স্ত্রীলোককে মায়ের মত দেখবে এবং সেই মত আচরণ করবে।

মায়ের স্থান জগতে শ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র এই অবস্থাতে সর্বাধিক নিঃস্বার্থপরতা শেখা যায়। একমাত্র ঈশ্বরের প্রেম মায়ের ভালবাসার চেয়ে মহৎ; আর সব ভালবাসা তার চেয়ে নীচে। মার কর্তব্য হল, আগে সন্তানের কথা ভেবে নিজের কথা ভাবা। কিন্তু তার বদলে বাবা-মা যদি সর্বদা আগে নিজেদের কথা ভাবেন, তাহলে বাবা-মার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক হয় পাখির সঙ্গে পাখির বাচ্চাদের মত, তারা বড় হলে বাবা-মাকে চিনতে পারে না। যে পুরুষ রমণীকে ঈশ্বরের মাতৃত্বের প্রতিমূর্তির বলে মনে করে, সে ধন্য। যে রমণী পুরুষকে ঈশ্বরের পিতৃত্বের প্রতিমূর্তি মত দেখে সে ধন্য। যে সন্তানরা পৃথিবীতে বাবা-মাকে ঈশ্বর বলে দেখে তারা ধন্য।

কর্তব্য করে শক্তি সঞ্চয় করে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। এক তরুণ সন্ন্যাসী অরণ্যে গেলেন; সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ধ্যান করলেন, পূজা করলেন, যোগাভ্যাস করলেন। বহুবছর কঠোর সাধনার পর একদিন গাছের নীচে বসে আছেন, কয়েকটা শুকনো পাতা তাঁর মাথায় পড়ল। মুখ তুলে দেখলেন, গাছের মাথায় একটা কাক আর একটা বক মারামারি করছে, তিনি খুব রেগে গেলেন। বললেন, "কি! এতবড় স্পর্ধা, আমার মাথায় শুকনো পাতা ফেল!" এই বলে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন, মাথা থেকে আগুন বেরোল—যোগীদের এরকম ক্ষমতা ছিল—পাখি দুটো ছাই হয়ে গেল। সন্ন্যাসী এই ক্ষমতায় খুব খুশি হলেন—একবার তাকিয়ে কাক আর বক ভস্ম করতে পারেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে ভিক্ষার জন্য শহরে যেতে হল। গিয়ে এক দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "মা, ভিক্ষা দিন।" বাড়ির ভিতর থেকে জবাব এল, "একটু অপেক্ষা করুন, বাবা।" যুবক ভাবল, "হতভাগী, আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে! এখনো আমার ক্ষমতা জান না।" হঠাৎ আবার ভিতর থেকে শোনা গেল: "বাবা, নিজেকে বিরাট কিছু ভাববেন না। এখানে কাকও নেই, বকও নেই।" সন্ন্যাসী অবাক হলেন, তবু তাঁকে অপেক্ষা করতে হল। শেষে সেই রমণী আসতেই সন্ন্যাসী তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, "মা, ও কথা আপনি কি করে জানলেন?" রমণী বললেন, "বাবা, আমি আপনার যোগ বা ধ্যান কিছুই জানি না। আমি একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। আমার স্বামী অসুস্থ, তাঁর সেবা করছিলাম বলে আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলাম। সারাজীবন আমি কর্তব্য করার চেষ্টা করেছি। যখন কুমারী ছিলাম, তখন বাবা-মার প্রতি কর্তব্য করেছি; এখন বিবাহের পর স্বামীর প্রতি কর্তব্য করছি; এই আমার যোগসাধনা। কিন্তু কর্তব্য করে আমার উন্নতি ঘটেছে; তাই আপনার মনের ভাব বুঝে নিয়ে জানতে পারলাম, জঙ্গলে কি ঘটেছে। এর চেয়ে বেশী যদি জানতে চান, তাহলে অমুক শহরের বাজারে যান, সেখানে এক ব্যাধকে দেখতে পাবেন, সে আপনাকে কিছু শেখাবে, যা শিখলে আনন্দ পাবেন।" সন্ন্যাসী ভাবলেন, "কেন ঐ শহরে এক ব্যাধের কাছে যাব?" কিন্তু এখানকার ঘটনা দেখে ওঁর মন একটু উদার হয়েছে, সুতরাং সেখানে গেলেন। শহরের কাছে গিয়ে বাজার দেখতে পেলেন, দেখেন সেখানে একটু দূরে এক বড়, মোটাসোটা চেহারার ব্যাধ বসে বড় ছুরি দিয়ে মাংস কাটছে, আর নানা লোকের সঙ্গে কথা বলছে, দরাদরি করছে। সন্ন্যাসী বললেন, "হায় ভগবান! এর কাছে আমায়

শিখতে হবে? এ তো জ্যান্ত দৈত্য।" ইতিমধ্যে ব্যাধ মুখ তুলে বলল, "হে স্বামী, ঐ স্ত্রীলোক কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন? আমার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" সন্ন্যাসী ভাবলেন, "এখানে কি হবে?" তিনি বসলেন; ব্যাধ কাজ করে চলেছে। কাজ শেষ হওয়ার পরে টাকা নিয়ে সন্ন্যাসীকে বলল, "আসুন প্রভু, আমার বাড়িতে আসুন। বাড়ি ফিরে ব্যাধ তাঁকে আসন দিয়ে বলল, "এখানে বসুন", তারপর বাড়ির ভিতরে গেল। এবারে বৃদ্ধ বাবা-মাকে স্নান করিয়ে খাইয়ে তাঁদের পরিচর্যা করে সন্ন্যাসীর কাছে এসে বলল, "প্রভু, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন; আপনার জন্য কি করতে পারি?" সন্ন্যাসী তাঁকে আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, ব্যাধ তাঁকে যা বললেন, তা হল মহাভারতের একটি অংশ, ব্যাধ-গীতা। সেটি হল বেদান্তের মহত্তম অংশগুলির একটি। ব্যাধ কথা শেষ করলে সন্ন্যাসী অবাক হলেন। বললেন, "তোমার এই দেহ কেন? এই জ্ঞান নিয়ে তোমার এই ব্যাধের দেহ কেন, কেন এই নোংরা, কদর্য কাজ করছ?" ব্যাধ বলল, "বৎস, কোন কাজ কদর্য নয়, অপবিত্র নয়। আমার জন্ম আমাকে এই পরিবেশে রেখেছে। কৈশোরে আমি এই কাজ শিখেছি; আমি অস্পৃশ্য, আমার কর্তব্য ভালভাবে করার চেষ্টা করছি। আমি গৃহস্থের কর্তব্য করার চেষ্টা করছি, বাবা-মাকে সুখী করার চেষ্টা করছি। যোগ জানি না, সন্ন্যাসী নই, সংসার ত্যাগ করে বনেও যাই নি; তবু আপনি যা দেখলেন, যা শুনলেন, তা শিখেছি আমার কর্তব্য নির্লিপ্তভাবে করার ফলে।"

ভারতবর্ষে এক সন্ন্যাসী, এক বিরাট যোগী আছেন, সেরকম অপূর্ব লোক জীবনে কখনো দেখি নি। তিনি অদ্ভুত লোক, কাউকে কিছু শেখান না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন না। তাঁর পক্ষে গুরুর কাজ করা অসম্ভব, তা তিনি করবেন না। কোন প্রশ্ন করে যদি কয়েকদিন অপেক্ষা কর, তাহলে কথা প্রসঙ্গে উনি ঐ বিষয় উত্থাপন করে তাকে অসাধারণ আলোকে বিচার করবেন। একবার তিনি আমাকে কর্মরহস্য বলেছিলেন, "উদ্দেশ্য আর উপায় যেন এক হয়।" কোন কাজ করার সময়ে অন্য কিছু ভেবো না। পূজার মত কাজ করবে, তখনকার মত সমগ্র অস্তিত্ব তাতে সঁপে দেবে। এই কাহিনীতে ব্যাধ আর স্ত্রীলোক প্রসন্ন চিত্তে মনপ্রাণ দিয়ে কর্তব্য করেছে; ফলে ওরা জ্ঞানী। এতে বোঝা যায়, জীবনের যে কোন অবস্থার ফলে আবদ্ধ না হয়ে সঠিক কর্তব্য করলে আত্মার মুক্তির চরম স্তরে পৌঁছনো যায়।

ফলে আবদ্ধ ব্যক্তি কর্তব্য নিয়ে বিরক্ত হয়; নির্লিপ্ত কর্মীর কাছে সব কর্তব্যই সমান ভাল, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনাশের যোগ্য উপায় এবং আত্মার মুক্তির পথ। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করি। আমাদের কর্তব্য অনিচ্ছাতেই নির্ধারিত হয়। প্রতিযোগিতায় ঈর্ষার সৃষ্টি হয়, ফলে মনের কোমলতা মরে যায়। যে অপ্রসন্ন তার কাছে সব কর্তব্যই বিরক্তিকর; কোন কিছুতে সে খুশী হয় না, তার সারা জীবন ব্যর্থ হয়। যাই ঘটুক আমরা যেন কর্তব্য করে যাই, সর্বদা ভার বহনে প্রস্তুত থাকি। তাহলে নিশ্চয় আমরা সফল হব!

পঞ্চম অধ্যায়

জগতের নয়, আমরা নিজেদেরই উপকার করি

কর্তব্যপরায়ণতা আমাদের আত্মিক উন্নতিতে কতটা সাহায্য করে সে কথা ভাববার আগে ভারতবর্ষে কর্মের আরেকটি দিকের কথা সংক্ষেপে তোমাদের জানাই। প্রতিটি ধর্মে তিনটি অংশ আছে: দর্শন, পুরাণ ও অনুষ্ঠান। দর্শন প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা; পুরাণ মহান ব্যক্তিদের অলৌকিক জীবনী, অদ্ভুত কাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে ধর্মকে ব্যাখ্যা করে, তার উদাহরণ দেয়; অনুষ্ঠান দর্শনকে বাস্তব রূপ দেয়, যাতে প্রত্যেকে তার ধারণা করতে পারে—অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে দর্শনের বাস্তবরূপ। এই অনুষ্ঠান হল কর্ম; প্রতিটি ধর্মে এর প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা অধিকাংশই যথেষ্ট আত্মিক উন্নতি না করলে আধ্যাত্মিক ভাব বুঝতে পারি না। মানুষের পক্ষে এ কথা ভাবা সহজ যে, সে সব বুঝতে পারে ; কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তারা দেখে যে, ভাবগুলি প্রায়ই বোঝা খুব কঠিন। সুতরাং, প্রতীক অনেক সাহায্য করে, প্রতীকের পদ্ধতিকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না। অনাদ্যন্তকাল ধরে সব ধর্মে প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে। এক অর্থে, আমরা প্রতীক ছাড়া চিন্তা করতে পারি না; শব্দগুলিই চিন্তার প্রতীক। আরেক অর্থে, বিশ্বের সবকিছুকে প্রতীক মনে করা যায়। সমগ্র জগৎ হল প্রতীক, ঈশ্বর তার মূল। এরকম প্রতীক শুধু মানুষের তৈরী নয়; একধর্মাবলম্বী কয়েকজন একত্রে বসে কয়েকটি প্রতীক চিন্তা করে তৈরী করল, তা নয়। ধর্মের প্রতীকগুলির একটি স্বাভাবিক বিকাশ আছে। না হলে, কেন কয়েকটি প্রতীক প্রায় প্রত্যেকের মনে কয়েকটি ধারণার সঙ্গে জড়িত? কতকগুলি প্রতীক সার্বজনীন। তোমরা অনেকে হয়ত ভাবতে পার, খ্রীষ্টধর্মের যোগে প্রথম প্রতীকরূপে ক্রুশচিহ্নের ব্যবহার। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ চিহ্ন খ্রীষ্টধর্মের আগে, মোজেসের জন্মের আগে, বেদ রচনার আগে, মানুষের কোন চিহ্ন সৃষ্টিরও আগে ছিল। ঐ চিহ্ন হত অ্যাজটেক ও ফিনিশীয়দের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে; প্রতিটি জাতির হয়ত এই চিহ্ন ছিল। আবার, ক্রুশবিদ্ধ ত্রাতা, ক্রুশবিদ্ধ মানুষের প্রতীক মনে হয় প্রতিটি জাতির পরিচিত। বৃত্ত একটি বিশ্বব্যাপী প্রতীক। তারপর সবচেয়ে বিশ্বজনীন প্রতীক হল স্বস্তিকচিহ্ন। এক সময় মনে করা হত যে, বৌদ্ধরা এই চিহ্ন সারা পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু দেখা গেছে, বৌদ্ধধর্মের অনেক যুগ আগে এটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিশরে এই চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাতে কি বোঝা যায়? এই সব প্রতীক শুধু প্রথামাত্র হতে পারে না। নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে; তাদের সঙ্গে মানবমনের কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। ভাষা প্রথার ফলে উৎপন্ন নয়; এমন হতে পারে না যে, লোকে বরাবর বাঁধাধরা কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে কয়েকটি ধারণাকে প্রকাশ করেছে; শব্দ চিন্তা ছাড়া বা চিন্তা শব্দ ছাড়া নয়; চিন্তা ও কথা অবিচ্ছেদ্য। চিন্তার প্রতীক শব্দ বা রঙ হতে পারে। মূক-বধির লোকদের ধ্বনির প্রতীক বিনাই চিন্তা করতে হয়। মনের প্রতিটি চিন্তার একটি আকার রয়েছে। সংস্কৃত দর্শনে একে বলে 'নামরূপ'—নাম এবং আকার। বাঁধাধরা ছকে প্রতীকাবলী

এবং ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব। পৃথিবীর আনুষ্ঠানিক প্রতীকগুলিতে আমরা মানুষের ধর্মচিন্তার প্রকাশ দেখি। অনুষ্ঠান, মন্দির ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই, এ কথা বলা খুব সহজ; আধুনিক যুগে শিশুরাও একথা বলে। তবে এটা সহজেই দেখা যায়, যারা মন্দিরে পূজা করে না, তাদের সঙ্গে যারা মন্দিরে পূজা করে, তাদের অনেক পার্থক্য। সুতরাং, বিশেষ ধর্মের সঙ্গে বিশেষ মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বাস্তব আকারের সম্পর্ক সেই ধর্মের লোকদের মনে ঐ সব বাস্তব প্রতীকের ভিত্তি যে চিন্তাগুলি, সেগুলি এনে দেয়; অনুষ্ঠান এবং প্রতীককে অবহেলা করা মূর্খতা। এ গুলির আলোচনা ও সাধনা স্বভাবতঃ কর্মযোগের একটি অংশ।

এই কর্মবিজ্ঞানের অনেক দিক রয়েছে। একটি দিক হল, চিন্তা ও ভাষার সম্পর্ককে জানা এবং কথার শক্তিতে কি ঘটতে পারে, তা জানা। প্রত্যেক ধর্মে কথার শক্তি স্বীকৃত হয়েছে, এতদূর স্বীকৃত হয়েছে যে, কয়েকটি ধর্মে বলা হয়েছে, জগৎ সৃষ্টি হয়েছে কথার দ্বারা। ঈশ্বর-চিন্তার বাহ্যিক দিকটি হল কথা বা শব্দ এবং যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির আগে চিন্তা করেছেন, অতএব কথা থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি। আমাদের বস্তুগত জীবনের এই ব্যস্ততায় আমাদের স্নায়ুগুলি বোধশক্তি হারিয়ে কঠিন হয়ে যায়। যতই আমাদের বয়স বাড়ে, যত আমরা সংসারে ধাক্কা খাই, তত উদাসীন হয়ে যাই; যেসব ঘটনা চারপাশে প্রত্যক্ষ, সেগুলিকে অবহেলা করি। অবশ্য, মাঝে মাঝে মানবপ্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এসব সাধারণ ঘটনায় আমাদের কৌতূহল ও বিস্ময় জাগে; জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অতএব বিস্ময় হল প্রথম পদক্ষেপ। কথার মহত্তর দার্শনিক ও ধর্মীয় মূল ছাড়াও আমরা দেখি, মানব জীবননাট্যে শব্দ প্রতীকগুলির উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। তোমাদের স্পর্শ করছি না; আমার কথার ফলে উদ্ভূত বায়ুস্পন্দন তোমাদের কানে যাচ্ছে, তোমাদের স্নায়ুকে স্পর্শ করে মনকে প্রভাবিত করছে। এতে তোমরা বাধা দিতে পারছ না। এর চেয়ে অদ্ভুত কি হতে পারে? একজন আরেকজনকে মূর্খ বলল, তখনি সে উঠে দাঁড়িয়ে তার নাকে ঘুষি মারল। কথার শক্তি দেখ! একটি স্ত্রীলোক দুঃখে কাঁদছে, আরেকটি স্ত্রীলোক এসে তাকে কয়েকটি সান্ত্বনার কথা বলল, তার ন্যুব্জ-দেহ তখনি সোজা হল, দুঃখ দূর হল, সে হাসতেও শুরু করল। কথার শক্তি ভেবে দেখ! কথার শক্তি সাধারণ জীবনে এবং উচ্চতর দর্শনে বিরাট। দিবারাত্র বিনা চিন্তায়, বিনা কৌতূহলে এই শক্তিকে আমরা ব্যবহার করছি। এই শক্তিকে জানা এবং তাকে ঠিকমত ব্যবহার করাও কর্মযোগের একটি অংশ।

অন্যদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ হল, অন্যদের সাহায্য করা; জগতের কল্যাণ করা। কেন জগতের ভাল করব? জগতের উপকার করার জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেদের উপকারের জন্য। সর্বদা আমাদের পৃথিবীকে সাহায্য করা উচিত; সেটাই আমাদের মহত্তম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; কিন্তু ভাল করে চিন্তা করলে দেখব যে, পৃথিবীর আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন আদৌ নেই। আমি-তুমি সাহায্য করব বলে এই জগৎ তৈরী হয় নি। একবার একটা উপদেশ পড়েছিলাম, তাতে ছিল, "এই সুন্দর পৃথিবী খুব ভাল, কারণ সে অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমাদের সময় ও

সুযোগ দিয়েছে।" বাস্তবতঃ এটি ভারি সুন্দর ভাব, কিন্তু পৃথিবী আমাদের সাহায্য চায়, একথা বলা কি অন্যায় নয়? পৃথিবীতে অনেক দুঃখ আছে, এ কথা অস্বীকার করতে পারি না; অতএব, অন্যদের সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠ কাজ যদিও শেষে দেখব, অন্যদের সাহায্য করার অর্থ নিজেদের সাহায্য করা। ছোটবেলায় আমার কিছু সাদা ইঁদুর ছিল। ওদের ছোট ছোট চাকা লাগানো ছোট বাক্সে রাখা হত, ওরা চাকা পেরোবার চেষ্টা করলেই চাকাগুলো ঘুরত, ওরা নামতে পারত না। জগৎকে আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারটাও তাই। আমাদের একমাত্র উপকার হয়, নৈতিক উপকার। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়। প্রত্যেকে নিজের জগৎ গড়ে নেয়। কোন অন্ধ জগৎ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে ভাববে হয় নরম বা শক্ত, অথবা ঠাণ্ডা বা গরম। আমরা সুখ বা দুঃখের সমষ্টি; জীবনে অসংখ্যবার তা দেখেছি। সাধারণতঃ তরুণরা আশাবাদী আর বৃদ্ধরা নিরাশাবাদী হয়। তরুণদের সামনে জীবন; বৃদ্ধরা অভিযোগ করে, তাদের জীবন চলে গেছে; শত শত অপূর্ণ বাসনা তাদের মনে দেখা দেয়। দুজনেই মূর্খ। যে মনোভাব নিয়ে আমরা জগৎকে দেখি সেই অনুযায়ী সে ভাল অথবা মন্দ, সে নিজে কোনটাই নয়। আগুন ভাল অথবা মন্দ কোনটাই নয়। শরীর গরম রাখলে বলি "আগুন কি চমৎকার!" আঙুল পুড়িয়ে দিলে তাকে দোষ দিই। তবু সে নিজে ভালও নয়, মন্দও নয়। যেভাবে তাকে ব্যবহার করি, সেই অনুযায়ী ভাল-মন্দের বোধ দেখা দেয়। জগতও তাই। জগৎ ত্রুটিহীন। এর অর্থ, জগৎ নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, আমাদের ছাড়া জগৎ সুন্দরভাবে চলবে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য আমাদের ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

তবু আমাদের কল্যাণ করতে হবে; কল্যাণ করার ইচ্ছা হল আমাদের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, যদি আমরা জানি যে, অন্যদের সাহায্য করাটা একটা সুযোগ। কোনো উঁচু আসনে দাঁড়িয়ে হাতে পয়সা নিয়ে বলো না, "এই যে ভাই দরিদ্রগণ", বরং কৃতজ্ঞ বোধ করো যে, দরিদ্র রয়েছে, ফলে তাকে দান করে তুমি নিজের উপকার করতে পারছ। গ্রহীতা ধন্য হয় না, ধন্য হয় দাতা। জগতে তোমার সদিচ্ছা ও করুণাশক্তি চর্চার এবং এইভাবে পবিত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছ বলে কৃতজ্ঞ বোধ করো। সব সৎকাজই আমাদের পবিত্র করে। আমরা বড়জোর কি করতে পারি? হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতব্যালয় তৈরী করতে পারি? দাতব্যালয় করে বিশ-ত্রিশলক্ষ টাকা জোগাড় করে দশলক্ষ টাকা দিয়ে একটা হাসপাতাল, আর দশলক্ষ দিয়ে নাচের অনুষ্ঠান করে মদ খাওয়া, বাকী দশলক্ষের অর্ধেক অফিসারদের চুরি করতে দেওয়া এবং বাকীটা দরিদ্রদের দেওয়ার কাজ করতে পারি; কিন্তু এসব কি? একটা ঝড় পাঁচমিনিটে তোমার সব বাড়ী ভেঙে ফেলতে পারে। তাহলে কি করব? আগ্নেয়গিরির একটা বিস্ফোরণে আমাদের সব রাস্তা, হাসপাতাল, শহর, বাড়ী শেষ হয়ে যেতে পারে।

জগতের কল্যাণ করার এসব অবান্তর কথা আমাদের ভুলতে হবে। জগৎ আমার বা তোমাদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছে না; তবু, আমাদের অবিরাম কল্যাণ

কাজ করে যেতে হবে, কারণ, আমাদের পক্ষে তা আশীর্বাদস্বরূপ। একমাত্র এইভাবেই আমরা সার্থক হতে পারি। যে সব ভিক্ষুককে আমরা ভিক্ষা দিয়েছি, তারা কেউ কোনদিন আমাদের কাছে এক কপর্দকও ঋণী নয়; আমরা তাদের কাছে সর্বথা ঋণী, কারণ, তারা আমাদের দানব্রত আচরণের সুযোগ দিয়েছে। আমরা জগতের কল্যাণ করেছি বা করতে পারি, অথবা অমুক লোকদের উপকার করেছি, এ কথা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল। এ চিন্তা মূর্খোচিত, সব মূর্খচিন্তা আমাদের দুঃখ নিয়ে আসে। কাউকে সাহায্য করলে আমরা তার ধন্যবাদের প্রত্যাশা করি, সে ধন্যবাদ না দিলে আমাদের দুঃখ হয়। যা করছি তার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করব কেন? যাকে সাহায্য করছ, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাকে ঈশ্বর মনে কর। মানুষকে সাহায্য করার মাধ্যমে ঈশ্বরপূজা করতে পারা কি একটা বিরাট সুযোগ নয়? যদি সত্যি আমরা বদ্ধ না হতাম, তাহলে এইসব মিথ্যা প্রত্যাশার দুঃখ এড়িয়ে সানন্দে সৎ কাজ করতে পারতাম। মুক্তমনে করা কর্মে কখনো দুঃখ আসে না। জগৎ চিরকাল সুখদুঃখ নিয়ে চলবে।

একজন দরিদ্র লোকের কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল; কোনভাবে সে শুনেছিল, একটি প্রেতাত্মাকে বশ করলে তাকে দিয়ে অর্থ বা পছন্দমত যে কোন বস্তু আনাতে পারে; সুতরাং একটি প্রেতকে বশ করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একজন লোকের সন্ধান করতে লাগল যে তাকে প্রেত এনে দেবে, শেষে এক মহাশক্তিশালী সাধুকে পেয়ে তাঁর সাহায্য চাইল। সাধু জানতে চাইলেন, সে প্রেত দিয়ে কি করবে। সে বলল, "আমি প্রেতকে দিয়ে কাজ করাতে চাই; কি করে বশ করব, বলে দিন প্রভু; আমার প্রবল বাসনা।" কিন্তু সাধু বললেন, "ব্যস্ত হয়ো না, বাড়ী যাও।" পরদিন সে আবার গিয়ে কেঁদে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, "আমায় একটা প্রেত দিন; আমার একটা প্রেত চাই, সাহায্য করুন প্রভু" শেষে সাধু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই মন্ত্র বারবার বললে এক প্রেত আসবে, তাকে যা বলবে, তাই করবে। কিন্তু সাবধান; ওরা ভয়ঙ্কর জীব, সর্বদা ওদের ব্যস্ত রাখতে হয়। কাজ দিতে না পারলে তোমাকে মেরে ফেলবে।" লোকটি বলল, "সে তো সহজ; সারাজীবন ওকে কাজ দিতে পারি।" তারপর সে বনে গিয়ে মন্ত্রটা অনেকক্ষণ আবৃত্তি করার পর এক বিশাল প্রেত সামনে এসে বলল, "আমি প্রেত। আপনার মন্ত্রে আমি বশীভূত হয়েছি; কিন্তু আমাকে সর্বদা কাজ দিতে হবে। কাজ দিতে না পারলেই আপনাকে মেরে ফেলব।" লোকটি বলল, "আমায় একটা প্রাসাদ গড়ে দাও।" প্রেত বলল, "প্রাসাদ হয়ে গেছে।" "আমায় টাকা এনে দাও।" "এই যে টাকা।" "এই জঙ্গল কেটে এখানে শহর বসাও।" "হয়ে গেছে। আর কিছু?" এবার লোকটি ভয় পেয়ে ভাবছে, আর কিছু করার নেই; প্রেত পলকে সবই করে ফেলেছে। প্রেত বলল, "কাজ দিন, না হলে আপনাকে খেয়ে ফেলব।" দরিদ্র লোকটি আর কাজ না পেয়ে ভীত হয়ে পড়ল। কাজেই ছুটতে ছুটতে সাধুর কাছে গিয়ে বল, "প্রভু, আমার জীবন বাঁচান!" সাধু জানতে চাইলেন, কি হয়েছে, সে বলল, "ওকে দেওয়ার মত আর কাজ নেই। যা বলেছি সব ও এক নিমেষে

করে ফেলেছে, এখন বলছে, কাজ না দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে।" ঠিক তখনি প্রেত এসে বলল, "আপনাকে খেয়ে ফেলব," ও লোকটিকে খেয়ে ফেলত। লোকটি কাঁপতে কাঁপতে সাধুর কাছে প্রাণভিক্ষা করল। সাধু বললেন, "আমি একটা উপায় বলে দিচ্ছি। ঐ কোঁকড়া লেজওয়ালা কুকুরটাকে দেখ। দ্রুত তরোয়াল দিয়ে লেজটা কেটে প্রেতকে সোজা করতে দাও।" লোকটি কুকুরের লেজ কেটে প্রেতকে দিয়ে বলল, "আমায় এটা সোজা করে দাও।" প্রেত ওটি নিয়ে ধীরে ধীরে সযত্নে সোজা করল, কিন্তু ছাড়ামাত্র আবার গুটিয়ে গেল। আবার ও সযত্নে সোজা করল, ছাড়ামাত্র আবার সোজা হয়ে গেল। আবার ও ধৈর্য ধরে সোজা করল, ছাড়তেই আবার গুটিয়ে গেল। সুতরাং দিনের পর দিন চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে প্রেত বলল, "জীবনে এমন বিপদে কখনো পড়িনি। আমি প্রবীণ, অভিজ্ঞ প্রেত, এমন বিপদে কখনো পড়িনি। আপনার সঙ্গে একটা আপোস করব, আমাকে ছেড়ে দিন, যা আপনাকে দিয়েছি, সব রাখুন, কথা দিচ্ছি, আপনার ক্ষতি করব না।" লোকটি খুব খুশী হয়ে এ প্রস্তাব গ্রহণ করল।

এই পৃথিবী কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মত, মানুষ শত শত বছর ধরে তা সোজা করার চেষ্টা করছে; ছেড়ে দিলেই আবার গুটিয়ে যায়। তাছাড়া আর কি হবে? আগে জানতে হবে কিভাবে নির্লিপ্ত হয়ে কাজ করতে হয়, তাহলে লোকে ধর্মোন্মাদ হবে না। এই জগৎ কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মত, কখনো সোজা হবে না, এ কথা জানলে আমরা আর উন্মত্ত হব না। জগতে ধর্মোন্মত্ততা না থাকলে অনেক বেশী উন্নতি হত। ধর্মোন্মত্ততা মানবজাতির উন্নতি ঘটাতে পারে, একথা ভাবা ভুল। বরং এতে ঘৃণা ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়ে উন্নতির বাধা ঘটে, লোকে পরস্পর ঝগড়া করে, তাদের সহানুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। আমরা মনে করি, আমাদের কাজ, আমাদের সম্পদই শ্রেষ্ঠ, অন্য সবকিছু মূল্যহীন। কাজেই সর্বদা কখনো ধর্মোন্মত্ততার ভাব এলে কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের কথা মনে করো। জগতের কথা চিন্তা করে ঘুম নষ্ট করার দরকার নেই; তুমি না থাকলেও তার চলবে। ধর্মোন্মত্ততা এড়াতে পারলে ভাল করে কাজ করতে পারবে। যে স্থিতধী, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ ও স্থিরমস্তিষ্ক, যার গভীর সহানুভূতি ও ভালবাসা রয়েছে, সে সৎকাজ করে নিজের কল্যাণ করে। ধর্মোন্মাদ মূর্খ, তার সহানুভূতি নেই; সে কখনো জগৎকে বদলাতে পারে না, নিজেও পবিত্র ও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এবারে আজকের বক্তৃতার মূল বিষয়গুলিকে আবার দেখা যাক: প্রথমতঃ, মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই জগতের কাছে ঋণী, জগৎ আমাদের কাছে ঋণী নয়। জগতের জন্য কিছু করার অবকাশ হওয়া একটা বিরাট সুযোগ। জগৎকে সাহায্য করে আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সাহায্য করি। দ্বিতীয়তঃ, এ জগতে ঈশ্বর আছেন। একথা ঠিক নয় যে, জগতের তোমার-আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর বিশ্বে সর্বদা বর্তমান, তিনি অনন্ত, চিরকর্মী, চিরজাগ্রত। সমগ্র বিশ্ব ঘুমোলেও তিনি অনিদ্র থাকেন; তিনি সর্বদা কাজ করছেন; জগতের সব পরিবর্তন ও রূপ তাঁরই লীলা। তৃতীয়তঃ, কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এ জগৎ চিরকাল ভাল-মন্দে

মেশানো।.. আমাদের কর্তব্য হল, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রবণ হওয়া এবং পাপীকেও ভালবাসা। এই জগৎ এক বিশাল নৈতিক ব্যায়ামাগার, এখানে আত্মিক শক্তির জন্য আমাদের ব্যায়াম করতে হয়। চতুর্থতঃ, কোনরকম উন্মত্ততা থাকা উচিত নয়, উন্মত্ততা প্রেমের বিপরীত। শুনতে এরকম লোকেরা বলে, "আমি পাপীকে ঘৃণা করি না। পাপকে ঘৃণা করি," কিন্তু পাপ আর পাপীর মধ্যে যথার্থ বিভেদ করতে পারে এমন লোককে দেখার জন্য যে কোন জায়গায় যেতে আমি রাজী আছি। ওরকম বলা সহজ। গুণ আর বস্তুর মধ্যে সত্যি বিভেদ করতে পারলে আমরা সম্পূর্ণ মানুষ হতাম। এ কাজ করা সহজ নয়। শেষতঃ, আমরা যত শান্ত হব, তত ভালবাসতে পারব, আমাদের কাজ তত ভাল হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্লিপ্ততার অর্থ সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ

আমাদের প্রতিটি কাজ যেমন আমাদের উপরে প্রতিক্রিয়া করে, তেমন অন্য-লোকের উপরেও ক্রিয়া করে এবং তাদের কাজ আমাদের উপরে ক্রিয়া করে। হয়ত তোমরা সবাই দেখেছ, লোকে মন্দকাজ করলে ক্রমশঃ অসৎ হয়ে যায় এবং যত সৎকাজ করে ততই তাদের শক্তি বাড়ে, তারা সর্বদা সৎকাজ করতে শেখে। আমাদের কাজের পরস্পরের উপরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কোনভাবে কর্মফলের এই তীব্রতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। পদার্থবিজ্ঞানের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, কোন কাজ করার সময়ে আমার মনে একটি বিশেষ স্পন্দন দেখা দেয়; একই স্পন্দনে বাধা সব মনের তখন আমার মনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। যদি একটা ঘরে নানা বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাঁধা থাকে, তাহলে হয়ত লক্ষ করেছ, একটা যন্ত্রে আঘাত করলে অন্যগুলোও স্পন্দিত হয়। সেরকম, এক সুরে বাঁধা সব মন একই চিন্তায় প্রভাবিত হবে। অবশ্য, দূরত্ব এবং অন্যান্য কারণে এই প্রভাবে পার্থক্য দেখা দেবে, তাহলেও মন সর্বদা প্রভাবিত হবেই। হয়ত আমি অন্যায় কাজ করছি, তখন আমার মনে একটা বিশেষ স্পন্দন, ঐ স্পন্দনযুক্ত বিশ্বের সব মনের আমার চিন্তাতরঙ্গে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেরকম, আমি যখন সৎকাজ করছি, তখন আমার মনের আরেক রকম স্পন্দন; একসুরে বাঁধা সব মন তখন আমার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে; মনের উপরে মনের এই প্রভাব স্পন্দনের কমবেশির উপরে নির্ভর করে।

এই উপমাকে আরো প্রসারিত করা যায়, আলোকতরঙ্গ যেমন কোন বস্তুতে পৌঁছবার আগে লক্ষ লক্ষ বছর ভ্রমণ করতে পারে, তেমন চিন্তাতরঙ্গও কোন বস্তুকে অবলম্বন করে তাকে প্রভাবিত করার আগে শত শত বছর ঘুরে বেড়াতে পারে। সুতরাং আমাদের পরিবেশ এরকম ভাল-মন্দ চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ থাকা খুবই সম্ভব। প্রতিটি মস্তিষ্কের প্রতি চিন্তা গ্রহণযোগ্য বস্তু না পাওয়া পর্যন্ত স্পন্দিত হতে থাকে। যে মন এইসব স্পন্দনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, সে তখনি তা গ্রহণ করবে। কাজেই, অসৎ কাজ করার সময়ে মানুষের মন একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছয়, সেই অবস্থার অনুরূপ যে চিন্তাতরঙ্গগুলি পরিবেশে রয়েছে, সেগুলি তার মনে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। সেইজন্য একজন অপরাধী সাধারণতঃ বারবার অপরাধ করে। তার কাজ তীব্র হয়ে ওঠে। সৎব্যক্তির ক্ষেত্রেও এরকমই ঘটে; সে পরিবেশ থেকে সব সৎ চিন্তার তরঙ্গগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তার সৎ কাজও প্রবলতর হয়। সুতরাং, অন্যায় করলে আমাদের দুরকম বিপদ: প্রথমতঃ, আমরা চারদিকের সব অসৎ প্রভাবকে গ্রহণ করবার সুযোগ তৈরী করি; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অসৎ কাজ শত শত বছর পরে হলেও অন্যদের প্রভাবিত করে। অসৎ কাজ করে আমরা নিজেদের এবং অন্যের ক্ষতি করি। সৎ কাজে অন্যের এবং নিজেদের মঙ্গল হয়; মানুষের অন্যান্য শক্তির মত, এই সৎ-অসতের শক্তিও বাইরে থেকে বল সংগ্রহ করে।

কর্মযোগের মতে, কারোর কাজ ফলবান না হওয়া পর্যন্ত নষ্ট হয় না ফলদানের

কাজে প্রকৃতির কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না। অসৎকাজ করলে আমায় কষ্ট পেতে হবে; পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে বাধা দিতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন সৎ কাজ করলে তার শুভফলে কেউ বাধা দিতে পারে না। কারণ থাকলেই কাজ হবে; কোনভাবে তা থামানো যায় না। এবার আসছে কর্মযোগের এক অতিসূক্ষ্ম ও গভীর বিষয়ের আলোচনা—আমাদের সৎ ও অসৎ কর্ম পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা কোন সীমারেখা টেনে বলতে পারি না, এই কাজ সম্পূর্ণ ভাল অথবা এই কাজ সম্পূর্ণ খারাপ। এমন কোন কাজ নেই যা একইসঙ্গে শুভ ও অশুভ ফল দেয় না। সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ নেওয়া যাক: আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, হয়ত কয়েকজন ভাবছ,আমি ভাল কাজ করছি; অথচ একই সঙ্গে আমি হয়ত হাওয়ায় হাজার হাজার জীবাণু হত্যা করছি; অতএব, কারুর ক্ষতি করছি। যখন কাজটা খুব স্পষ্ট হয় এবং আমাদের পরিচিত লোকদের প্রভাবিত করে, তখন কাজটা ভাল হলে আমরা বলি ভাল কাজ। যেমন, আমার বক্তৃতাকে তোমরা ভাল বলতে পার, কিন্তু জীবাণুরা বলবে না; ওদের তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু নিজেদের দেখতে পাচ্ছ। আমায় বক্তৃতার প্রভাব তোমাদের কাছে স্পষ্ট, কিন্তু জীবাণুদের উপরে তার প্রভাব স্পষ্ট নয়। সেরকম, খারাপ কাজগুলিও বিশ্লেষণ করলে দেখব কোথাও হয়ত তার সুফলও ঘটছে। সে সৎ কাজেও অসৎকে দেখে এবং অসতের মধ্যে সৎকে দেখে, সে কর্মরহস্য জানে।

কিন্তু এতে কি বোঝা গেল? বোঝা গেল যে, আমরা যতই চেষ্টা করি, সম্পূর্ণ পবিত্র বা অপবিত্র কোন কাজ নেই, এক্ষেত্রে পবিত্রতা-অপবিত্রতা বলতে লাভ-ক্ষতি বোঝাচ্ছে। অন্যের ক্ষতি না করে আমরা নিশ্বাস নিতে বা বাঁচতে পারি না, আমাদের খাদ্যের প্রতিটি কণা অন্যের মুখের গ্রাস। আমাদের জীবন রয়েছে অন্যের মৃত্যুর বিনিময়ে। সে মৃত্যু মানুষ, জন্তু বা ক্ষুদ্র জীবাণুর হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃ বোঝা যায়, কাজের দ্বারা পূর্ণতায় পৌঁছনো যায় না। চিরকাল কাজ করলেও আমরা এই জটিল গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারব না। তোমরা যত কাজই করো কর্মফলে এই শুভ-অশুভের অনিবার্য মিশ্রণের কোন অন্ত হবে না।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হল, কর্মের পরিণাম কি? আমরা দেখি, প্রত্যেক দেশে বহুলোকের বিশ্বাস, এক সময়ে এই পৃথিবী ত্রুটীহীন হবে, তখন কোন রোগ, মৃত্যু, দুঃখ, অন্যায় থাকবে না। খুব ভাল ধারণা, অজ্ঞদের অনুপ্রাণিত ও উন্নত করার পক্ষে ভারি চমৎকার শক্তি; কিন্তু এক মুহূর্ত চিন্তা করলেই দেখব, তা হতে পারে না। একই বস্তুর দুইদিক হল শুভ ও অশুভ, কাজেই তা কি করে হবে? একই সঙ্গে অশুভ বিহীন শুভ কি করে পাবে? সম্পূর্ণতার অর্থ কি? একটি সম্পূর্ণ জীবন অবাস্তব। জীবন হল, আমাদের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর অবিরাম সংগ্রাম। প্রতি মুহূর্তে আমরা বাহ্যিক প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করছি, পরাজিত হলে মৃত্যু ঘটবে। যেমন, খাদ্য ও বাতাসের জন্য অবিরাম সংগ্রাম। খাদ্য বা বাতাসের অভাব ঘটলে আমাদের মৃত্যু হয়। জীবন সহজ, মসৃণ নয়, মিশ্রবস্তু। অন্তর ও বাইরের এই জটিল সংগ্রামকে জীবন বলে। সুতরাং স্পষ্টতঃ এই সংগ্রাম থামলে জীবনেরও সমাপ্তি।

আদর্শ সুখ বলতে বোঝায় এই সংগ্রামের অবসান। কিন্তু তখন জীবনেরও অবসান ঘটবে, কারণ, জীবন না থামলে সংগ্রাম থামে না। আমরা আগেই দেখেছি, জগতের উপকার করে আমরা নিজেদেরই উপকার করি। অন্যের উপকার করার প্রধান ফল হল নিজেদের পবিত্র করা। অন্যের কল্যাণ করার অবিরাম চেষ্টায় আমরা নিজেদের ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি; এই আত্মবিলোপ হল, জীবনের একটি মহৎ শিক্ষা। মানুষ মূর্খের মত ভাবে, সে সুখী হবে, বহুদিন সংগ্রামের পর অবশেষে বুঝতে পারে, প্রকৃত সুখ রয়েছে নিঃস্বার্থপরতায় এবং সে নিজেই একমাত্র নিজেকে সুখী করতে পারে। প্রতিটি দান, সহানুভূতি, সাহায্য, প্রতিটি সৎ কাজ আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের গৌরব কমিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রতম বলে ভাবায়, তাই এসব হল সৎ কাজ। এখানে দেখি, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় ঘটেছে। মহত্তম আদর্শ হল চিরকালের মত সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, যেখানে "আমি" নেই, আছে শুধু "তুমি"; সচেতনভাবে হোক অথবা অচেতনভাবে হোক, কর্মযোগ মানুষকে এই পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কথা শুনলে কোন ধর্মপ্রচারক হয়ত শিউরে উঠবেন; তিনি হয়ত সগুণ ঈশ্বরের বিষয়ে জোর দিয়ে নিজের সত্তা বজায় রাখতে চাইবেন যে কোন উপায়ে। কিন্তু তাঁর নৈতিক ধারণা যদি যথার্থ ভাল হয়, তাহলে চরম আত্মবিলোপই হবে তার ভিত্তি। এটি হল, সব নীতির মূল; মানুষ, জন্তু বা দেবদূত যেই হোক, সব নৈতিক দর্শনের এটি মূল কথা।

এ জগতে বহুশ্রেণীর মানুষ দেখবে। প্রথম দেবোপম ব্যক্তিরা যাঁদের আত্মবিলোপ সম্পূর্ণ এবং যাঁরা নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও অন্যের মঙ্গল করেন। এঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ। কোন দেশে এরকম একশোজন থাকলে, সে দেশের হতাশ হওয়ার কখনো কারণ থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এঁদের সংখ্যা খুব কম। তারপর আছেন সৎ লোকরা, এঁরা নিজেদের ক্ষতি না করে অন্যের উপকার করেন। তৃতীয় একটি শ্রেণী আছে, যারা স্বার্থসাধন করে, অন্যের ক্ষতিও করে। একজন সংস্কৃত কবি বলেছেন, চতুর্থ একটি অনুল্লেখ্য শ্রেণী আছে, যারা শুধু ক্ষতি করার জন্যই অন্যের ক্ষতি করে। অস্তিত্বের এক প্রান্তে রয়েছেন শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তিরা, তাঁরা অকারণে সৎ কাজ করেন, তেমন, অন্য প্রান্তে আছে এমন লোক, যারা অকারণে ক্ষতি করে। তাতে তাদের কোন লাভ হয় না, কিন্তু ক্ষতি করাই তাদের স্বভাব।

দুটি সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। একটি হল প্রবৃত্তি, অর্থাৎ অভিমুখে যাওয়া এবং অন্যটি হল নিবৃত্তি, অর্থাৎ বিরত হওয়া। "অভিমুখে গমন"-ই হল জগৎ, "আমি এবং আমার"; যা কিছু অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, যশ ঐ "আমিকে" ভূষিত করে, যার প্রকৃতি কেড়ে নেওয়া, একটি কেন্দ্রে সব জড়ো করা, "আমিত্বের" কেন্দ্র, সেটি ঐ জগৎ। এই হল প্রবৃত্তি, প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবণতা; সব জায়গা থেকে জিনিস নিয়ে আপন আমিত্বের কেন্দ্রে জড়ো করা। এই প্রবণতা যখন ভাঙতে শুরু করে, তখন আসে নিবৃত্তি বা "বিরতি", তখন শুরু হয় নীতি ও ধর্ম। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই-ই কর্মের মধ্যে রয়েছে। প্রথমটি অসৎ কাজ এবং দ্বিতীয়টি সৎ কাজ। এই নিবৃত্তি সব নীতি ও ধর্মের ভিত্তি, এর চরমে রয়েছে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, অন্যের জন্য দেহ-

মন সবকিছু উৎসর্গ করার বাসনা। এই অবস্থায় পৌঁছলে মানুষ কর্মযোগের চরমে পৌঁছয়। সৎ কাজের এই হল শ্রেষ্ঠ ফল। যদি কেউ জীবনে দর্শন না পড়ে, কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, জীবনে একবারও প্রার্থনা না করে থাকে, তবু শুধু সৎ কাজের শক্তিতে সে যদি সব কিছু, এমনকি জীবনও অন্যের জন্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে ধার্মিক প্রার্থনা করে এবং দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যে যেখানে পৌঁছেছেন, সেও সেখানে পৌঁছেছে; সুতরাং দেখছ, দার্শনিক, কর্মী আর ভক্ত এক জায়গায় মিলিত হচ্ছে, সে জায়গা হল আত্মবিলোপ। তাদের দর্শন ও ধর্মে যত পার্থক্য থাক, যে অন্যের জন্য আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত, সমগ্র মানবজাতি তার সামনে শ্রদ্ধায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সম্প্রদায় বা মতের প্রশ্ন নেই—যারা সব ধর্মভাবনার বিরোধী, তারাও সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন দেখলে বোঝে যে, একে শ্রদ্ধা করতেই হবে। তোমরা কি দেখনি অতি গোঁড়া খ্রীষ্টানও এড্উইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' পড়লে বুদ্ধের সামনে সশ্রদ্ধ চিত্তে দাঁড়ায়, যে বুদ্ধ কোন ঈশ্বরের কথা বলেন নি, বলেছেন শুধু আত্মত্যাগের কথা? তফাৎ হল, গোঁড়া লোক জানে না যে, যাদের সঙ্গে তার পার্থক্য, তাদের এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য একই। ভক্ত সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা মনে রেখে ও সৎ পরিবেশে থেকে একই জায়গায় শেষে পৌঁছয়, তখন বলে, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে", সে নিজের জন্য কিছুই রাখে না। এই হল আত্মবিলোপ। দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যে দেখে যে, ক্ষুদ্র আমি হল মায়া, সহজে তাকে সে ত্যাগ করে। এই হল আত্মবিলোপ। সুতরাং এখানে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান মিলিত হয়; প্রাচীনকালের সব বড় প্রচারকরা যখন বলেছেন, ঈশ্বর জগৎ নয়, তখন তাঁরা এই-কথা বলতে চেয়েছেন। জগৎ এক জিনিস, ঈশ্বর আরেক বস্তু; এই প্রভেদ অতি:সত্য। তাঁরা জগৎ বলতে বোঝায় স্বার্থপরতাকে। নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর। কেউ সিংহাসনে বসে, সোনার প্রাসাদে থেকেও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হতে পারে; তখন সে ঈশ্বরে বাস করছে। আরেকজন হয়ত কুঁড়েঘরে থাকে, ছেঁড়া কাপড় পরে, সংসারে সে নিঃসম্বল; তবু স্বার্থপর হলে সে সংসারে ঘনিষ্ঠভাবে বদ্ধ।

আমাদের একটা প্রধান বক্তব্য হল, কোন ক্ষতি না করে আমরা ভাল কাজ করতে পারি না অথবা উপকার না করে খারাপ কাজ করতে পারি না। এ কথা জানলে কি করে কাজ করব? তাই জগতে কয়েকটি সম্প্রদায় আশ্চর্যভাবে প্রচার করে যে, জগৎ থেকে মুক্তির উপায় হল ধীরগতিতে আত্মহত্যা, কারণ, বেঁচে থাকলে মানুষকে অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণী বা গাছপালাকে হত্যা করতে হয়, অথবা কারোর ক্ষতি করতে হয়। সুতরাং, তাদের মতে, এ জগৎ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল মৃত্যু। জৈনরা এটিকে তাদের মহত্তম আদর্শ বলে প্রচার করেছে। এই শিক্ষা খুব যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত সমাধান রয়েছে গীতায়। নির্লিপ্ত থাকার তত্ত্ব, কাজ করার সময়ে কোন কিছুতে আবদ্ধ না হওয়া। তুমি জানবে যে, সংসারে থেকেও তুমি সংসারে আবদ্ধ নও, সংসারে যা-ই কর, তা নিজের জন্য করছ না। নিজের জন্য কোন কাজ করলে তার ফল হবে তোমার। সৎ কাজ হলে সুফলকে গ্রহণ করতে হবে, মন্দ কাজ হলে কুফলকে নিতে হবে; কিন্তু নিজের জন্য না করলে, যে কাজই হোক

না কেন, তার কোন ফল তোমার উপরে দেখা দেবে না। আমাদের শাস্ত্রে এ বিষয়ে ভারী সুন্দর একটি কথা রয়েছে: "সে যদি জগৎকে হত্যা করে (বা নিজে হত হয়), তবু সে হন্তা বা হত নয়। যদি সে জানে, সে মোটেই নিজের জন্য কাজ করছে না। তাই কর্মযোগ বলে, "সংসারকে ত্যাগ করো না; সংসারে থাকো, তার প্রভাব যতদূর; পার গ্রহণ করো; কিন্তু যদি আনন্দ পেতে চাও, কোন কাজ করো না।" আনন্দ লক্ষ্য হতে পারে না। প্রথমে আমিত্বকে বধ করো, তারপর সমগ্র জগৎকে নিজের বলে মনে করো; যেমন, বৃদ্ধ খ্রীষ্টানরা বলত, "বৃদ্ধকে মরতে হবে।" এই বৃদ্ধ লোক হল সেই স্বার্থপর চিন্তা যে, সমগ্র জগৎ আমার ভোগের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মূর্খ বাবা-মারা ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা করতে শেখায়, "হে ঈশ্বর, তুমি এই সূর্য-চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করেছ," যেন এই শিশুদের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করা ছাড়া তাঁর আর কাজ নেই। ছেলেমেয়েদের এরকম বাজে কথা শিখিও না। আবার আরেক ধরনের মূর্খ আছে: তারা আমাদের বলে, সব জন্তুর সৃষ্টি হয়েছে মেরে খাবার জন্য, এই বিশ্বের উদ্দেশ্য মানুষকে আনন্দদান। এ সব মূর্খতা। একটা বাঘ বলতে পারে, "মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জন্য," সে প্রার্থনা করবে, "হে প্রভু, এই লোকগুলো এত শয়তান যে খাদ্য হওয়ার জন্য আমার সামনে আসে না; ওরা তোমার নিয়ম ভাঙছে।" জগৎ যদি আমাদের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আমরাও জগতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্ট, এই কুচিন্তা আমাদের অবনতি ঘটায়। এ জগৎ আমাদের জন্য নয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক এখান থেকে চলে যাচ্ছে; জগৎ তা অনুভবও করে না; সেই জায়গায় লক্ষ লক্ষ লোক আসছে। জগৎ আমাদের কাছে যতখানি, আমরাও তার কাছে ততখানি।

অতএব, সঠিকভাবে কাজ করতে হলে তোমাদের আগে কর্মে বদ্ধতার চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, গোলমালে জড়িও না, সাক্ষী হয়ে কাজ করে যাও। আমার গুরু বলতেন, "ধাই-মার মত করে সন্তানদের দেখবে।" ধাই তোমার শিশুকে নিয়ে আদর করবে, খেলা করবে, নিজের সন্তানের মত তার প্রতি ব্যবহার করবে; কিন্তু ধাইকে চলে যেতে বললেই সে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে উদ্যত হবে। সব আকর্ষণ তখন ভুল হয়ে যায়; সাধারণ ধাইয়ের তোমার সন্তানদের ছেড়ে অন্যদের কাছে যেতে কোন কষ্ট হবে না। তোমরাও যা কিছু আপন বলে মনে করো, তার বিষয়ে এই মনোভাব পোষণ করবে। তোমরা ধাই, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তাহলে ভাববে, যা কিছু আপন বলে মনে করো, তা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের। সবচেয়ে বড় দুর্বলতাকে অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবল মনে হয়। আমার উপরে কেউ নির্ভরশীল এবং আমি অন্যের উপকার করতে পারি, এ কথা ভাবা দুর্বলতা। এই বিশ্বাস আমাদের সব বদ্ধতার মূলে, এই বদ্ধতা থেকে আসে দুঃখ। নিজেদের মনকে বলতে হবে, এই বিশ্বে কেউ আমাদের উপরে নির্ভরশীল নয়; একটা ভিক্ষুকও আমাদের দানের উপরে নির্ভর করে না; আমাদের দয়া, সাহায্যের কেউ প্রত্যাশী নয়। সবাইকে প্রকৃতি সাহায্য করবে আমরা কেউ না থাকলেও। প্রকৃতির ধর্ম তোমার আমার জন্য বন্ধ হবে না; আগেই বলেছি, অন্যদের সাহায্য করার মাধ্যমে আত্মশিক্ষার এই সুযোগ

পাওয়ায় আমরা ধন্য। জীবনে এ এক বিরাট শিক্ষা, এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে আমরা কখনো দুঃখ পাব না; সমাজে যে কোন জায়গায় আমরা নির্ভয়ে মিশতে পারি। তোমাদের স্বামী, স্ত্রী, দাস-দাসী এবং রাজত্ব থাকতে পারে; যদি শুধু এই নীতি মেনে চল যে, জগতের পক্ষে তোমরা অনিবার্য নও, তাহলে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এই বছরেই তোমাদের কিছু বন্ধু মারা যেতে পারে। তাদের পুনর্জন্মের জন্য কি জগৎ থেমে থাকবে? তার স্রোত কি থেমে যাবে? না, বয়ে চলবে। সুতরাং এ চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও যে, তোমাদের পৃথিবীর জন্যে কিছু করতে হবে; তোমাদের সাহায্যের তার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ জগৎকে সাহায্য করার জন্য জন্মেছে, এ চিন্তা একেবারে নিরর্থক; এ হল সততার আবরণে গর্ব ও স্বার্থপরতা। যখন তোমরা তোমাদের দেহ ও মনকে বোঝাতে পারবে যে, পৃথিবী কারোর উপরে নির্ভরশীল নয়, তখন কর্মফলের যন্ত্রণা আর পাবে না। কাউকে কিছু দিয়ে প্রত্যাশা যদি না রাখো—এমন কি কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশাও নয়—তাহলে তার অকৃতজ্ঞতা তোমাদের প্রভাবিত করবে না, কারণ, কখনো কিছু আশা কর নি, কখনো ভাব নি, কিছু পাওয়ার অধিকার আছে। তার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিয়েছ; তার কর্ম তাকে ওই বস্তু এনে দিয়েছে; তোমাদের কর্ম তোমাদের তার বাহক করেছে। কিছু দিয়েছ বলে গর্ব হবে কেন? তোমরা বাহকের মত অর্থ বা আর কিছু নিয়ে গেছ এবং জগৎ আপন কর্ম বলে তা লাভ করেছে। তোমাদের গর্বের তাহলে কারণ কোথায়? তোমরা জগৎকে যা দাও তাতে মহত্ত্ব কিছু নেই। নির্লিপ্ততার ভাব এলে আর ভাল-মন্দ থাকবে না। শুধু স্বার্থপরতাই ভাল-মন্দের বিভেদ সৃষ্টি করে। এটা বোঝা খুব কঠিন, কিন্তু যথাসময়ে জানতে পারবে, তোমরা সুযোগ না দিলে জগতের কিছুই তোমাদের প্রভাবিত করতে পারে না। মানুষের অহং-কে কেউ বশ করতে পারে না, যদি না সে নিজে মূর্খের মত স্বনির্ভরতা হারায়। সুতরাং, নির্লিপ্ত থাকলে যে কোন প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পার। তুমি পথ না দেখালে কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারে না, এ কথা বলা খুব সোজা; কিন্তু যে বাহ্যিক প্রভাবে সুখী বা অসুখী নয়, তার যথার্থ লক্ষণ কি? লক্ষণ হল, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তার মনে কোন পরিবর্তন আনে না: সব অবস্থায় সে একরকম থাকে।

ভারতবর্ষে একজন বিরাট সাধু ছিলেন ব্যাস নামে। ইনি বেদান্তসূত্রের লেখক এবং পবিত্রচেতা। এঁর বাবা সাধনায় সফল হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এঁর পিতামহও ব্যর্থ হন। প্রপিতামহও ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইনি নিজেও সম্পূর্ণ সফল হননি, কিন্তু এঁর পুত্র শুক মুক্তপুরুষ হয়ে জন্ম নেন। ব্যাস পুত্রকে শিক্ষা দেন; তারপর তাঁকে রাজা জনকের সভায় পাঠান। জনক খুব বড় রাজা ছিলেন, তাঁকে বলা হত জনক বিদেহ। বিদেহ কথার অর্থ "দেহহীন অবস্থা"। রাজা হয়েও তিনি নিজের দেহকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতেন; তাঁর মনে হত, তিনি সর্বদা আত্মা। তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য বালক শুককে পাঠানো হল। রাজা জানতেন, ব্যাসের পুত্র জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর কাছে আসছেন: সুতরাং উনি আগেই কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বালক যখন দরজায় এল, প্রহরীরা তার দিকে লক্ষ্যই

করল না। তারা শুধু ওকে বসার আসন দিল, সে তিনদিন তিনরাত সেখানে বসে রইল, কেউ তার সঙ্গে কথা বলল না, কেউ জানতে চাইল না সে কে, কোন্ জায়গা থেকে এসেছে। সে এক অতি বিখ্যাত মুনির পুত্র, সারা দেশ তার বাবাকে সম্মান করে, সে নিজেও অতি সম্মানিত ব্যক্তি; তবু প্রাসাদের সামান্য, অভদ্র প্রহরীরা তাকে লক্ষ্যই করল না। তারপর হঠাৎ রাজার মন্ত্রীরা এবং পদস্থ কর্মচারীরা এসে তাকে অতি সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করল। তাকে ভেতরে চমৎকার ঘরে নিয়ে গেল, অত্যন্ত সুগন্ধি স্নানের জল ও অপূর্ব পরিচ্ছদ দিল এবং আট দিন ধরে সব রকম বিলাসিতায় তাকে আপ্যায়ন করল। ব্যবহারের এই পরিবর্তনে শুকের গম্ভীর, শান্ত মুখে এতটুকুও পরিবর্তন হল না; দ্বারে প্রতীক্ষার সময়ে যেমন ছিল এই বিলাসিতাতেও তেমনই রইল। তারপর ওকে রাজার কাছে আনা হল। রাজা সিংহাসনে বসে আছেন, নাচ-গান ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ চলেছে। রাজা ওকে দুধে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দিয়ে বললেন, সাতবার ঐ ঘর ঘুরে আসতে হবে একফোঁটাও দুধ না ফেলে। সে পাত্র নিয়ে সঙ্গীত ও সুদর্শন মুখের আকর্ষণের মাঝে এগিয়ে চলল। রাজার ইচ্ছামত সাতবার ঘুরে এল, একফোঁটা দুধও পড়ল না। সে স্বেচ্ছায় আকৃষ্ট না হলে পৃথিবীর কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সে পাত্র নিয়ে ফিরে এলে রাজা বললেন, "তোমার বাবা তোমায় যা শিখিয়েছেন, তুমি নিজে যা শিখেছ, আমি শুধু তার পুনরাবৃত্তি করতে পারি। তুমি সত্যকে জেনেছ; বাড়ী যাও।"

যে নিজেকে এইভাবে সংযত করেছে, বাইরের কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না; সে কারোর দাস নয়। তার মন মুক্ত। এরকম লোকই শুধু সংসারে ভালভাবে বাঁচতে পারে। আমরা সাধারণতঃ দুরকম মানুষ দেখতে পাই। একদল নিরাশাবাদী, তারা বলে, "এ জগৎ কি ভয়ঙ্কর, কি অসৎ!" আরেকদল আশাবাদী, তারা বলে, "এ জগৎ কি সুন্দর; কত বিচিত্র!" যারা মনকে সংযত করে নি, তাদের কাছে জগৎ হয় অন্যায়ে ভরা, নয় তো বড়জোর ভাল-মন্দে মেশানো। নিজেদের মনের প্রভু হলে এই জগৎই আমাদের কাছে আশাময় হয়ে উঠবে। তখন ভাল-মন্দ বলে কিছু থাকবে না; দেখব সব যথার্থ, সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা পৃথিবীকে নরক বলে, তারা প্রায়ই পরে আত্ম-সংযমে সফল হয়ে পৃথিবীকে স্বর্গ মনে করে। যদি আমরা যথার্থ কর্মযোগী হয়ে এই অবস্থা লাভ করতে চাই, তাহলে যেভাবেই শুরু করি, আত্মত্যাগে নিশ্চয় পরিসমাপ্তি ঘটবে; এই মায়া—আমি চলে গেলে, যে জগৎকে পাপে পূর্ণ মনে হয়েছে, তা আবার আনন্দময় স্বর্গ হয়ে উঠবে। এর পরিবেশ আনন্দে ভরে উঠবে; প্রতি মানবমুখে দেখা দেবেন ঈশ্বর। এই হল কর্মযোগের পরিণাম ও লক্ষ্য এবং বাস্তবজীবনে এই এর চরম অবস্থা।

আমাদের বিভিন্ন যোগগুলি পরস্পরবিরোধী নয়; প্রতিটি আমাদের সম্পূর্ণ করে এক লক্ষ্যে নিয়ে যায়। তবে প্রত্যেকটি পরিশ্রম করে অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাসই মূল রহস্য। প্রথমে শুনতে হবে, তারপর ভাববে, তারপর অভ্যাস করবে। প্রতিটি যোগের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। প্রথমে শুনে নিয়ে বুঝতে হবে; যা বুঝতে পারছ না, বার বার শুনলে এবং ভাবলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সব কিছু একবারে বোঝা কঠিন। শেষ ব্যাখ্যা রয়েছে তোমার মধ্যেই। কেউ প্রকৃতপক্ষে অন্যের কাছে শিখতে পারে না ; নিজেকেই নিজে শিক্ষা দিতে হয়। বাইরের শিক্ষক শুধু পরামর্শ দেয়, তখন অন্তরের শিক্ষক জেগে ওঠে। তখন নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে সব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আপন আত্মায় তা ফুটিয়ে তুলি ; এই চেতনা প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে রূপ নেয়। প্রথমে অনুভূতি, তারপর ইচ্ছাশক্তি, তারপর সেই ইচ্ছা থেকে প্রচণ্ড কর্মশক্তি ছড়িয়ে প্রতিটি শিরা, স্নায়ু ও পেশীতে. শেষে সমগ্র দেহ নিঃস্বার্থপর যোগের উপাদানে পরিবর্তিত হয় এবং যথাসময়ে চরম আত্মত্যাগ ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়। এই প্রাপ্তি কোন মত বা বিশ্বাসের উপরে নির্ভরশীল নয়। খ্রীষ্টান, ইহুদী বা জেণ্টাইল হলে কিছু আসে যায় না। তুমি কি নিঃস্বার্থপর? এটাই মূল কথা। তা যদি হও, তাহলে একটিও ধর্মগ্রন্থ না পড়ে, কোন গীর্জা বা মন্দিরে না গিয়েও পূর্ণতালাভ করবে। আমাদের প্রতিটি যোগ অন্য যোগগুলির সাহায্য না নিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ করতে পারে, কারণ, প্রত্যেকেরই এক লক্ষ্য। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সবই মোক্ষলাভের প্রত্যক্ষ ও স্বাধীন উপায়। "মূর্খরাই বলে কর্ম ও দর্শন পৃথক, জ্ঞানীরা বলে না।" জ্ঞানীরা জানেন যে, বাহ্যতঃ পৃথক হলেও ওরা শেষে মানুষকে এক সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে নিয়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তি

আমরা বলেছি, 'কর্ম' কথার অর্থ 'কাজ' ছাড়াও 'কারণ'-কে বোঝায়। যে কোন কাজ বা চিন্তা, যার ফল আছে, তাই কর্ম। অতএব কর্মের নিয়মের অর্থ হল, কারণের, অনিবার্য কারণও ফলের নিয়ম। কারণ থাকলেই ফল থাকবে ; এই নিয়মে বাধা দেওয়া যায় না, আমাদের দর্শনের মতে কর্মের এই নিয়ম সারা বিশ্বে প্রচলিত। যা কিছু দেখি, অনুভব করি বা কাজ করি, বিশ্বের যেখানে যত কাজ, সবকিছুই একদিকে অতীত কাজের ফল, অন্যদিকে কারণ হয়ে ফল উৎপন্ন করে। এইসঙ্গে "নিয়ম" কথাটিরও অর্থ বোঝা দরকার। নিয়ম বলতে বোঝায়, একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রবণতা। আমরা একটির পর আরেকটি বা একই সঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটতে দেখলে এই কার্যপরম্পরা বা যুগপৎ কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে আশা করি। আমাদের ন্যায়মতের প্রাচীন নৈয়ায়িক ও দার্শনিকরা এই নিয়মকে বলেন 'ব্যাপ্তি'। তাঁদের মতে, আমাদের নিয়ম-সংক্রান্ত সব ধারণা আসে ভাবানুষঙ্গ (association of thought) থেকে। পর পর কয়েকটি ঘটনা আমাদের মনে বাঁধা ছকে যুক্ত হয়ে যায়, সুতরাং একটা ঘটনার ধারণা হলে অন্যগুলোও মনে পড়ে। আমাদের মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী, মনে বা 'চিত্তে' কোন চিন্তা অথবা তরঙ্গ উঠলে অনুরূপ বহু তরঙ্গ ওঠে। এই হল ভাবানুষঙ্গের মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণা, এই বিশাল নিয়মের একটি দিক হল কারণ। ভাবানুষঙ্গের এই বিস্তারকেই সংস্কৃতে বলে 'ব্যাপ্তি'। বাহ্যজগতের নিয়ম অন্তর্জগতের মতই—একটা বিশেষ ঘটনার পর আর একটা ঘটনা ঘটবার এবং পুনরাবৃত্তির প্রত্যাশা। অতএব, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিতে নিয়ম নেই। বস্তুতঃ, পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে বা প্রকৃতিতে বস্তুগত কোন নিয়ম রয়েছে, একথা বলা ভুল। নিয়ম হল পদ্ধতি, যার সাহায্যে আমাদের মন ঘটনা-পরম্পরাকে বুঝতে পারে ; সব মনেই রয়েছে। কয়েকটি ঘটনা-পরম্পরা এবং তার পুনরাবৃত্তি-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের মন এতে সমগ্র পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে—একেই বলে নিয়ম।

পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হল, সার্বজনীন নিয়ম বলতে কি বোঝায়। সংস্কৃত মনোবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন দেশ-কাল-নিমিত্ত, আমাদের বিশ্ব তারই অংশবিশেষ। এই বিশ্ব অনন্ত অস্তিত্বের একটি বিশেষ অংশ, স্থান, কাল ও কারণের দ্বারা গঠিত। স্বভাবতঃ বোঝা যায়, এই সব কিছুর দ্বারা সীমিত বিশ্বেই নিয়ম থাকা সম্ভব ; তার বাইরে কোন নিয়ম থাকতে পারে না। যখন বিশ্বের কথা বলি তখন আমাদের মনের দ্বারা সীমিত ঐ অস্তিত্বের অংশের কথা বলতে চাই—ইন্দ্রিয়ের জগৎ, যাকে দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি, শুনতে পাই, চিন্তা করি, কল্পনা করি। এইটুকুই নিয়মের অধীন ; কিন্তু তার বাইরে নিয়মের রাজত্ব নেই, যেহেতু, কারণ আমাদের মনের জগতের বাইরে নেই। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে কোন কিছু কারণের নিগড়ে আবদ্ধ নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পারে মানসিক ভাবানুষঙ্গ নেই,

ভাবানুষঙ্গ না থাকলে কাজের হেতুও নেই। "সত্তা" বা অস্তিত্ব নাম-রূপে আবদ্ধ হলে কারণের নিয়ম মেনে চলে, নিয়মের অধীন হয়; কারণ, হেতুতে সব নিয়মের উৎপত্তি। সুতরাং আমরা দেখছি, স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না; কথাটাই অবাস্তব, কারণ, ইচ্ছা হল যাকে আমরা জানি, জ্ঞাত সব কিছুই রয়েছে এই বিশ্বে এবং বিশ্বের সব কিছু স্থান, কাল ও হেতুতে আবদ্ধ। আমরা যা জানি বা জানতে পারি, সব হেতুর অধীন, কাজেই তা স্বাধীন হতে পারে না। অন্য বস্তুর প্রভাবে তা নিজে আবার হেতু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যা আগে ইচ্ছা ছিল না, পরে মানুষের ইচ্ছায় পরিবর্তিত হয়েছে স্থান, কাল ও পাত্রের সীমায় পড়ে, তা মুক্ত; এই স্থান, কাল ও হেতুর বন্ধনমুক্ত হলে তা আবার স্বাধীন হবে। মুক্তিতে তার জন্ম, বন্ধনে ধরা দেয়, বন্ধন ছিঁড়ে আবার মুক্তিতে ফিরে যায়।

প্রশ্ন ছিল, কোন্‌খান থেকে এই বিশ্ব এসেছে, কোথায় রয়েছে এবং কোথায় যাবে; তার উত্তর হল, বিশ্ব এসেছে মুক্তি থেকে, রয়েছে বন্ধনে, ফিরে যাবে আবার মুক্তিতে। সুতরাং যখন বলি, মানুষ হল সেই অনন্তের প্রকাশ, তখন বলতে চাই যে, এর অতিক্ষুদ্র একটি অংশ হল মানুষ; এই যে দেহ এবং মন দেখছি, তা সমগ্রের একটি অংশমাত্র, অসীমের একটি বিন্দু; আমাদের সব নিয়ম, বন্ধন, আনন্দ-বেদনা, সুখ, প্রত্যাশা—সব এই ক্ষুদ্র বিশ্বে, আমাদের সব উন্নতি-অবনতি এই ছোট্ট পরিধিতে। কাজেই দেখছ, এই বিশ্বে আমাদের মনের চিরস্থায়িত্ব আশা করা কত ছেলেমানুষি এবং স্বর্গে যাওয়ার আশা আসলে এই পরিচিত জগতেরই পুনরাবৃত্তি। দেখতে পাচ্ছ, আমাদের পরিচিত, সীমিত অস্তিত্বের সঙ্গে সমগ্র অনন্তের সামঞ্জস্য ঘটানোর ইচ্ছা কত অসম্ভব ও শিশুসুলভ। যখন কেউ বলে, এখন সে যা পাচ্ছে, তাকে বারবার পাবে, অথবা আমার ভাষায়, সে যখন "সুবিধাজনক" ধর্ম চায়, তখন জেনো, তার এত অবনতি ঘটেছে যে, সে যেরকম রয়েছে তার চেয়ে মহত্তর কিছু ভাবতে পারে না; সে শুধু তার ছোট্ট জগতের ফল, তার বেশী নয়। সে নিজের অনন্ত প্রকৃতির কথা ভুলে গেছে, তার সমস্ত চিন্তা মুহূর্তের আনন্দ, দুঃখ, ঈর্ষায় সীমাবদ্ধ। সে এই সীমাকেই অসীম বলে মনে করছে; শুধু তাই নয়, নিজের মূর্খতাকে সে ত্যাগও করবে না। সে প্রাণপণে আঁকড়ে আছে তৃষ্ণাকে, মৃত্যুর পরবর্তী পিপাসাকে, যাকে বৌদ্ধরা বলে তন্‌হা ও তিসৃসা। আমাদের পরিচিত, ক্ষুদ্র বিশ্বের বাইরে লক্ষ লক্ষ রকমের সুখ, নিয়ম, উন্নতি, কারণ, প্রাণী থাকতে পারে; সবকিছু আমাদের অনন্ত প্রকৃতির একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

মুক্তি পেতে হলে এই বিশ্বের সীমাকে পেরিয়ে যেতে হবে; এখানে মুক্তি পাওয়া যাবে না। চরম সাম্য বা খ্রীষ্টানরা যাকে বলে সব বুদ্ধির অতীত শান্তি, তা এই বিশ্বে, স্বর্গে, বা যেখানে আমাদের চিন্তা যেতে পারে, ইন্দ্রিয় অনুভব করতে পারে, যাকে কল্পনা গ্রহণ করতে পারে সেরকম কোথাও পাওয়া যায় না। এরকম কোন জায়গা মুক্তি দিতে পারে না, কারণ, এ সবই আমাদের জগতের মধ্যে, স্থান, কাল ও হেতুতে আবদ্ধ। আমাদের এই পৃথিবীর চেয়ে আরো উন্নত লোক থাকতে পারে, যেখানে হয়ত আনন্দ আরো সূক্ষ্ম, কিন্তু তাও এই বিশ্বের মধ্যে, অতএব নিয়মের অধীন;

সুতরাং এই ছোট জগৎ যেখানে শেষ সেখানে প্রকৃত ধর্মের শুরু। এইসব ছোট সুখ-দুঃখ-জ্ঞানের সেখানে সমাপ্তি এবং সত্যের সূচনা। জীবনের তৃষ্ণা, এই নশ্বর সীমিত অস্তিত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণ না ত্যাগ করলে ঐ অসীম মুক্তির একঝলকও দেখার আশা করতে পারি না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যে মুক্তি মানুষের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা, তা লাভ করার একটিই পথ, তা হল, এই ছোট জীবন, ক্ষুদ্র জগৎ, এই পৃথিবী, স্বর্গ, দেহ, মন, সীমাবদ্ধ সব কিছুকে ত্যাগ করা। এই ইন্দ্রিয়ময় বা মনোময় ক্ষুদ্র জগৎকে যদি ত্যাগ করি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাব। বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল, নিয়মের, হেতুর বাইরে যাওয়া।

কিন্তু এই জগতের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; অল্প লোকে তা পারে। আমাদের শাস্ত্রে এর দুটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। একটা হল "নেতি, নেতি" (এটা নয়, এটা নয়), অন্যটি হল "ইতি" (এই); প্রথমটি "না-বাচক" (Negative), দ্বিতীয়টি "হ্যাঁ-বাচক" (Positive)। প্রথমটি অত্যন্ত কঠিন। অতি উঁচুস্তরের, অসাধারণ মনের ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এ পথে আসা সম্ভব, যে বলবে, "না, এ আমার চাই না," তার দেহ-মন সে ইচ্ছা পালন করবে এবং সে সাফল্য অর্জন করবে। কিন্তু এরকম লোক অত্যন্ত বিরল। অধিকাংশ মানুষ বেছে নেয় দ্বিতীয় পথ, সংসারের পথ, তারা বন্ধন দিয়ে বন্ধনকে ভাঙে। এও একধরনের ত্যাগ; তবে এ ত্যাগ হয় ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বস্তুকে জেনে, ভোগ করে, অভিজ্ঞ হওয়া, তার স্বরূপ জানা, যতক্ষণ না মন সব ছেড়ে নির্লিপ্ত হয়। নির্লিপ্ত হওয়ার প্রথম পথ হল, যুক্তিভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি কর্ম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক। প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, তার বৈশিষ্ট্য হল, কোন কাজ করতে না চাওয়া; দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, যেখানে রয়েছে বিরামহীন কর্ম। জগতে প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। যারা নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত, যাদের বাসনা আত্ম-কেন্দ্রিক, যাদের মন নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, যাদের কাছে স্বার্থই প্রধান, তারা শুধু কাজ করে না। বাকী সকলকে কাজ করতে হয়। স্রোত আপন ধর্মে গর্তে পড়ে ঘূর্ণি তৈরী করে, কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আবার অব্যাহত গতিতে বয়ে যায়। প্রতিটি মানবজীবন ঐ স্রোতের মত। ঘূর্ণিতে পড়ে স্থান-কাল-হেতুর এই জগতে আবদ্ধ হয়, কিছুক্ষণ ঘুরপাক খায় আর চেঁচায়, "আমার বাবা, আমার ভাই, আমার খ্যাতি," ইত্যাদি, শেষে বেরিয়ে এসে মুক্তি পায়। সারা জগৎ এই কাজ করছে। আমরা জানি বা না জানি, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে জগতের ভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। এই জগতে মানুষের অভিজ্ঞতা মানুষকে ঘূর্ণি থেকে মুক্ত করে।

কর্মযোগ কাকে বলে? কর্মরহস্যের জ্ঞান। আমরা দেখছি, সারা বিশ্ব কাজ করছে। কেন? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য; অণু থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী সবাই দেহ, মন ও আত্মার মুক্তির জন্য কাজ করছে। সবাই স্বাধীনতা পাওয়ার, বন্ধনমুক্তির চেষ্টা করছে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ সব বন্ধন থেকে পালাবার চেষ্টা করছে। প্রকৃতির কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি প্রকৃতপক্ষে আমাদের জগতের প্রতীক। এই বিশ্বে পথ হাতড়ে দীর্ঘ সময়ে ঠেকে ঠেকে জানার বদলে আমরা কর্মযোগ থেকে কর্মরহস্য,

কর্মপদ্ধতি এবং কর্মের গঠনশক্তির কথা জানতে পারি। ব্যবহার করতে না জানলে এক বিশাল শক্তি বৃথা নষ্ট হতে পারে। কর্মযোগ কর্মকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে; এই জগতের সব কাজকে সবচেয়ে ভাল ভাবে প্রয়োগের উপায় এতে শিখতে পারবে। কর্ম অনিবার্য, এটা হতেই হবে; কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে মহত্তম উদ্দেশ্য নিয়ে। কর্মযোগ আমাদের শেখায় যে, এ জগতের আয়ু পাঁচ মিনিট, একে পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে; মুক্তি এখানে নেই, এর পরপারে। পৃথিবীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে এগোতে হবে। যে সব অসাধারণ মানুষের কথা বলেছি, সেরকম লোক থাকতে পারে, সাপ যেমন খোলস ছেড়ে তাকে দেখে, তারা সেরকম জগৎকে ত্যাগ করে দ্রষ্টা হয়। এদের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্য সকলকে এই কর্মের জগতে ধীরে এগোতে হবে। সবচেয়ে ভাল ভাবে সে কাজ করার পদ্ধতি ও রহস্য কর্মযোগ দেখিয়ে দেয়।

কর্মযোগ কি বলে? "অবিরাম কাজ কর, কিন্তু কর্মে সব আসক্তি ত্যাগ কর।" কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িও না। মনকে মুক্ত রাখো। যা কিছু দেখছ, এই দুঃখ-কষ্ট পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থা; দারিদ্র্য, সুখ-সম্পদ অস্থায়ী; তারা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমাদের প্রকৃতি সুখ-দুঃখ, সব ইন্দ্রিয়, কল্পনার পরপারে; অথচ আমাদের সর্বদা কাজ করতে হবে। "দুঃখ আসে আসক্তি থেকে, কর্ম থেকে নয়।" যখনই আমরা কর্মে নিজেদের আবদ্ধ করি, তখনই দুঃখ পাই; কিন্তু আবদ্ধ না হলে সে দুঃখ আসে না। অন্য লোকের একটা সুন্দর ছবি পুড়ে গেলে সাধারণতঃ দুঃখ হয় না; কিন্তু নিজের ছবি পুড়ে গেলে কি কষ্ট হয়! কেন? দুটোই সুন্দর ছবি, হয়ত কোন মূল ছবির নকল; কিন্তু একটির চেয়ে অন্যটির ক্ষেত্রে অনেক বেশী দুঃখ হল। কারণ, একটির বেলায় সে ছবির প্রতি আসক্ত অন্যটির বেলায় নয়। এই "আমি এবং আমার" সব দুঃখের মূল। অধিকারবোধ থেকে আসে স্বার্থপরতা, তার থেকে আসে দুঃখ। প্রতিটি স্বার্থপর কাজ বা চিন্তা আমাদের কোন না কোন বস্তুতে আবদ্ধ করে, তার ফলে আমরা দাস হয়ে পড়ি। চিত্তের যে তরঙ্গ বলে "আমি আমার" তার প্রতিটি আমাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দাস করে; যত বলি "আমি, আমার", তত দাসত্ব বাড়ে, দুঃখ বাড়ে। তাই কর্মযোগ আমাদের বলে পৃথিবীর সব ছবির সৌন্দর্য উপভোগ করতে, কিন্তু আসক্ত যেন না হই। কখনো বলো না "আমার"। "আমার" বললেই দুঃখ আসে। এমনকি মনে মনে বলো না "আমার সন্তান"। সন্তানের জনক হও, কিন্তু "আমার" বলো না। বললে দুঃখ পাবে। "আমার বাড়ী", "আমার দেহ" বলো না। আসল বিপদ ওখানেই। দেহ তোমার নয়, আমার নয়, কারোর নয়। এই দেহগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু আমরা মুক্ত, দ্রষ্টা। এ দেহ একটা ছবি বা দেয়ালের চেয়ে বেশী মুক্ত নয়। কোন দেহে এত আবদ্ধ হব কেন? কেউ ছবি আঁকল, ফুরিয়ে গেল। ঐ স্বার্থপরতা বাহু বাড়িয়ে বলো না, "এটা আমার চাই।" তাহলে দুঃখের সূচনা।

সুতরাং কর্মযোগ বলে, আগে এই স্বার্থপর প্রবণতাকে ধ্বংস করো, সেই সংযমের ক্ষমতা এলে মনকে আর স্বার্থপর হতে দিয়ো না। তখন জগতে বেরিয়ে যত পার

কাজ করো। সকলের সঙ্গে মেশো, যেখানে খুশী যাও; কখনো অসৎ প্রভাবে পড়বে না। জলে পদ্মপাতা রয়েছে; জল তাতে লেগে থাকতে পারে না; সেইভাবে জগতে থাকবে। একে বলে "বৈরাগ্য", অনাসক্তি বা নির্লিপ্ততা। বোধ হয় তোমাদের বলেছি যে, নির্লিপ্ততাবিহীন কোন যোগ হয় না। নির্লিপ্ততা সব যোগের ভিত্তি। যে গৃহত্যাগ করেছে, ভালো পোশাক পরে না, ভাল খাবার খায় না, মরুভূমিতে রয়েছে, সে খুব আসক্ত হতে পারে। তার একমাত্র সম্পদ দেহ তার সর্বস্ব হতে পারে; বেঁচে থেকে সে শুধু দেহের জন্য সংগ্রাম করবে। নিস্পৃহত শুধু বাহ্যিক দেহের ক্ষেত্রে নয়, মনের ক্ষেত্রেও, "আমি ও আমার"—এর যোগসূত্র রয়েছে মনে। যদি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এই সূত্র না থাকে, তাহলে যেখানেই থাকি, যাই হই, আমরা নির্লিপ্ত। সিংহাসনে বসেও লোক সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হতে পারে; আরেকজন ছেঁড়া কাপড় পরেও খুব আসক্ত হতে পারে। প্রথমে এই নির্লিপ্ততা লাভ করে তারপর অবিরাম কাজ করতে হবে। এই নির্লিপ্ততা লাভ করা খুব কঠিন হলেও কর্মযোগ এর উপায় জানিয়ে আমাদের সাহায্য কর।

সব আসক্তি ত্যাগ করার দুটো পথ রয়েছে। একটা হল, যারা ঈশ্বর বা কোন বাহ্যিক সাহায্যে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য। তাদের জন্য রয়েছে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি; তাদের কাজ করতে হবে শুধু আপন ইচ্ছা, মনের শক্তি ও দৃঢ়তা দিয়ে, বলতে হবে, "আমাকে নিরাসক্ত হতে হবে।" যারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাদের অন্য পথ, অপেক্ষাকৃত কম কঠিন। তারা ঈশ্বরকে সব কর্মফল অর্পণ করে; কাজ করে, কিন্তু ফলে আবদ্ধ হয় না। তারা যা কিছু দেখে, অনুভব করে, শোনে বা করে সব ঈশ্বরের জন্য। যত সৎ কাজই করি, তার জন্য যেন কোন প্রশংসা বা সুবিধা দাবি না করি। সে কাজ ঈশ্বরের; ফল তাঁকে দাও। আমরা যেন মনে করি, আমরা প্রভুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, প্রতিটি কর্মপ্রেরণা তাঁর দান। যা কিছু পূজা কর, চিন্তা কর, কাজ কর সব তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা যেন সম্পূর্ণ শান্তিতে থাকি, দেহ-মন সব কিছু চিরন্তন উপহার হিসেবে প্রভুকে দিয়ে। আগুনে আহুতি না দিয়ে এই এক আহুতি দিবারাত্র দাও—তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের অর্ঘ্য। "এই বিশ্বে সম্পদ খুঁজতে গিয়ে একমাত্র সম্পদ পেয়েছি তোমাকে; তোমার কাছে নিজেকে দিলাম।" দিনরাত এই কথা বল, বল "আমার কিছু নেই; সে ভাল-মন্দ যাই হোক; আমি তা নিয়ে ভাবি না; সব তোমায় দিলাম।" ত্যাগের অভ্যাস যতদিন না হয়, যতদিন না ত্যাগ রক্তে, স্নায়ুতে, মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না দেহ প্রতি মুহূর্তে এই আত্মত্যাগের বশীভূত হয়, ততদিন দিনরাত্র আমিত্ব ত্যাগ কর। তারপর যুদ্ধ ক্ষেত্রে কামানের গর্জন, যুদ্ধের কোলাহলে গিয়ে দেখবে শান্তিতে রয়েছ।

কর্মযোগ আমাদের শিক্ষা দেয়, কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হল নিম্নস্তরের; তবু সকলকে কর্তব্য করতে হবে। অথচ আমরা দেখি, এই অদ্ভুত কর্তব্যবোধ দুঃখের প্রধান কারণ। কর্তব্য আমাদের রোগের মত হয়ে ওঠে; শুধু সামনে টেনে নিয়ে যায়। আমাদের বশ করে সমস্ত জীবনকে অসহ্য করে তোলে। এই হল মানব-

জীবনের অভিশাপ, এই কর্তব্য, কর্তব্যের ধারণা মধ্যাহ্নের সূর্যের মত মানুষের অন্তরতম আত্মাকে দগ্ধ করে। ঐ কর্তব্যের অসহায় দাসদের দেখো! কর্তব্য তাদের প্রার্থনা করার, এমনকি স্নান করারও সময় দেয় না। সর্বদা তারা কর্তব্য করছে। ওরা বাইরে গিয়ে কাজ করে। তখনো কর্তব্য! বাড়ীতে ফিরে পরদিনের কাজের কথা ভাবে। কর্তব্য করছে! এ হল দাসের জীবন, শেষে রাস্তায় পড়ে ঘোড়ার মত খাটতে খাটতে মরে। লোকে কর্তব্য বলতে একেই বোঝে। প্রকৃত কর্তব্য হল, নিরাসক্ত হয়ে কাজ করা, ঈশ্বরকে সব সমর্পণ করা। আমাদের সব কর্তব্য ঈশ্বরের। এখানে এসেছি বলে আমরা ধন্য। আমরা সময় কাটাচ্ছি; কিন্তু খারাপ না ভালভাবে কে জানে? ভাল করলে ফল পাব না। খারাপ করলেও কিছু পাব না। শান্তিতে থাক, মুক্ত মনে কাজ কর। এরকম মুক্তি লাভ করা ভারি কঠিন। দাসত্বকে—দেহের জন্য দেহের আসক্তিকে কর্তব্য বলে ব্যাখ্যা করা কত সহজ! লোকে অর্থ বা যে কোন বস্তুতে আসক্ত হলে তার জন্য লড়াই করে। প্রশ্ন কর, কেন করছে। ওরা বলবে, "কর্তব্য"। আসলে এ হল, খাদ্য-অর্থের জন্য নিরর্থক লোভ, ভালো কথায় তারা সেটা ঢাকার চেষ্টা করে।

কর্তব্য আসলে কি? এ হল দেহের, আসক্তির প্রকাশ; এক জায়গায় আবদ্ধ হলে আমরা তাকে বলি কর্তব্য। যেমন, যে দেশে বিবাহ নেই, সেখানে স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য নেই; বিবাহ হলে স্বামী-স্ত্রী আসক্তি হেতু একত্র বাস করে; এবং এই একত্র বাস যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত; এরকমভাবে প্রচলিত হলে তা কর্তব্যে পরিণত হয়। অতএব, এ এক ধরনের পুরনো রোগ। তীব্র হলে আমরা তাকে রোগ বলি; পুরনো হয়ে গেলে বলি প্রকৃতি। এটা একটা রোগ। সুতরাং আসক্তি পুরনো হলে আমরা তাকে কর্তব্যের গাল ভরা নাম দিয়ে জাতে তুলি। তাতে ফুল ছড়াই, তার জন্য বাজনা বাজাই, পবিত্র মন্ত্র পড়ি, তারপর এই কর্তব্যের খাতিরে সমস্ত পৃথিবী মারামারি করে, একে অন্যকে ঠকায়। যতক্ষণ কর্তব্য পশুত্বকে বাধা দেয়, ততক্ষণই ভাল। একেবারে নিম্নশ্রেণীর মানুষ, যাদের কোন আদর্শ নেই, তাদের কাছে এর কিছুটা মূল্য আছে; কিন্তু যারা কর্মযোগী হতে চায়, তাদের এ ধারণা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। তোমার-আমার কোন কর্তব্য নেই। জগৎকে যা দেওয়ার আছে দাও, কিন্তু কর্তব্য হিসেবে নয়। ও চিন্তা ভুলে যাও। বাধ্য হয়ে কাজ ক'রো না। কেন বাধ্য হবে? বাধ্য হয়ে কিছু করলেই তাতে আসক্তি আসে। কর্তব্য থাকবে কেন? সব ঈশ্বরকে দাও। এই যে প্রচণ্ড কর্তব্যের অগ্নিময় চুল্লী, তার মধ্যে ঐ অমৃতের পাত্র থেকে অমৃত পান করে সুখী হও। আমরা সবাই তাঁর ইচ্ছা পালন করছি, পুরস্কার বা শাস্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। পুরস্কার চাইলে শাস্তিও পেতে হবে; শাস্তি এড়াবার একমাত্র পথ হল পুরস্কারকে ত্যাগ করা। দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল, সুখের চিন্তা ত্যাগ করা; কারণ, এ দুটি পরস্পর জড়িত। একদিকে সুখ, অন্যদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন, অন্যদিকে মৃত্যু। মৃত্যুর পারে যেতে হলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে। জীবন ও মৃত্যু একই, ভিন্ন দিক থেকে দেখা হয়। সুতরাং দুঃখ বিনা সুখ কিংবা মৃত্যুহীন জীবন

স্কুলের ছেলে-মেয়ে ও শিশুদের পক্ষে খুব ভাল, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, এ শুধু সংজ্ঞার পার্থক্য, তখন দুটিকেই ত্যাগ করেন। কোন কাজের জন্য প্রশংসা, পুরস্কার কিছু চেয়ো না। সৎ কাজ করলেই আমরা তার জন্য প্রশংসা চাই। কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানে অর্থ দিলেই সংবাদপত্রে নিজেদের নাম দেখতে চাই। এরকম বাসনা থাকলে দুঃখ আসবেই। জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা অখ্যাত অবস্থায় চলে গেছেন। যে সব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জগৎ জানে না, বুদ্ধ-খ্রীষ্ট তাঁদের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষ। এরকম শত শত অজ্ঞাত বীর প্রত্যেক দেশে নীরবে কাজ করেছেন। তাঁরা নিঃশব্দে কাজ করেন, নিঃশব্দে চলে যান; যথাসময়ে তাঁদের ভাবধারা বুদ্ধ-খ্রীষ্টদের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন বুদ্ধ-খ্রীষ্ট আমাদের পরিচিত হন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানের জন্য খ্যাতি চান না। তাঁরা জগৎকে তাঁদের ভাবধারা দিয়ে যান; নিজেদের জন্য কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন না। এরকম চিন্তায় তাঁদের সমস্ত প্রকৃতি কুঁকড়ে যায়। এঁরা যথার্থ সাত্ত্বিক, কখনো বিচলিত হন না, শুধু প্রেমে বিগলিত হন। আমি এরকম একজন যোগীকে দেখেছি, তিনি ভারতবর্ষে এক গুহায় থাকেন। এরকম অপূর্ব মানুষ কখনো দেখিনি। তাঁর আত্মচেতনা এমনভাবে লোপ পেয়েছে যে, বলা যায়, তাঁর মনুষ্যরূপ আর নেই, রয়েছে শুধু সর্বব্যাপী ঈশ্বরত্ব। কোন জন্তু তাঁর এক হাতে কামড়ালে তিনি আরেক হাত বাড়িয়ে দেন, বলেন, এ ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর সবই প্রভুর দান। তিনি আত্ম-প্রচার করেন না, অথচ তিনি প্রেম, সত্য ও মাধুর্যের সমষ্টি।

এরপর হল অধিকতর রজস্-যুক্ত ব্যক্তিরা, যারা প্রকৃতিতে কর্মতৎপর, সাহসী, এরা মহত্ত্বের ধারণা পৃথিবীতে প্রচার করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা নীরবে সত্য ও মহান চিন্তা সংগ্রহ করেন, আর অন্যরা—বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টরা—সেই ভাব প্রচার করে ঘুরে বেড়ান। গৌতম বুদ্ধের জীবনে দেখি, তিনি অনবরত বলতেন, তিনি পঞ্চবিংশতিতম বুদ্ধ। তাঁর আগের চব্বিশজন ইতিহাসে অপরিচিত, কিন্তু ইতিহাসে পরিচিত বুদ্ধ নিশ্চয় তাঁদের নির্মিত ভিত্তির উপরেই কাজ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শান্ত, নিস্তব্ধ, অজ্ঞাত। তাঁরা চিন্তার শক্তিকে জানেন; তাঁরা নিশ্চিত জানেন, কোন গুহায় গিয়ে দ্বার বন্ধ করে মাত্র পাঁচটি বিষয়ে ভেবে যদি দেহত্যাগ করেন, তবু তাঁদের এই পাঁচটি ভাবনা চিরকাল বেঁচে থাকবে। সত্যিই এরকম চিন্তা পাহাড় ভেদ করে, সমুদ্র পেরিয়ে সারা জগতে ভ্রমণ করে। সেই ভাবনা মানব-হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নরনারীকে অনুপ্রাণিত করলে তারা মানবজীবনের কাজে তাকে প্রকাশ করে। এই সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা ঈশ্বরের এত কাছে যে, এঁদের পক্ষে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য তৎপর হওয়া, সংগ্রাম করা, প্রচার ও কল্যাণ করা সম্ভব হয় না। তৎপর কর্মীরা যত মহৎ হোক তাদের মধ্যে একটু অজ্ঞতা থেকে যায়। প্রকৃতিতে কিছু অপবিত্রতা থাকলে তবে আমরা কাজ করতে পারি। কর্মের প্রকৃতি হল, উদ্দেশ্য ও আসক্তির দ্বারা চালিত হওয়া। এক চিরজাগ্রত কৃপা, সামান্য চড়াই পাখির পতনও যার চোখ এড়ায় না, তার সামনে মানুষ কি করে নিজের কাজে গুরুত্ব দেবে? আমরা যখন জানি, জগতের তুচ্ছতম বস্তুটিরও তিনি যত্ন করেন, তখন কি এরকম আচরণ নিন্দনীয় নয়? আমরা শুধু তাঁর সামনে শ্রদ্ধা

ও বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে বলব, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কাজ করতে পারেন না, কারণ, কাজে তাঁদের আসক্তি নেই। যাঁদের সমস্ত আত্মা ব্রহ্মে আবদ্ধ, সব বাসনা ব্রহ্মে সীমিত, আমিত্বের সঙ্গে চিরবন্ধনে জড়িত, তাঁদের কর্ম থাকে না। এঁরা যথার্থই শ্রেষ্ঠ মানুষ; কিন্তু এরা ব্যতীত সকলকে কাজ করতে হয়। কাজ করতে গিয়ে আমরা যেন না ভাবি, জগতের আমরা এতটুকুও উপকার করছি। তা আমরা পারি না। এই জগতের ব্যায়ামাগারে আমরা শুধু নিজেদেরই উপকার করছি। এই হল প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী। এভাবে যদি কাজ করি, যদি সর্বদা মনে রাখি যে, এভাবে কাজ করবার সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাহলে কোন কিছুতে আসক্ত হব না। আমাদের মত অসংখ্য লোক ভাবছে, আমরা জগতের মহৎ লোক; কিন্তু আমরা সকলে মারা যাব এবং পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের কাল অনন্ত। "এই সর্বশক্তিমান এক যদি না ইচ্ছা করতেন, তাহলে কে একমুহূর্ত বাঁচত, একমুহূর্তও নিশ্বাস নিত?" তিনি সদাজাগ্রত ঈশ্বর। সব শক্তি তাঁর অধীন। তাঁর আদেশে বায়ু বয়, সূর্য তাপ দেয়, পৃথিবী বেঁচে থাকে এবং মৃত্যু পৃথিবীতে বিচরণ করে। তিনি সর্বেসর্বা; তিনি সব এবং তিনি সকলের মধ্যে আছেন। আমরা শুধু তাঁকে পূজা করতে পারি। সব কর্মফল ত্যাগ করো; মঙ্গলের জন্যই মঙ্গলকর্ম করো; তাহলে শুধু সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হবে। এইভাবে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করে আমরা পূর্ণমুক্তি লাভ করব। এই মুক্তিই কর্মযোগের লক্ষ্য।

সপ্তম অধ্যায়

কর্মযোগের আদর্শ

বেদান্তধর্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তা হল, বিভিন্ন পথ দিয়ে আমরা এক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি; এই পথগুলিকে আমি চারভাগে ভাগ করেছি: কর্ম, প্রেম, মনোবিজ্ঞান ও ও জ্ঞানের পথ। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, এই ভাগগুলি খুব স্পষ্ট নয় এবং কোনটি সম্পূর্ণ অনন্য-নির্ভর নয়। একটি অন্যটিতে মিশে গেছে। তবে, যেটির প্রাধান্য, সেই অনুযায়ী ভাগগুলির নামকরণ। এমন লোক পাবে না, যার কাজ করা ছাড়া অন্য ক্ষমতা নেই, বা যে শুধু ভক্ত অথবা যারা শুধু জ্ঞানী। একটি মানুষের মধ্যে যে প্রবণতা দেখা যায়, সেই অনুযায়ী ভাগগুলি করা হয়েছে। আমরা দেখেছি, শেষে চারটি পথ মিশে এক হয়ে যায়। সব ধর্ম, সব কাজ এবং পূজাপদ্ধতি এক লক্ষ্যে নিয়ে যায়।

সেই লক্ষ্যটি আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমি যেটুকু বুঝেছি, এই লক্ষ্য হল স্বাধীনতা। চারদিকে যা কিছু দেখি সবই মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে, পরমাণু থেকে মানুষ, জড়পদার্থের টুকরো থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবাত্মা পর্যন্ত। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্ব এই মুক্তিসংগ্রামের ফল। প্রতিটি বস্তুর প্রত্যেক কণা নিজের পথে যেতে চাইছে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে; কিন্তু অন্যরা তাকে আটকে রেখেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্যের কাছ থেকে এবং চাঁদ পৃথিবীর কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেরা অনন্ত বিচ্ছেদের প্রবণতা। যা কিছু বিশ্বে দেখি, সকলেরই মূলে এই মুক্তির সংগ্রাম; এই প্রবণতার বলে সাধু প্রার্থনা করে আর ডাকাত ডাকাতি করে। যখন কর্মপদ্ধতি ঠিক হয় না, তখন বলি অসৎ; যখন প্রকাশ যথার্থ ও মহৎ হয়, তখন বলি সৎ। কিন্তু একই প্রবণতা, মুক্তির জন্য চেষ্টা। সন্ন্যাসী নিজের বন্ধদশার কথা জেনে পীড়িত হয়ে নিষ্কৃতি পেতে চান; তাই ঈশ্বরের আরাধনা করেন। চোর কয়েকটি বস্তুর অভাবে পীড়িত হয়ে চেষ্টা করে ওগুলো লাভ করে পীড়া থেকে মুক্তি পাবার; তাই চুরি করে। প্রকৃতির এক লক্ষ্য মুক্তি; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেকে সেই দিকে চলেছে। সন্ন্যাসী যে মুক্তি চান তা চোরের মুক্তির তুলনায় অনেক পৃথক; সন্ন্যাসীর কাঙ্ক্ষিত মুক্তি তাঁকে অসীম, অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়, আর চোর যা চেয়েছে, তা তার আত্মাকে নতুন বন্ধনে বাঁধে।

সব ধর্মে এই চেষ্টার প্রকাশ দেখা যায়। সব নীতি, পরার্থপরতার ভিত্তি এই চেষ্টা, এর অর্থ, মানুষ যে দেহ, এই ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা। যখন দেখি কেউ সৎ কাজ করছে, অন্যকে সাহায্য করছে, তখন বুঝি, সে "আমি, আমার" সীমায় থাকতে পারছে না। এই স্বার্থপরতার সীমা ছাড়ানোর কোন শেষ নেই। সব মহৎ নীতিশাস্ত্র বলেছে, পরার্থপরতাই লক্ষ্য। ধরা যাক, এই চরম পরার্থপরতায় কেউ পৌঁছল, তাহলে তার কি হবে? তখন আর সে ক্ষুদ্র মানুষ নয়; সে পেয়েছে অসীম ব্যাপ্তি। তার আগেকার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত; সে

হয়েছে অনন্ত, এই অনন্ত বিস্তারকে পাওয়াইসব ধর্মনীতি ও দর্শনশিক্ষার লক্ষ্য। ব্যক্তি-বাদী এই কথার দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনলে ভয় পায়। আবার, সে যদি নীতি প্রচার করে তাহলে নিজে একই কথা বলে। মানুষের পরার্থপরতায় সে সীমা টানতে পারে না। ধর কেউ ব্যক্তিবাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরার্থপর হয়ে উঠল, তাহলে অন্য মতবাদের সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্গে তার প্রভেদ বুঝব কি করে? সে বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছে এবং এইটিই সকলের লক্ষ্য; শুধু দুর্বল ব্যক্তিবাদী নিজের যুক্তিকে সাহস করে সঠিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে না। কর্মযোগ হল, সমস্ত মানুষের লক্ষ্য যে মুক্তি, নিঃস্বার্থপরতার দ্বারা তাকে পাওয়া। তাই, প্রতিটি স্বার্থপর কাজ আমাদের লক্ষ্যের পথ অবরুদ্ধ করে, প্রত্যেক নিঃস্বার্থপর কাজ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়; তাই নীতির একমাত্র সংজ্ঞা হল: স্বার্থপরতাই দুর্নীতি, যা পরার্থপর তা নৈতিকতা।

কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ব্যাপারটা এত সোজা মনে হবে না। যেমন, আগে বলেছি, পরিবেশের জন্য প্রায়ই খুঁটিনাটি তফাৎ হয়। এক পরিস্থিতিতে যে কাজ পরার্থপর, অন্য পরিস্থিতিতে সেই কাজ রীতিমত স্বার্থপর। কাজেই, আমরা শুধু সাধারণ সংজ্ঞা দিয়ে খুঁটিনাটি দিকগুলো কাল, স্থান ও পরিবেশের পার্থক্যের উপরে ছেড়ে যেতে পারি। একদেশে একরকম আচরণ নীতিমূলক, অন্যদেশে তাই দুর্নীতি, কারণ, পরিবেশের তফাৎ। সব প্রকৃতির লক্ষ্য হল মুক্তি, একমাত্র পরার্থপরতায় মুক্তি পাওয়া যায়; প্রতি নিঃস্বার্থপর চিন্তা, কথা বা কাজ আমাদের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় বলে সৎকাজ। তোমরা দেখবে, সব ধর্মে, সব নীতিশাস্ত্রে এই সংজ্ঞা রয়েছে। কয়েকটি মতবাদে নীতির জন্ম মহত্তর সত্তা—ঈশ্বর থেকে। যদি কাউকে বল, এটা উচিত, ওটা অনুচিত, তাহলে জবাব পাবে: "এই হল ঈশ্বরের আদেশ।" কিন্তু উৎস যাই হোক, সেই নীতিশাস্ত্রেরও মূল ভাবনা এক—নিজের কথা ভেবো না, আত্মত্যাগ করো। এই মহৎ নীতিচিন্তা সত্ত্বেও অনেকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করতে হবে ভেবে ভয় পায়। এরকম লোককে সম্পূর্ণ পরার্থপর লোকের কথা ভাবতে বলতে পারি, যে নিজের কথা ভাবে না, নিজের জন্য কাজ করে না, কথা বলে, অথচ জানে কোথায় তার "আত্মত্ব"। এই "আত্মা" ততক্ষণ তার পরিচিত, যতক্ষণ সে নিজের কথা ভাবে, নিজের জন্য কাজ করে বা কথা বলে। সে অন্যদের সম্বন্ধে, বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতন হলে কোথায় তার "নিজত্ব"? তা চিরদিনের মত চলে গেছে।

তাই পরার্থপরতা ও সৎকাজের মাধ্যমে মুক্তিলাভের নীতি ও ধর্মপদ্ধতি হল কর্ম-যোগ। কর্মযোগীর আর কোন মতে বিশ্বাস করার দরকার নেই। এমন কি সে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করতে পারে, নিজের আত্মা কি বা কোন আধ্যাত্মিক প্রশ্ন না জানতে চাইতে পারে। তার বিশেষ লক্ষ্য আত্মহীনতায় পৌছনো; এ কাজ তাকে নিজে করতে হবে। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সাধনা, কারণ, কোন মত বা তত্ত্বের সাহায্য না নিয়ে তাকে শুধু কর্ম দিয়ে পৌছতে হবে, যে কাজ জ্ঞানী করেন জ্ঞান ও প্রেরণা দিয়ে এবং ভক্ত করেন প্রেম দিয়ে।

এবার পরবর্তী প্রশ্ন: এই কর্ম কাকে বলে? জগতের কল্যাণ বলতে কি বোঝায়? আমরা কি জগতের মঙ্গল করতে পারি? চরম অর্থে, পারি না; আপেক্ষিক অর্থে,

পারি। জগতের কোন স্থায়ী মঙ্গল করা যায় না ; তা করা গেলে জগৎ আর এরকম থাকত না। আমরা একজনের ক্ষুধা পাঁচ মিনিটের জন্য শান্ত করতে পারি, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত হবে। মানুষকে আমরা যে আনন্দ দিই তা ক্ষণিকের। এই চিরকালের আনন্দ বেদনার তাড়নাকে কেউ স্থায়ীভাবে আরোগ্য করতে পারে না। জগৎকে কি স্থায়ী সুখ দেওয়া যায়? সমুদ্রে ঢেউ তুললে অন্যত্র জলে ভাঁটা পড়বেই। মানুষের প্রয়োজন ও লোভের অনুপাতে জগতে ভাল জিনিসের পরিমাণ একই আছে। তা বাড়েও না, কমেও না। আজকে আমরা মানবজাতির যে ইতিহাস জানি, তা দেখো। আমরা কি এক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অবস্থার তারতম্য দেখতে পাই না? কিছু লোক ধনী, মর্যাদাবান, স্বাস্থ্যবান, আর কিছু লোক কি দরিদ্র, নীচ, স্বাস্থ্যহীন নয়? আজ মার্কিনীদের যে অবস্থা, প্রাচীন যুগে মিশরীয়, গ্রীক ও রোমানদের ঠিক সেই অবস্থা ছিল। ইতিহাসে যতদূর জানা যায়, চিরকাল এই রকমই হয়েছে ; তবু আমরা জানি, সুখ-দুঃখের এই অনিবার্য প্রভেদের সঙ্গে তা দূর করার চেষ্টাও চলেছে। ইতিহাসের প্রতি যুগে হাজার হাজার নরনারী জন্মেছে যারা অন্যদের জীবন স্বচ্ছন্দ করার জন্য কাজ করেছে। তারা কতদূর সফল হয়েছে? আমরা শুধু এক জায়গার জিনিস অন্যত্র নিয়ে যেতে পারি। দৈহিক কষ্টকে আমরা দেহ থেকে দূর করে মনে নিয়ে যেতে পারি। এ সেই দান্তের নরকের বর্ণনার মত যেখানে কৃপণরা একতাল সোনা পাহাড়ের উপরে গড়িয়ে তোলে, একটু উঠলেই ওটা পড়ে যায়। আমাদের সব কথা বালকদের গল্পের মত চমৎকার, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান নয়। সব জাতি স্বর্গের স্বপ্ন দেখে, ভাবে ওরাই তার সেরা ফলটুকু পাবে। সত্যি কি চমৎকার নিঃস্বার্থপর ধারণা!

আমরা জগতের সুখ বাড়াতে পারি না ; দুঃখও বাড়াতে পারি না। এখানে সুখ-দুঃখের শক্তি সমষ্টি বরাবরই এক। আমরা শুধু এদিক থেকে ওদিকে বা ওদিক থেকে এদিকে সরাতে পারি মাত্র। কিন্তু পরিমাণ একই থাকবে, কারণ, এক থাকা তার ধর্ম। জগৎ প্রকৃতিতে এই :জোয়ার-ভাঁটা, ওঠা-পড়া রয়েছে ; আমাদের জীবনমৃত্যু-বিহীন বলার মত এ বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করাও যুক্তিহীন। সম্পূর্ণ অবাস্তব, কারণ, জীবনের মূল ধারণাটিই মৃত্যুভিত্তিক, আনন্দের মধ্যেই রয়েছে দুঃখ। আলো অবিরাম পুড়ে যাচ্ছে, এটি তার জীবন। জীবন চাইলে তার জন্য প্রতিমুহূর্তে মরতে হবে। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একই বস্তুর ভিন্ন প্রকাশ হল জীবন ও মৃত্যু ; একই তরঙ্গের ওঠা-পড়া, দুটি মিলে সম্পূর্ণ। কেউ "পতনের" দিক থেকে দেখে নিরাশাবাদী হয়, কেউ "উত্থান" দেখে আশাবাদী হয়। যখন একটি বালক স্কুলে যায়, বাবা-মা তাকে যত্ন করে, তখন তার মনে হয় সবই সুখময় ; তার সামান্য প্রয়োজন, সে অত্যন্ত আশাবাদী। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর সে শান্ত হয়, তখন তার উত্তেজনা কমে যায়। সুতরাং মুমূর্ষু বৃদ্ধ জাতিগুলি নতুন জাতির চেয়ে কম আশাবাদী হয়। ভারতে একটা প্রবাদ আছে: "এক হাজার বছর শহরে, এক হাজার বছর বনে!" এই শহর থেকে বনে ও বন থেকে শহরে পরিবর্তন সর্বত্র চলছে, লোকে যেভাবে দেখে সেই অনুযায়ী আশাবাদী বা নিরাশাবাদী হয়।

এর পর হল, সাম্যের কথা। এই সাম্যের ধারণা কাজে প্রবল উৎসাহ জোগায়। অনেক ধর্ম এই কথা প্রচার করে—যে, ঈশ্বর পৃথিবীকে শাসন করতে আসছেন, তখন আর কোন অবস্থায় কোন ভেদ থাকবে না। যারা এসব কথা প্রচার করে, তারা উন্মাদ, এরা সবচেয়ে আন্তরিক। এই উন্মত্ততার মোহের ভিত্তিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, তাই গ্রীক ও রোমান ক্রীতদাসদের কাছে এ ধর্ম অত আকর্ষণীয় হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করত, সাম্যের রাজত্বে আর দাসত্ব থাকবে না, প্রচুর খাদ্য-পানীয় পাওয়া যাবে; সুতরাং ওরা খ্রীষ্টীয় পতাকার চারদিকে সমবেত হল। প্রথম প্রচার করা অবশ্য অজ্ঞ উন্মাদ হলেও খুব আন্তরিক ছিল। আধুনিক যুগে এই আকাঙ্ক্ষা সাম্যের রূপ নিয়েছে—স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র। এও উন্মত্ততা। যথার্থ সাম্য পৃথিবীতে কখনো হয় নি, হতে পারে না। সবাই কি করে সমান হব? এই অসম্ভব সাম্যের অর্থ মৃত্যু। জগৎ এই জগৎরূপ কি ক'রে পেল? সাম্য হারিয়ে। আদিম অবস্থায় সম্পূর্ণ সাম্য ছিল। তাহলে বিশ্বের সব সৃজনীশক্তি কি করে এল? সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ থেকে। ধর, সব বস্তুর কণায় সমতা এসেছে, তাহলে কি সৃষ্টি থাকবে? বিজ্ঞানের সাহায্যে জানি, তা অসম্ভব। জলের একটা স্তরে আঘাত কর, দেখবে জলের প্রতিটি কণা শান্ত হবার চেষ্টায় একে অন্যকে ধাক্কা দিচ্ছে; সেরকম, যাকে আমরা জগৎ বলি, সেই জগতের সব বস্তু সম্পূর্ণ সাম্যে ফেরার চেষ্টা করছে। আবার আঘাত আসছে, আবার সংঘর্ষ এবং সৃষ্টি। অসাম্য সৃষ্টির মূল। আবার সাম্য লাভের জন্য সচেষ্ট শক্তিগুলিও সৃষ্টির অঙ্গ।

সম্পূর্ণ সাম্য, অর্থাৎ সব স্তরে সংঘর্ষমান শক্তিগুলির পূর্ণ সামঞ্জস্য এ জগতে ঘটতে পারে না। সে অবস্থা আসার আগে জগৎ সব রকম প্রাণের পক্ষে একেবারে অযোগ্য হয়ে যাবে, কেউ থাকবে না। তাই দেখি, এই সম্পূর্ণ সাম্যের ধারণা অসম্ভব তো বটেই, আমরা যদি তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চিত ধ্বংস হব। মানুষে মানুষে তফাৎ কোথায়? আসল তফাৎ মস্তিষ্কে। এখনকার দিনে পাগল ছাড়া কেউ বলবে না, সকলে একইরকম বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে। আমরা অসম ক্ষমতা নিয়ে জগতে আসি, কেউ বড়, কেউ ছোট, এই প্রাক্-নির্ধারিত অবস্থা বদলাবার কোন উপায় নেই। এ দেশে হাজার হাজার বছর মার্কিনী ইণ্ডিয়ানরা ছিল, তোমাদের অল্প কয়েকজন পূর্বপুরুষ এখানে এসেছিলেন। তাঁরা দেশের চেহারা কত বদলে দিয়েছেন! সবাই যদি সমান হত, তাহলে ইণ্ডিয়ানরা উন্নতি করল না, শহর গড়ল না কেন? তোমাদের পূর্বপুরুষরা অন্যরকম বুদ্ধি নিয়ে এলেন, অন্যরকম অতীত সংস্কারের সমষ্টি এল, তারা নিজেদের প্রকাশ করল। সম্পূর্ণ প্রভেদ বিলোপের অর্থ মৃত্যু। যতদিন এই জগৎ আছে, ততদিন পার্থক্য থাকবে, থাকতেই হবে, সম্পূর্ণ সাম্য আসবে সৃষ্টির একটি চক্র শেষ হলে তার আগে সমতা আসতে পারে না। অথচ এই সাম্যের ধারণা এক বিরাট অনুপ্রেরণাশক্তি। ঠিক যেমন সৃষ্টির জন্য অসাম্যের প্রয়োজন, তেমন তাকে সংযত করার চেষ্টারও প্রয়োজন। মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা যদি না থাকত, তাহলে সৃষ্টিই থাকত না। যে দুটি শক্তি

মানুষের কর্মপ্রকৃতি নির্ধারণ করে, এ হল তাদের মধ্যে প্রভেদ। সর্বদা এই শক্তি কাজ করে, কোনটা বন্ধনের দিকে, কোনটা মুক্তির দিকে।

এই জগতের চক্রের মধ্যে চক্র এক ভয়ঙ্কর বস্তু ; তাতে হাত দিয়ে ধরা পড়লেই মৃত্যু। আমরা সবাই ভাবি, কোন কর্তব্য সমাধা হলে আমরা বিশ্রাম করব ; কিন্তু কর্তব্যের অংশটুকু শেষ করারও আগে আরেকটা কর্তব্য তৈরী হয়ে যায়। এই প্রবল, জটিল জগৎচক্র আমাদের আকর্ষণ করছে। মাত্র দুটি মুক্তির পথ আছে ; একটা হল, ঐ চক্র সম্বন্ধে সব চিন্তা ত্যাগ করা, সে চলুক, আমরা সরে দাঁড়াই, সব বাসনা ত্যাগ করি। এ কথা বলা ভারী সহজ, কিন্তু করা প্রায় অসম্ভব। দু কোটি লোকের মধ্যে একজনও পারে কি না, জানি না। অন্য পথ হল, জগতে ঝাঁপ দিয়ে কর্মরহস্য শেখা, এইটি কর্মযোগের পথ। জগৎযন্ত্রের চাকাকে এড়িয়ে পালিও না, তার ভিতরে প্রবেশ করে কর্মরহস্য শেখো। সঠিক কাজ করলে বাইরে বেরোনো সম্ভব। যন্ত্রের ভিতরেই সেই বাইরে যাবার পথ।

এখন দেখলাম, কর্ম কাকে বলে। কর্ম হল প্রকৃতির ভিত্তির অঙ্গ, সদাপ্রবহমান। যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী তারা এটা ভালভাবে বুঝতে পারে, কারণ তারা জানে, ঈশ্বর এত অক্ষম নন যে, আমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী হবেন। জগৎ চিরকাল সচল থাকলেও আমাদের লক্ষ্য হল মুক্তি, পরার্থপরতা ; কর্মযোগের মতে, কর্মের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌছতে হবে। জগৎকে সম্পূর্ণ সুখী করার চিন্তা উন্মাদের কাজের মত ; তবে আমাদের জানতে হবে, উন্মাদনা ভাল-মন্দ দুরকম ফলই দেয়। কর্মযোগী প্রশ্ন করেন, সহজাত মুক্তি প্রেম ছাড়া তোমার কাজের অন্য কোন প্রেরণার কেন দরকার হবে। সাধারণ জাগতিক উদ্দেশ্যের পারে চলে যাও। "কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।" কর্মযোগী বলেন, মানুষ জ্ঞানলাভ ও তার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারে। যখন কল্যাণেচ্ছা তার অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে ওঠে তখন সে আর কোন উদ্দেশ্য খোঁজে না। কল্যাণ করা ভাল বলেই কর ; যে স্বর্গের জন্য সৎ কাজ করে, সেও বদ্ধ হয়, কর্মযোগীর মতে। এতটুকু স্বার্থ নিয়ে যে কাজ করা হয়, তা আমাদের মুক্ত করার বদলে পায়ে আরো একটি শৃঙ্খল আরোপ করে।

সুতরাং কর্মফল ত্যাগ করার একমাত্র উপায় হল, কর্মে বদ্ধ না হওয়া। জানবে, এ জগৎ আমরা নয়, আমরাও জগৎ নই ; আমরা দেহ নাই ; আমরা প্রকৃতপক্ষে কাজ করি না। আমরা আত্মা, চিরশান্ত, চিরস্তব্ধ। আমরা কোন বস্তুর দ্বারা বদ্ধ হব কেন ? সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকার কথা বলতে খুব ভাল, কিন্তু তার উপায় কি ? বিনাস্বার্থে কৃত প্রতিটি কাজ নতুন শৃঙ্খল সৃষ্টির পরিবর্তে বর্তমান শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থিকে ভেঙে দেয়। বিনা প্রত্যাশায় আমরা জগৎকে যে চিন্তা দিই, তা সব সঞ্চিত হয়ে শৃঙ্খলের গ্রন্থি মোচন করে, আমরা পবিত্রতম না হওয়া পর্যন্ত আমাদের উন্নত করে। অথচ, হয়ত মনে হবে, এসব কথা বড় বেশী উদ্ভট, দার্শনিকসুলভ, অবাস্তব তত্ত্ব। ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা পড়েছি, অনেকে বলেছেন, স্বার্থবিহীন কাজ হয় না। তাঁরা ধর্মোন্মত্ততা ছাড়া নিঃস্বার্থ কাজ দেখেননি বলে ঐ কথা বলেছেন।

শেষে তোমাদের একজন মানুষের কথা বলি, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষাকে যথার্থ বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তিনি বুদ্ধ। একমাত্র তিনি এ কাজে সফল হয়েছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের আর সব মহাপুরুষ বাহ্যিক উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্যবিহীন কর্মে পৌঁছেছিলেন। এই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব মহাপুরুষকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল বলেন, তাঁরা ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীতে এসেছেন; অন্যদল বলেন, তাঁরা ঈশ্বরের দূত। দুদলই বাহ্যিক অনুপ্রেরণায় কাজ করেন, কাজের পুরস্কার প্রত্যাশা করেন, সে তাঁরা যতই আধ্যাত্মিক ভাষায় কথা বলুন। কিন্তু বুদ্ধ একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের বিভিন্ন তত্ত্ব জানতে চাই না। আত্মার বিষয়ে সূক্ষ্ম মতের আলোচনায় কি লাভ? সৎকাজ কর, সৎ হও। এতে তোমরা মুক্তি ও সত্যলাভ করবে।" তিনি জীবনের আচরণেও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর ছিলেন; আর, তাঁর চেয়ে বেশী কাজ কে করেছে? ইতিহাসে একটি চরিত্র দেখাও যে সকলকে ছাড়িয়ে এত উঁচুতে উঠেছে। এই মহৎ দার্শনিক মহত্তম দর্শন প্রচার করেও নিম্নতম প্রাণীটির প্রতি গভীরসহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কখনো নিজের জন্য কিছু কামনা করেন নি। ইনি আদর্শ কর্মযোগী, সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে কাজ করেছেন, মানবতার ইতিহাসে তিনি চিরকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ; হৃদয় ও বুদ্ধির অতুলনীয় সমন্বয়, আত্মার শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তিনি পৃথিবীর প্রথম মহৎ সংস্কারক, তিনিই প্রথম বলতে পেরেছিলেন, "কিছু পুরনো পুঁথি দেখলেই বিশ্বাস করো না, তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলে, ছোট থেকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে বলেই মেনে নিও না; যুক্তি দিয়ে বিচার করে যদি দেখো সকলের মঙ্গল হবে, তাহলে বিশ্বাস করো, তার জন্য প্রাণপণ করো এবং অন্যদেরও করতে বলো।" যে বিনা স্বার্থে অর্থ, খ্যাতি বা অন্য কিছুর অপেক্ষা না করে কাজ করে সে-ই শ্রেষ্ঠ কর্মী; এ কাজ পারলে মানুষ বুদ্ধ হবে এবং তার থেকে কর্মশক্তি এমনভাবে বেরিয়ে আসবে যে জগৎ বদলে যাবে। এই ব্যক্তি হল কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

POEMS

AN INTERESTING CORRESPONDENCE

Now Sister Mary,
You need not be sorry
For the hard raps I gave you,
You know full well,
Though you like me tell,
With my whole heart I love you.

The babies I bet,
The best friends I met,
Will stand by me in weal and woe.
And so will I do,
You know it too.

Life, name, or fame, even heaven forgo
For the sweet sisters four
Sans reproche et sans peur,
The truest, noblest, steadfast, best.

The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze,
The desert air resounds the calls
Of heart-struck lion's rage.

The cloud puts forth its deluge strength
When lightning cleaves its breast,
When the soul is stirred to its inmost depth
Great ones unfold their best.

Let eyes grow dim and heart grow faint,
And friendship fail and love betray,
Let Fate its hundred horrors send,
And clotted darkness block the way.

All nature wear one angry frown,
To crush you out—still know, my soul,
You are Divine. March on and on,
Nor right nor left but to the goal.

Nor angel I, nor man, nor brute,
Nor body, mind, nor he or she,
The books do stop in wonder mute
To tell my nature ; I am He.

Before the sun, the moon, the earth,
Before the stars or comets free,
Before e'en time has had its birth,
I was, I am, and I will be.

The beauteous earth, the glorious sun,
The calm sweet moon, the spangled sky,
Causation's laws do make them run ;
They live in bonds, in bonds they die.

And mind its mantle dreamy net
Cast o'er them all and holds them fast.
In warp and woof of thought are set,
Earth, hells, and heavens, or worst or best.

Know these are but the outer crust—
All space and time, all effect, cause.
I am beyond all sense, all thoughts,
The witness of the universe.

Not two or many, 'tis but one,
And thus in me all me's I have ;
I cannot hate, I cannot shun
Myself from me, I can but love.

From dreams awake, from bonds be free,
Be not afraid. This mystery,
My shadow, cannot frighten me,
Know once for all that I am He.

Well, so far my poetry. Hope you are all right. Give my love to mother and Father Pope. I am busy unto death and have almost no time to write even a line. So excuse me if later on I am rather late in writing.

Yours eternally
VIVEKANANDA

Miss M. B. H. sent Swami the following lines in reply :

The monk he would a poet be
And wooed the muse right earnestly ;
In thought and word he could well beat her,
What bothered him though was the metre.

His feet were all too short too long,
The form not suited to his song ;
He tried the sonnet, lyric, epic,
And worked so hard, he waxed dyspeptic.

While the poetic mania lasted
He e'en from vegetables fasted,
Which Leon had with tender care
Prepared for Swami's dainty fare.

One day he sat and mused alone—
Sudden a light around him shone,
The "still small voice" his thoughts inspire
And his words glow like coals of fire

And coals of fire they proved to be
Heaped on the head of countrite me—
My scolding letter I deplore
And beg forgiveness o'er and o'er.

The lines you sent to your sisters four
Be sure they'll cherish evermore
For you have made them clearly see
The one main truth that "all is He".

Then Swami :

In days of your,
On Ganga's shore preaching,
A hoary priest was teaching
How Gods they come
As Sita Ram,
And gentle Sita pining, weeping.
The sermons end,
They homeward wend their way—
The hearers musing, thinking.

When from the crowd
A voice aloud
This question asked beseeching, seeking—
"Sir tell me, pray,
Who were but they
These Sita Ram you were teaching, speaking !"

So Mary Hale,
Allow me tell,
You mar my doctrines wronging, baulking.
I never taught
Such queer thought
That all was God –unmeaning talking !

But this I say,
Remember pray,
That God is *true*, all else is *nothing*,
This world's a dream
Though true it seem
And only truth is *He* the living !
The real *me* is none but *He*,
And never, never *matter* changing !
With undying love and gratitude to you all . . .

VIVEKANANDA

And then Miss M. B. H :

The difference I clearly see
'Twixt tweedledum and tweedledee—
That is a proposition sane,
But truly 'tis beyond my vein
To make your Eastern logic plain.

If "God is truth, all else is naught,"
This "world a dream", delusion up wrought,
What can exist which God is not ?

All those who "many" see have much to fear,
He only lives to whom the "One" is clear,
So again I say
In my poor way,
I cannot see but that all's He,
If I'm in Him and He in me.

Then the Swami replied

Of temper quick, a girl unique,
A freak of nature she,
A lady fair, no question there,
Rare soul is Miss Mary.
Her feelings deep she cannot keep,
But creep they out at last,
A spirit free, I can foresee,
Must be of fiery cast.

Tho' many a lay her muse can bray,
Any play piano too,
Her heart so cool, chills as a rule
The fool who comes to woo.
Though, Sister Mary, I hear they say
The sway your beauty gains,
Be cautious now and do not bow,
However sweet, to chains.

For 'twill be soon, another tune
The moon-struck mate will hear
If his will but clash, your words will hash
And smash his life I fear.
These lines to thee, Sister Mary,
Free will I offer, take
"Tit for tat"—a monkey chat,
For monk alone can make.

THOU BLESSED DREAM

If things go ill or well—
If joy redounding shows her face,
Or seas of sorrow swell—
'Tis but where each has part,
Each one to weep or laugh as may ;
Each one his robe to don ;
Its scenes, alternative shine and rain.
Thou dream, O blessed dream !
Spread near and far thy veil of haze,
Tone down the lines so sharp,
Make smooth what roughness seems .
No magic but in thee !
Thy touch makes deserts bloom to life,
Harsh thunder blessed song,
Fell death the sweet release .

LIGHT

I look behind and after
And find that all is right,
In my deepest sorrows
There is a soul of light .

THE LIVING GOD*

He who is in you and outside you,
Who works through all hands,
Who walks on all feet,
Whose body are all ye,
Him worship, and break all other idols !

He who is at once the high and low,
The sinner and the saint,
Both God and worm,
Him worship—visible, knowable, real, omnipresent,
Break all other idols !

*Written from Almora 9th July 1897.

In whom is neither past life
Nor future birth nor death,
In whom we always have been
And always shall be one,
Him worship. Break all other idols !

Ye fools ! who neglect the living God,
And His infinite reflections with which the world is full.

While ye run after imaginary shadows,
That lead alone to fights and quarrels,
Him worship, the only visible !
Break all other idols !

TO AN EARLY VIOLET*

What though thy bed be frozen earth
Thy cloak the chilling blast ;
What though no mate to cheer thy path,
Thy sky with gloom o'ercast ;

What though if love itself doth fail,
Thy fragrance strewed in vain ;
What though if bad o'er good prevail,
And vice o'er virtue reign :

Change not thy nature, gentle bloom,
Thou violet, sweet and pure,
But ever pour thy sweet perfume
Unasked, unstinted, sure !

TO MY OWN SOUL†

Hold yet a while, Strong Heart,
Not part a lifelong yoke
Though blighted looks the present, future gloom.

* Written from New York, 6th January 1896.
† Composed at Ridgely Manor, New York, in 1899.

And age it seems since you and I began our
March up hill or down. Sailing smooth o'er
Seas that are so rare—
Thou nearer unto me, than oft-times I myself—
Proclaiming mental moves before they were!

Reflector true—Thy pulse so timed to mine,
Thou perfect note of thoughts, however fine—
Shall we now part, Recorder, say?

In thee is friendship, faith,
For thou didst warn when evil thoughts were brewing—
And though, alas, thy warning thrown away,
Went on the same as ever—good and true.

NO ONE TO BLAME*

The sun goes down, its cirmson rays
Light up the dying day;
A startled glance I throw behind
And count my triumph shame;
No one but me blame.

Each day my life I make or mar,
Each deed begets its kind,
Good good, bad bad, the tide once set
No one can stop or stem;
No one but me to blame.

I am my own embodied past;
Therein the plan was made;
The will, the thought, to that conform,
To that the outer frame;
No one but me to blame.

Love comes reflected back as love,
Hate breeds more fierce hate,
They mete their measures, lay on me

* Written from New York, 16th May, 1895.

Through life and death their claim ;
No one but me to blame.

I cast off fear and vain remorse,
I feel my Karma's sway
I face the ghosts my deeds have raised –
Joy, sorrow, censure, fame ;
No one but me to blame.

Good, bad, love, hate, and pleasure, pain
Forever linked go,
I dream of pleasure without pain,
It never, never came ;
No one but me to blame.

I give up hate, I give up love,
My thirst for life is gone ;
Eternal death is what I want,
Nirvanam goes life's flame ;
No one is left to blame.

One only man, one only God, one ever perfect soul,
One only sage who ever scorned the dark and dubious ways,
One only man who dared think and dared show the goal—
That *death* is curse, and so is *life*, and best when stops to be.

Om Nama Bhagavate Sambuddhaya
Om, I salute the Lord, the awakened.

VIVEKANANDA
IN
INDIAN NEWSPAPERS

These are from the pages of

THE INDIAN MIRROR

November 11, 1893

HINDUS AT THE WORLD'S FAIR

Francis Albert Doughty, writing to the 'Boston Evening Transcript' from Chicago, says :

There is a room at the left of the entrance to the Art Palace marked "No. 1—keep out." To this the speakers at the Congress of Religions all repair sooner or later, either to talk with one another or with President Bonney, whose private office is in one corner of the apartment. The folding doors are jealously guarded from the general public usually standing far enough apart to allow peeping in. Only delegates are supposed to penetrate the sacred precincts, but it is not impossible to obtain an 'open seasame', and thus to enjoy a brief opportunity of closer relations with the distinguished guests than the platform in the Hall of Columbus affords.

The most striking figure one meets in this anti room is Swami Vivekananda, the Brahmin monk. He is a large well-built man, with the superb carriage of the Hindustanies, his face clean shaven, squarely moulded, regular features, white teeth, and with well-chiselled lips, that are usually parted in a benevolent smile while he is conversing. His finely poised head is crowned with either a lemon-coloured or a red turban, and his cassock (not the technical name for this garment), belted in at the waist and falling below the knees, alternates in a bright orange and a rich crimson. He speaks excellent English and replies readily to any questions asked in sincerity.

Along with his simplicity of manner, there is a touch of personal reserve when speaking to ladies, which suggests his chosen vocation. When questioned about the laws of his order, he has said, "I can do as I please. I am independent. Sometimes I live in the Himalaya Mountains, and sometimes in the streets of cities. I never know where I will get my next meal. I never keep money with me. I come here by subscription." Then, looking round at one or two of his fellow-countrymen who chanced to be standing near, he added, "They will take care of me"; giving the inference that his board bill in Chicago is attended to by others. When asked if he was wearing

his usual monk's costume, he said, "This is a good dress ; when I am at home I am in rags, and I go barefooted. Do I believe in caste ? Caste is a social custom ; religion has nothing to do with it ; all castes will associate with me."

It is quite apparent, however, from the deportment, the general appearance of Mr. Vivekananda that he was born among high castes—years of voluntary poverty and homeless wanderings have not robbed him of his birthright of gentleman ; even his family name is unknown ; he took that of Vivekananda in embracing a religious career, and "Swami" is merely the title of reverend accorded to him. He cannot be far along in the thirties, and looks as if made for this life and its fruition, as well as for meditation on the life beyond. One cannot help wondering what could have been the turning-point with him.

"Why should I marry", was his abrupt response to a comment on all he had renounced in becoming a monk, "when I see in every woman only the divine Mother ? Why do I make all these sacrifies ? To emancipate myself from earthly ties and attachments so that there will be no re-birth for me. When I die I want to become at once absorbed in the divine one with God. I would be a Buddha."

Vivekananda does not mean by this that he is a Buddhist. No name or sect can label him. He is an outcome of the Higher Brahminism, a product of the Hindu spirit, which is vast, dreamy, self-extinguishing, a Sanyasi or holy man.

He has some pamphlets that he distributes, relating to his master, Paramhansa Ramkrishna, a Hindu devotee, who so impressed his hearers and pupils that many of them became ascetics after his death. Mozumder also looked upon this saint as his master, but Mozumder works for holiness in the world, in it but not of it, as Jesus taught.

Vivekananda's address before the Parliament was broad as the heavens above us, embracing the best in all religions, as the ultimate universal religion—charity to all mankind, good works for the love of God, not for fear of punishment or hope of reward. He is a great favourite at the Parliament, from the grandeur of his sentiments and his appearance as well. If he merely crosses the platform he is applauded, and this marked approval of thousands he accepts in a child-like spirit of gratification, without a trace of conceit. It must be a strange experience, too, for this humble young Brahmin monk,

this sudden transition from poverty and self-effacement to effluence and aggrandizement. When asked if he knew anything of those brothers in the Himalayas so firmly believed in by the Theosophists, he answered with the simple statement, "I have never met one of them" as much as to imply, "There may be such persons, but though I am at home in the Himalayas, I have yet to come across them."

Another Brahmin at the Parliament, representing a younger school of Hinduism, the Vaishnava, is often seen in the ante-room leaning with graceful *abandon* on the table in the centre of the room, his bright boyish face lighting up as he freely airs his opinions upon the Indian civilisation and ours. His costume is usually all white topped with a voluminous turban. This is Nara Sima Chari of Madras, "an itinerant Hindu", as he laughingly styles himself.

I had a very entertaining conversation with Mr. Nara Sima one day lately, Mr. Lakshmi Narain, a Barrister from Lahore, India and Professor Merwing Snell of Washington, D.C., being also in the group.

"I am tried of everything", Said Nara Sima frankly, "no new sensation is possible to me ; I am heartily disgusted with the life I have led in the world. I long now to try exactly to reverse of what I have done before, and go out into the woods alone. I must conquer myself, subdue the senses ; it will be hard I know, that is the trouble. You say I will given it up in a week—perhaps so ; but I can try again afterwards. I want to be a holy man, to give up everything."

"What good will it do anyone ?" "That is not the question. Each man must elevate himself ; nobody else can elevate him. It is not good or evil, but indifference to all earthly things that I am seeking."

When it was suggested that active benevolence and work for others might have a diverting effect, cure his *ennui*, he repelled action with the Hindu ideal of total detachment as the highest aim.

"I would go out into the woods from here", he went on to say, "but the climate near Chicago would be too cold. I think I will try it farther south, somewhere in Central America."

"You may encounter wild beasts in your solitude."

"I will take my rifle."

"Then you do kill animals ?"

"Yes, if they come at *me* I should not hesitate, in self-defence ;

not to eat—bah I have eaten meat sometimes since I came here, the first time I tried it, it made me positively sick, actually I ruined a good suit of clothes. Have I lost caste since I came ? Oh yes ! but I can easily get it back, and I shall do it at once if I return. There is no fun in being without it. When I came to America I had the castemark on my forehead, and I wore the chord of the Brahmins ; but it got worn out and I did not know where to find some more like it. You have caste, too, and it is worse that ours, the caste of wealth. I have never been in a place where there was not caste of some kind."

Mr. Nara Sima's manners were naive and pleasing, but his views on the subject of Hindu widows were the antipodes of Pundita Ramabai's. "Why shouldn't they burn themselves if they want to ? For my part I wish the English hadn't stopped them. Why ? Because then there wouldn't be so many widows. I don't see why a woman should be prevented from burning herself with the body of her husband if she thinks it will make both herself and him happy for ever in another world."

Mr. Lakshmi Narain of Lahore, and Professor Snell of Washington, claiming to be impartial students of comparative religion, both subscribed to this startling theory that it was an injury to human rights to prevent a person from inflicting and injury upon him or herself for conscience's sake.

"Of course, a widow ought not to be forced to do such a thing," continued Mr. Nara Sima, "and she never was. The act was purely voluntary. She was not persecuted if she refused to burn herself, unless she was a coward, and drew back after she offered to do it at the first touch of the flames. It didn't hurt her long ; she was soon suffocated ; the pain was only for a few moments." He shrugged his shoulders nonchalantly, as if alluding to a mere trifle like vaccination. "No, I wouldn't pull anybody out of the fire here or anywhere else who wanted to be burned."

"How would you like to be burned with dead wife !" was a question naturally put next.

"The rule holds good both ways. The right of the man and the woman is equal, but the men don't want to burn themselves and the women do. That is all the difference."

On being asked if it was true that widows in India were allowed only one cooked meal a day, he said that he had known hundreds

of widows, and they could eat not only three, four or five meals a day if they choose, that such a law existed ; but foreigners were apt to catch at a rule without reporting, often not knowing, the counteracting customs which operate to make it a dead letter. On appealing for confirmation to the gentleman from Lahore, the latter differed with him, and declared gravely that in the North of India, where he lived, the rule of one meal a day for cooked food for widows was much more rigidly adhered to.

"We hear a great deal about the condition of woman in India.'' Mr. Nara Sima went on to say, "It is all nonsense. I have seen as many henpecked husbands in India as anywhere else."

We all laughed at the Universality of this acme of civilization, the henpecked husband ; and one remark leading to another, some one ventured to suggest to the *blase* young Hindu that to form a serious attachment for a woman might be the very best remedy for his present state of mind, and prevent the catastrophe of his betaking himself to the woods.

"Ah, that would spoil everything" he protested, with another vehement gesture.

An entirely different personality is the Secretary of the Jain Association, the only representative at the Parliament of that Historic faith, which is the oldest in India. Mr. Virchand, M. Gandhi wears the European dress, with only the national turban in distinction form the hideous hat of our predilection. He has a refined and intellectual countenance, a bright eye, and something in his manner that suggests cosmopolitan influences, or it may be because the Jains have less restrictive social customs than other Hindus. Mr. Gandhi says that Jain women are free to go about as they wish. "My wife goes everywhere with me," he added, "when I am at home ; but freedom may extend too far when it comes to female suffrage, as with you."

This gentleman, too, is a vegetarian. I have never tasted meat in my life he remarked, "and cannot bear even to sit at table with those who eat meat. On the steamer coming over I ate only fruit. I am staying with Dr. Barrows (the Chairman of the Congress), and he gives me vegetable food. Since I have been in America I have been able to see that no one diet will answer for universal use, and I think it will be sometime yet before man can have a universal religion.''

On being asked if, according to the Jain religion which teaches the law of cause and effect, but cannot find a reason for the existence of a God, he could hope for future reunion with the beloved dead, his face became very thoughtful as he replied to this query of all peoples in all ages.

"We may meet them," he answered after pondering a moment, "but we must look beyond the personal love and satisfaction."

These Orientals are all repeeled by the idea of a salaried clergy.

It may be stated of the Hindus, the Japanese also as a rule, that they will concede nothing to us in the conception of a religion of a Supreme Being, a moral order of cause and effect; they are persuaded that they have plenty of religion at home already. What they do credit us with is a greater power of organization, more system, better developed schemes and ideas of labour, practical achievements, and they are glad to learn these things from us.

September 6, 1894

Public Meeting At The Town Hall

EXPRESSION OF GRATITUDE TO SRIMAT VIVEKANANDA AND THE AMERICAN PEOPLE

A Public meeting of the Hindu community of Calcutta was held at the Town Hall yesterday afternoon at half past five o'clock to consider how best to express their gratitude to Swami Vivekananda for his able representation of Hinduism at the Parliament of Religions at Chicago, and to thank the American people for the cordial reception they had accorded to him. There was a very large attendance of Hindus, Rajah Peary Mohun Mukerji occupying the chair.

The Chairman, in opening the proceeding, said,—Hon'ble Justice Guru Dass Banerji and gentlemen,—I think you heartily for having asked me to take the chair at this meeting. We are assembled here this evening to express our thankfulness, not to one who has distinguished himself by meritorious services to the State, or to one who has won triumphs of statesmanship, but to a simple Sannyasi only thirty years old, who has been expounding the truths of our religion to the great American people with an ability, tact and judgement which has elicited the highest admiration. Brother Vivekananda has opened the eyes I may say, of an importants section of the civilised world to the great truths of the Hindu religion, and convinced them that the most valuable products of human thought in the region of philosophy and religion are to be found, not in Western lore, but in our own sacred Shastra (Hear, hear). I am very glad to find this large and influential gathering met to-day to do honour to such a distinguished benefactor of the country. But in doing honour to Brother Vivekananda we should not loose sight of the fact that he is a product of the system of education which has been fostered by the British Government with profuse liberality and speaking for myself, I cannot help taking this opportunity to say that I feel more deeply grateful to the British Government for having revived the study of the Sanskrit language and literature, which is of far more value to us than telegraph, railway, Local Self-Government system and other civilised institutions which thay have given us. It is not, I think, too much to say that the study of Sanskrit literature has placed in the hands of our young men the key to this untold

treasure of which any one must justly be proud (Hear, hear), and that it has given our young men the means of finding contentment, and even happiness, in situation which would have otherwise filled them with misery and despair. We owe much to Brother Vivekananda, and I hope that the speakers who have kindly offered to take part in this meeting will do justice to the claim which Brother Vivekananda certainly has on the gratitude of India. With these remarks I request my friend, Babu Norendro Nath Sen, to move the first Resolution.

The first Resolution which is as follows, was moved by Babu Norendro Nath Sen, seconded by Rai Sew Bux Bogla Bahadur and supported by Kumar Radha Prosad Roy and Rai Jotendro Nath Chowdhury and carried unanimously :

"That this meeting desires to record its grateful appreciation of the great services rendered to the cause of Hinduism by Swami Vivekananda at the Parliament of Religions at Chicago and of his subsequent work in America."

The second Resolution, which is as follows, was moved by Mr. N. N. Ghose, seconded by Babu Khetter Nath Mullic, and supported by Babu Kally Nath Mitter, the Hon'ble Surendro Nath Banerji and Pandit Bhudeb Kabiratna, and carried unanimously :

"That this meeting tenders its best thanks to Dr. J. H. Barrows, the Chairman of the Parliament of Religions at Chicago, Mr. Merwin Marie Snell, Secretary of the Scientific Section of the Parliament of Religions at Chicago, and the American people for the cordial and sympathetic reception they have accorded to Swami Vivekananda."

The third Resolution, which is as follows, was moved by Babu Saligram Singh, seconded by Babu Amarendro Nath Chatterji, and supported by Babus Hemendro Nath Mitter, Monorunjun Guho and Jotendro Nath Mitter, and carried unanimously :

"That this meeting requests the Chairman to forward to Swami Vivekananda, and Dr. Barrows, copies of the foregoing Resolutions together with the following letter, addressed to Vivekananda :

To Srimat Vivekananda —

Dear Sir,—As Chairman of a large, representative and influential meeting of the Hindu inhabitants of Calcutta and the Suburbs, held in the Town Hall of Calcutta, on the 5th of September, 1894, I have the pleasure to convey to you the thanks of the local Hindu commu-

nity for your able representation of their religion at the Parliament of Religions that met at Chicago in September, 1893.

The trouble and sacrifice you have incurred by your visit to America as a representative of the Hindu Religion are profoundly appreciated by all whom you have done the honour to represent. But their special acknowledgments are due to you for the services you have rendered to the cause they hold so dear, their sacred Arya Dharma, by your speeches and your ready responses to the questions of inquirers. No exposition of the general principles of the Hindu Religion could, within the limits of a lecture, be more accurate and lucid than what you gave in your address to the Parliament of Religions on Tuesday, the 19th September, 1893. And your subsequent utterances on the same subject on other occassions have been equally clear and precise. It has been the misfortune of Hindus to have their religion misunderstood and misrepresented through ages, and therefore they cannot but feel specially grateful to one of them who has had the courage and the ability to speak the truth about it, and dispel illusions among a strange people, in a strange land, professing a different religion. Their thanks are due no less to the audiences and the organisers of meetings, who have received you kindly, given you opportunities for speaking, encouraged you in your work, and heard you in a patient and charitable spirit. Hinduism has for the first time in its history, found a Missionary, and by a rare good fortune it has found one so able and accomplished as yourself. Your fellow-countrymen, fellow-citizens and fellow-Hindus feel that they would be wanting in an obvious duty if they did not convey to you their hearty sympathy and earnest gratitude for all your labours in spreading a true knowledge of their ancient faith. May God grant you strength and energy to carry on the good work you have begun !

Yours faithfully
PEARY MOHUN MUKERJI
Chairman

The Chairman then read letters from leading Indian gentleman, who could not attend, but expressed sympathy with the object of the meeting.

With a vote of thanks to the chair, proposed by Kumar Denendro Narain Roy, the meeting separated. A full report of the speeches will appear hereafter.

(Calcutta)

February 20, 1897

Original Poetry

CONQUEST OF AMERICA BY VIVEKANANDA SWAMI

The Swami sailed to Western shore,
Not as Cortes did before,
To conquer with the fire and sword
A dark unillumin'd horde,
His weapons were of other mould
His aim not earthly power or gold ;
Bravely he steered athwart the main,
With none to follow in his train ;
With not a single shell in hand,
To raise his loved mother-land,
In the eyes of people far away.
Of master-minds as bright as day,
He told them in language clear,
They need not shed a drop of tear
For fallen Ind, who still both own
A precious stone, to them unknown.
The Hindu is by culture mild,
Forbearing, generous and kind ;
The Hindu does not take delight
In hawking, hunting or in fight ;
For birds and beasts as well as men
He always has a tender vein :
Feels in fact a brotherly love
For insects, worms and all above,
Though strongly wedded to his own,
He does not in his heart disown
The merits of another's creed
The piety of a pious deed,
Be it done by a Hindu true
An Arab wild or wand'ring Jew,
How quick did Swami gain his end,
And the ways of 'mericans mend
When Caeser went to conquer Gaul
He went and saw and conquer'd all.

C. C. M.

February 21, 1897

SWAMI VIVEKANANDA'S RETURN TO CALCUTTA

Sealdah Railway Station presented quite a festive appearance last Friday morning, when Swami Vivekananda the Great Hindu ascetic, arrived after a long sojourn in America and Europe. He reached Madras a fey days ago, where he met with a great ovation from all sections of the Hindu community. There was a great crowd of people on the Sealdah Railway platform and adjoining grounds as also crowds on the roads and streets, all round the station. The number of people assembled is roughly estimated at 20,000 and men of all stations of life were there to do honour to the Swami and give him a hearty reception. The whole route was decorated with flags, bannerets, and evergreens and with triumphal arches with words of welcome, the terraces of the house on the roadside being crowded with men, women and children. Precisely at half-past seven the special train conveying the Swami and his few European and Indian friends, steamed into the platform. There was a great enthusiasm, displayed on all sides, and everybody was anxious to get near him to have a look on the "hero" of the day There was a great rush on the spacious platform and one could with difficulty keep his place. The spectacle was, indeed very grand, the like of which was never seen in the same place, except when Lord Ripon arrived at the Station and a great and unprecedented ovation was given to that great popular Viceroy. Triumphal arches were erected in many places and nahabats were playing the sweet Indian music on the top of the triumphal arches, and the station and the road leading from it to the Ripon College was decorated with garlands and festoons. There was music too. In a splendid carriage-and-four there was a concert playing select tunes and several Sankirtan parties were there. As soon as the Swami alighted from the train the members of the Reception Committee headed by Babu Norendro Nath Sen, stepped forward and conducted the Swami to a phaeton. A European lady and a gentleman, who accompanied the Swami, were escorted to the carriage. The Swami and his friends and disciples were garalanded and were heartily cheered when the phaeton slowly drove amidst the cheers of the enthusiastic throng, followed by music and the

Sankirtan parties. There was a stream of carriages following the Swami's carriage, and the Swami has heartily cheered throughout the passage.

The Hon'ble Charu Chandra Mitter conducted the Swami and his friends to the Ripon College, where several respectable gentlemen followed them. There was a peculiar smile in the beaming countenance of the Swami, and his picturesque orange cloth fitted him admirably. He modestly bowed to the crowd, when they saluted him and throughout evinced a simple and touching recognition of the unprecedented reception. At quarter to 8, he was escorted to the Ripon College and the crowd there was so great that it was impossible to get into the Hall. The Hon'ble Ananda Charlu and several respectable gentlemen were there. Several of the very respectable men of the community had to come away as there was hardly any room. In the spacious tent-yard of the Ripon College, the Swami and his friends were seated and the whole assembly cheered him heartily. Eveybody expected the Swami to make a grand speech, but the Swami was evidently moved by the genuine and hearty reception of his countrymen, and in a few chosen words, thanked the assembly for welcoming him in such grand manner. The Swami and his friends were then conducted by Babu Pasupati Nath Bose, and they were entertained yesterday at his house in Baug Bazer. The Swami's European friends would reside in Babu Gopal Lal Seal's garden-house in Cossipore. The Swami, we understand, will remain to his old mut in Baranagar.

February 25, 1897

SWAMI VIVEKANANDA RECEPTION COMMITTEE

A Committee, consisting of the following gentlemen, with power to add to their number, has been formed for the purpose of according a suitable reception to Swami Vivekananda, in Calcutta :

PRESIDENT

His highness the Maharajah of Durbhanga.

VICE PRESIDENTS

Maharajah Sir Narendra Krishna Bahadur, K. C. I. E., Maharajah Govinda Lall Roy Bahadur, Rajah Rajendra Narayan Deb Bahadur, Rajah Benoy Krishna Deb Bahadur, Sir Romesh Chunder Mitter, Kt.

MEMBERS

Rajah Shib Chunder Bannerji, Kumar Nittyananda Sing, Dr. Rash Behary Ghosh, C. I. E, Hon'ble Joy Gobindo Law, Rai Shew Bux Bogla Bahadur, Hon'ble Rai Ananda Charlu Bahadur, Kumar Radha Prosad Roy, Babus Roma Nath Ghosh, Nanda Lal Bose, Pashupati Nath Bose, Hon'ble Surendra Nath Banerjee, Rai Kailash Chunder Mukherjee Bahadur, Rai Prosunna Kumar Banerjee Bahadur, Babus Kali Nath Mitter, Gonesh Chunder Chunder, Sailgram Singh, N. N Ghose, Esq, Babu Moti Lall Ghose, Rai Monmotha Nath Mitter Bahadur, Babu Kiron Chunder Roy, Rai Jatindra Nath Chowdury, M. A. B. L., Pundit Nilmony Nyayalankar, Principal, Sanskrit College, Babu Pulin Chandra Ray, Zeminder, Narail, Girja Nath Roy Choudhury, Zeminder, Satkhira, Rakhal Chunder Roy Choudhury, Zemindar, Burrisal, Guru Prosanno Ghose, Anath Nath Mullick, Kumar Narendro Nath Mitter, Babus Issur Chunder Chuckerbutty, Vakil, High Court, Amarendra Nath Chatterji, Vakil, High Court, Srish Chunder Chowdhry, Vakil, High Court, Pundits Kalibar Vedantabagis, Prosunna Kumar Tarkanidhi, Barrangore, Uma Choran Tarkaratna, Professor, Sanskrit Ripon College, Babus G. C. Bose, M. A., Monmatho Nath Bhattacharji, M. A., Devendra

Chander Ghose, Preo Nath Mullick, J. Ghosal, Esq, Rai Ram Sanker Sen Bahadur, Babus Bhupendra Nath Bose, M. A. B. L., Attorney-at-law, Ashu Tosh Biswas, Ram Taran Banerjee, Dr. Ashu Tosh Mukherjee, Vakil, High Court, Babu Charu Chunder Mitter, Pundits Rajendra Nath Sastri, M. A., Rishi Kesh Sastri, Professor, Sanskrit College, Babus Seth Dooly Chand, Janoki Nath Roy, Sarat Chunder Mitter, N. Saddhananda Bhikshu, Buddhist Priest, Babus Girish Chunder Ghose, Atul Krishna Ghose, Vakil, High Court, Bhawani Churan Dutt, Vakil, High Court, Jadu Nath Mazumder, M. A. B. L., Jessore, Radharaman Kur, Norendro Nath Mitter, M. A. B. L., Vakil High Court, M. N Gupta B. A, Charu Chandra Bose, Editor, "Maha Bodhi Journal", Pramotho Nath Kur, Attorney-at-law, Bepin Behary Ghose, M.B., Mon Mohun Bose, Beney Madhub Chatterjee, Netye Charan Haldar, L. M. S., Bejoy Ratna Sen Kaviraj, Bhagabati Prosunno Sen Kaviraj, Preonath Mukherjee, Narendra Nath Mitter, B. L, Attorney-at-law, Bhupendra Kumar Bose, M. A., B. L, Sachendra Nath Bose, B. A, Kripa Nath Dutt, Chairman, Cossipore Municipality, Mohendra Narain De, Entally, Amrita Krishna Bose, L. M. S., and Mohendro Nath Mozumder, L. M. S, Barranagore.

HONORARY SECRETARY
Babu Norendro Nath Sen.
HONORARY ASSISTANT SECRETARY
Babu Hirendra Nath Dutta, M. A, B L.

March 3, 1897

SWAMI VIVEKANANDA
PRESENTATION OF AN ADDRESS OF WELCOME TO THE SWAMI

The spacious courtyard of the Palatial residence of the late Raja Sir Radhakanta Deb Bahadur at Subha Bazar was crowded to its utmost capacity on Sunday afternoon to witness the presentation of an address of welcome to Swami Vivekananda.

The following gentlemen, among others, were present: The Hon'ble Justice Chunder Madhab Ghosh, Maharajah Bahadur Jagadindra Nath Roy, of Natore, Rajahs Rajendra Narayan Deb Bahadur, Peary Mohun Mukerji, M. A. B L., Kumars Girindra Narain Deb Bahadur, C. S. I., Anath Krishna Bahadur, Promoth Krishna Bahadur, Sorejendra Krishna Bahadur, Hemendra Krishna Bahadur, Assini Krishna Bahadur, Surendra Narain Bahadur, Sushil Krishna Bahadur, Nitya Nanda Sing, Roy Bahadurs Kailas Chunder Mukherjee, Prosunno Kumar Banerjee, Baikunta Nath Bose, Shewbux Bogla, Babus Guru Prosonna Ghose, Akhoy Kumar Ghose, Babu S. N Tagore, (son of Babu Kali Krishna Tagore), Kumar Radha Prosad Roy, Hon'ble Babu Guru Prosad Sen, M. A, B. L., Babu Chunder Nath Bose, M. A., B. L., Janaki Nath Roy, Horendra Lal Roy, Binode Lal Roy, Amrita Lal Roy, Editor, Hope, Prio Nath Palit M. A., B L., H. C. Mullick, Esq., J. Ghosal, Esq, Babus Nolin Behari Sircar, Bhupendra Nath Bose, Norendro Nath Sen, Hirendra Nath Dutt, M. A. B. L., Norendra Nath Mitter, B. A., Gosai Dass Gupta, Editor, Songbad Prabhakhar, Prio Nath Mukherjee, Pundit Romendra Sunder Tribedi. M. A., Dr. Bepin Behari Ghose, M. B, Babus Girish Chunder Ghosh, Dramatic Director, Star Theatre, Behari Lall Chatterjee, Manager Royal Bengal Theatre, Pundit Mohendra Nath Bidvanidhi, Babus Khitindra Nath Tagore, B. A., Gogonendra Nath Tagore, Bolendra Nath Tagore, Sudhindra Nath Tagore, Shyamamadhub Roy, Dr. D. N. Chatterjee, Babus Gokul Chunder Dhar, M. A., B. L., Radha Raman Kar, Jogendra Krisna Bose, Dr. R. G. Kar, Promotho Chunder Kar. M. A., Dr. Nishi Kanta Chatterji, Babus Prosad Dass Boral, Benode Behari Bose (son of Babu Nonda Lal Bose), N. C. Mullick, Esq., Babus Mohendra Nath Roy, M. A., B. L.. Suresh Chunder Samajpati, Gobinda Nath Dutt, Kumar Keshabendra Krishna Deb Bahadur, and others.

On the motion of Rajah Peary Mohun Mukherji, seconded by Rajendra Narayan Deb Bahadur, Rajah Binoya Krishna Bahadur was voted to the chair. On taking the chair he said :

"Gentlemen,—I extremely regret that, owing to a previous engagement, His Highness the Maharajah Bahadur of Durbhanga is not able to grace the chair on this occasion, and, in his absence, I have been asked by the members of the Reception Committee to take the chair. We have all met here, Gentlemen, this afternoon to discharge a very important and agreeable duty. We are here, Gentlemen, to present an address of welcome to Swami Vivekananda a man in a million, verily, a Prince among men. We all know, Gentlemen, what valuable services he has rendered to his countrymen in foreign lands, quite unaided and alone, and contending against insuperable difficulties. In formally introducing the Swami to you, it is quite superflous for me to speak anything in praise of him, for what I might say would hardly and anything to the world-wide reputation he has already earned for himself. It is, however, a matter of no small gratification to us, his fellow-citizens, to find that his services have been appreciated and recognised in other parts of India. The success of his mission in America and in England has endeared him to every Hindu heart, and has gone far more than anything else to quicken the national instinct in us. Gentlemen, the Swami's missionary expedition has raised us in the estimation of foreign people, nay, he has recovered some lost ground for us and like a conquering hero, he is returning to us after a glorious campaign and it is meet that we should give him a hearty welcome home.

"Gentlemen,—while honouring our hero, we cannot and must not allow this opportunity to pass by without once more expressing our sense of the greatest obligation to the American and the English people for the very kind and handsome way, in which they have treated the Swami, while he was in their country. Gentlemen, I have now much pleasure in reading the address in the name of you all, and on behalf of the Hindu community :

TO SRIMAT VIVEKANANDA SWAMI

Dear Brother,—We, the Hindu inhabitants of Calcutta and of several other places in Bengal, offer you on your return to the land of your birth a hearty welcome. We do so with a sense of pride as well as of gratitude, for by your noble work and example in various parts of the world you have done honour not only to our religion but also to our country, and to our province in particular.

At the great Parliament of Religions which constitute a section of the world's Fair Held in Chicago in 1893, you presented the principles of the Aryan religion. The substance of your exposition was to most of your audience a revelation, and its manner overpowering alike by its grace and its strength. Some may have received it in a questioning spirit, a few may have criticised it, but its general effect was a revolution in the religious ideas of a large section of cultivated Americans. A new light had dawned on their mind, and with their accustomed earnestness and love of truth they determined to take full advantage of it. Your opportunities widened; your work grew. You had to meet call after call from many cities in many States answer many queries, satisfy many doubts, solve many difficulties. You did all the work with energy, ability and sincerity; and it has led to lasting results. Your teaching has deeply influenced many an enlightened circle in the American Commonwealth, has stimulated thought and research, and has in many instances definitely sheltered religious conceptions in the direction of an increased appreciation of Hindu ideals. The rapid growth of clubs and societies for the comparative study of religions and the investigation of spiritual truth, is witness to your labour in the far West. You may be regarded as the founder of a College in London for the teaching of the Vedanta philosophy. Your lectures have been regularly delivered, punctually attended and widely appreciated. Their influence has extended beyond the walls of the lecture-rooms. The love and esteem which have been evoked by your teaching are evidenced by the warm acknowledgments, in the address presented to you on the eve of your departure, from London, by the students of the Vedanta philosophy in that town.

Your success as a teacher has been due not only to your deep and intimate acquaintance with the truths of the Aryan religion, and your skill in exposition by speech and writing, but also, and largely, to your personality. Your lectures, your essays and your books have high merits, spiritual and literary, and they could not but

produce their effect. But it has been heightened in a manner that defies expression by the example of your simple, sincere, self-denying life, your modesty, devotion and earnestness.

While acknowledging your services as a teacher of the sublime truths of your religion, we feel that we must render a tribute to the memory of your revered preceptor, Sri Ramkrishan Paramahmasa. To him we largely owe even you. With his rare magical insight he early discovered the heavenly spark in you, and predicated for you a career which happily is now in course of realisation. He it was that unsealed the vision and the faculty divine with which God had blessed you, gave to your thoughts and aspirations the bent that was a awaiting the holy touch and aided your pursuits in the region of the unseen. His most precious legacy to posterity was yourself.

Go on, noble soul, working steadily and valiantly in the path you have chosen. You have a world to conquer. You have to interpret and vindicate the religion of the Hindus to the ignorant, the sceptical, the wilfully blind, you have begun the work in a spirit which commands our admiration and have already achieved a success to which many lands bear witness. But a great deal yet remains to be done ; and our own country, or rather we should say your own country, waits on you. The truths of the Hindu religion have to be expounded to large numbers of Hindus themselves. Brave yourself then for the grand exertion. We have confidence in you and in the righteousness of our cause our national religion seeks to win no material triumphs. Its purposes are spiritual ; its weapon is a truth which is hidden away from material eyes and yields only to the reflective reason. Call on the world, and where necessary, on Hindus themselves, to open the inner eye, to transcend the senses, to read rightly the sacred books, to face the supreme reality, and realise their position and destiny as men. No one is better fitted than yourself to give the awakening or make the call, and we can only assure you of our hearty sympathy and loyal co-operation in that work which is apparently your mission ordained by Heaven.

We remain, dear brother,
Your loving
Friends and Admires

July 6, 1902

We deeply regret to announce the death of Swami Vivekananda, the head of the Ram Krishna Mission. This melancholy event took place on Friday last at 10 P. M., at the Bellur Math. He died at the rather early age of a little over 39 years. He had been suffering in health for a long time, and lately had a complication of diseases. In him a star of great magnitude has disappeared from the Indian firmament. His work in America was of inestimable value both to that country and to this. It extended over a period of nearly three-and-a-half years. He proceeded to America sometime in 1893, and returned to India in February, 1897. Ever since his arrival in this country, he had been far from well. Lately, the area of the Ram Krishna Mission work in America has widened so much that Swami Vivekananda was called upon by his colleagues in that country to send ten more Hindu preachers there to supplement the labours of Swami Abhedananda and Swami Turiananda. The Ram Krishna Mission has been doing good work in India quietly and unostentatiously for some years, chiefly in Madras, Mayavati near Almora, Murshidabad, Kishengarh in Rajputana, and Kankhai near Hurdwar; its head-quarters being at Bellur near Howrah. It has established several orphanges. We reserve for a future issue a more detailed notice of the life and work of Swami Vivekananda.

(Editorial)

July 8, 1902

THE LATE SWAMI VIVEKANANDA

To us, the death of Swami Vivekananda has not been in the nature of a surprise, for we knew that the prolonged conflict between a towering spirit and a physical frame, shattered by various earthly ills, could not last long. It is, however, a wonder that the conflict did not last as long as it did. The moment the Swami returned from his glorious and wonderful religious campaign in America, death had marked him for its own. But it was the undaunted spirit that burned within, that continued to qualify him—as it did since the Swami was a mere lad—"to scorn delights and to live laborious days." We, comparative non-entities, are easily put out by slight mortifications; little troubles place us a-bed, common disappointments swell as large as the Martinique Volcano; but the late Swami's whole life was a living lesson against such unmanly despondency. Swami Vivekananda was a Bengali; little was known of him in Bengal; he rose to some slight fame by almost unaided effort in Madras; he gainad the pinnacle of distinction in America. To-day when the star has set, we Bengalis mourn our utter loss. This, in brief, is the vanity of things. But still it is a record of human effort which is not likely to be forgotten many a long year. Had Swami Vivekananda been less than he was, the world, specially India, would have been much poorer. But the Swami's Karma was great. He believed in the past of his country, he revered India's ancient teachers; he possessed supreme faith in his national religion; and truly great man that he was, he believed implicitly in himself. That was the secret of the Swami's astonishing success. When a man lives a clean life, and is inspired by high ideals, and accepts his Guru's teachings in all humility and without question, then does he himself become a preceptor in his turn, receiving like respect and love and reverence. Swami Vivekananda's inspirer was Sri Ram Krishna paramhansa. And the one ideal of a visibly realised life, in act and conduct, lifted the devout worshipper to still loftier ideals, till the mere clay-man was absorbed in the Pure, Eternal, Undividable, Supreme Universal Spirit.

Of Swami Vivekananda's many-sided beneficient activity in India and abroad, we shall have to speak again and again. To-day we shall content ourselves with our own immediate connection with the subject. It has been a matter of surprise to our friends as well as to strangers, that we should have taken the Swami by the [...]and at all. we have been known as being rather "bigoted" followers of the Theosophical cult. But bigoted or otherwise, we have never lost sight of the truth that God works his goodness and purpose in infinite ways. Men may differ in their creeds and differ in non-essentials. People, who cannot or will not go deep down, and will marely rake up the rough surface, are apt to fasten quarrels upon one another. We hope, we know better. Thus we shut our eyes delib rately to the superficial estrangements, born of misunderstandings, between the followers respectively of Hinduism and Buddhism. Have we not landed invariably the inner meaning and drift of Christianity in the like spirit. We never cared much about certain unseemly squabbles between certain followers, respectively, of the Theosophical Society and the Arya Samaj. We only knew and remembered that both iustitutions were working, each in its own way, with a singleness of purpose for the good of India. And that was the view we all along adopted in regard to our personal and impersonal relations with the late lamented Swami Vivekananda. He had, perhaps, little regard for the Theosophical Society. He did not conceal his dislike at one particular time. But that did not alter to us the worth of his own ethical teachings, which to all intents and purpose were undiluted Theosophy. Truly, God works His will in many, and sometimes seemingly contrary ways. He chooses instruments of apperently different moulds and diverse capacities. But consciously or unconsciously they all perform His will. And taking Swami Vivekananda into His bosom, we are confident that his welcome will be—Servant of God, well done.

(Editorial)

A TRIBUTE TO VIVEKANANDA

Lo, India weeps, with the sound of the
deathknell tolling :
A star has faded in the Eastern sky.
The dreaded foe, the fates of men controlling.
Coldly refused to pass the hero by,
Weep India of thy noblest son bereft.
Ahy genius claimed him as her very own.
Upon his brow her glorious mark she left,
His soul was kindred to the gods alone,
And India gives him with a bitter groan.
And Genius Sights—while the tears of the
nation are flowing.
And sad the melancholy Muses pine.
But in our hearts an ardent fire is glowing
To Pay our tribute at the hero's shring,
Ah, you who turned the spirit mystic tide.
And gave new life-blood into foreign lands.
Thy country's hero and thy nation's pride .
Oh, hear the prayers she weeping upward sends,
And take the offering from her trembling hands,
O Power Divine, look down on the children's
deep sorrow.
Nor leave them in their hour of woe alone.
Open their eyes to loves more glorious marrow
Give them the peace they seek at India's throne.
Indra behold them weeping for thy son.
Honoured by Thee, revered and loved abroad ;
Who, ah, too soon from out their midst has gone.
He tread the path that patriots have trod,
And loved his country as he loved his God.

July 22,* 1902

Sister Nivedita begs us to inform the public that, at the conclusion of the days of mourning for the Swami Vivekananda, it has been decided between the members of the order at Bellur Math and herself, that her work shall henceforth be regarded as free, and entirely independent of their sanction and authority. (Notes).

THE LIFE OF PAVHARI BABA

To help the suffering world was the gigantic task to which the Buddha gave prominence, brushing aside for the time being almost all other phases of religion; yet he had to spend years in self-searching to realise the great truth of the utter hollowness of clinging to a selfish individuality. A more unselfish and untiring worker is beyond our most sanguine imagination: yet who had harder struggles to realise the meaning of things than he? It holds good in all time that the greater the work, the more must have been the power of realisation behind. Working out the details of an already laid out masterly plan may not require much concentrated thought to back it, but the great impulses are only transformed great concentrations. The theory alone perhaps is sufficient for small exertions, but the push that creates the ripple is very different from the impulsion that raises the wave, and yet the ripple is only the embodiment of a bit of the power that generates the wave.

Facts, naked facts, gaunt and terrible may be; truth, bare truth, though its vibrations may snap every chord of the heart; motive selfless and sincere, though to reach it, limb after limb has to be lopped off—such are to be arrived at, found, and gained, before the mind on the lower plane of activity can raise huge work-waves. The fine accumulates round itself the gross as it rolls on through time and becomes manifest, the unseen crystallises into the seen, the possible becomes the practical, the cause the effect, and thought, muscular work.

The cause, held back by a thousand circumstances, will manifest itself, sooner or later, as the effect; and potent thought, however powerless at present, will have its glorious day on the plane of material activity. Nor is the standard correct which judges of everything by its power to contribute to our sense-enjoyment.

The lower the animal, the more is its enjoyment in the senses, the more it lives in the senses. Civilisation, true civilisation, should mean the power of taking the animal-man out of his sense-life—by giving him visions and tastes of planes much higher—and not external comforts.

Man knows this instinctively. He may not formulate it to himself under all circumstances. He may form very divergent opinions about the life of thought. But it is there, pressing itself to the front in spite of everything, making him pay reverence to the hoodoo-

worker, the medicine-man, the magician, the priest, or the professor of science. The growth of man can only be gauged by his power of living in the higher atmosphere where the senses are left behind, the amount of the pure thought-oxygen his lungs can breathe in, and the amount of time he can spend on that height.

As it is, it is an obvious fact that, with the exception of what is taken up by the necessities of life, the man of culture is loth to spend his time on so-called comforts, and even necessary actions are performed with lessened zeal, as the process moves forward.

Even luxuries are arranged according to ideas and ideals, to make them reflect as much of thought-life as possible—and this is Art.

"As the one fire coming into the universe is manifesting itself in every form, and yet is more besides"—yes, infinitely more besides! A bit, only a small bit, of infinite thought can be made to descend to the plane of matter to minister to our comfort—the rest will not allow itself to be rudely handled. The superfine always eludes our view and laughs at our attempts to bring it down. In this case, Mohammed must go to the mountain, and no "nay". Man must raise himself to that higher plane if he wants to enjoy its beauties, to bathe in its light, to feel his life pulsating in unison with the Cause-Life of the universe.

It is knowledge that opens the door to regions of wonder, knowledge that makes a god of an animal: and that knowledge which brings us to That, "knowing which everything else is known" (the heart of all knowledge—whose pulsation brings life to all sciences—the science of religion) is certainly the highest, as it alone can make man live a complete and perfect life in thought. Blessed be the land which has styled it "supreme science"!

The principle is seldom found perfectly expressed in the practical, yet the ideal is never lost. On the one hand, it is our duty never to lose sight of the ideal, whether we can approach it with sensible steps or crawl towards it with imperceptible motion : on the other hand, the truth is, it is always looming in front of us—though we try our best to cover its light with our hands before our eyes.

The life of the practical is in the ideal. It is the ideal that has penetrated the whole of our lives, whether we philosophise, or perform the hard, everyday duties of life. The rays of the ideal, reflected and refracted in various straight or tortuous lines, are pouring in through every aperture and windhole, and consciously or

unconsciously, every function has to be performed in its light, every object has to be seen transformed, heightened, or deformed by it. It is the ideal that has made us what we are, and will make us what we are going to be. It is the power of the ideal that has enshrouded us, and is felt in our joys or sorrows, in our great acts or mean doings in our virtues and vices.

If such is the power of the ideal over the practical, the practical is no less potent in forming the ideal. The truth of the ideal is in the practical. The fruition of the ideal has been through the sensing of the practical. That the ideal is there is a proof of the existence of the practical somehow, somewhere. The ideal may be vaster, yet it is the multiplication of little bits of the practical. The ideal mostly is the summed up, generalised, practical units.

The power of the ideal is in the practical. Its work on us is in and through the practical. Through the practical, the ideal is brought down to our sense-perception, changed into a form fit for our assimilation. Of the practical we make the steps to rise to the ideal. On that we build our hopes ; it gives us courage to work.

One man who manifests the ideal in his life is more powerful than legions whose words can paint it in the most beautiful colours and spin out the finest principles.

Systems of philosophy mean nothing to mankind, or at best only intellectual gymnastics, unless they are joined to religion and can get a body of men struggling to bring them down to practical life with more or less success. Even systems having not one positive hope, when taken up by groups and made somewhat practical, had always a multitude ; and the most elaborate positive systems of thought withered away without it.

Most of us cannot keep our activities on a par with our thought-lives. Some blessed ones can. Most of us seem to lose the power of work as we think deeper, and the power of deep thought if we work more. That is why most great thinkers have to leave to time the practical realisation of their great ideals. Their thoughts must wait for more active brains to work them out and spread them. Yet, as we write, comes before us a vision of him, the charioteer of Arjuna, standing in his chariot between the contending hosts, his left hand curbing the fiery steeds—a mail-clad warrior, whose eagle-glance sweeps over the vast army, and as if by instinct weighs every detail of the battle array of both parties—at the same time that we

hear, as it were, falling from his lips and thrilling the awe-struck Arjuna, that most marvellous secret of work: "He who finds rest in the midst of activity, and activity in rest, he is he wise amidst men, he the Yogi, he is the doer of all work." (Gita, IV. 18)

This is the ideal complete. But few ever reach it. We must take things as they are, therefore, and be contented to piece together different aspects of human perfection developed in different individuals.

In religion we have the man of intense thought, of great activity in bringing help to others, the man of boldness and daring self-realisation, and the man of meekness and humility.

The subject of this sketch was a man of wonderful humility and intense self-realisation.

Born of Brahmin parents in a village near Guzi, Varanasi, Pavhari Baba, as he was called in after life, came to study and live with his uncle in Ghazipur, when a mere boy. At present, Hindu ascetics are split up into the main divisions of Sannyasins, Yogis, Vairagis, and Panthis. The Sannyasins are the followers of Advaitism after Shankaracharya; the Yogis, though following the Adva ta system, are specialists in practising the different systems of Yoga; the Vairagis are the dualistic disciples of Ramanujacharya and others; the Panthis, professing either philosophy, are orders founded during the Mohammedan rule. The uncle of Pavhari Baba belonged to the Ramanuja or Shri sect, and was a Naishthika Brahmacharin, i.e. one who takes the vow of lifelong celibacy. He had a piece of land on the banks of the Ganga, about two miles to the north of Ghazipur, and had established himself there. Having several nephews, he took Pavhari Baba into his home and adopted him, intending him to succeed to his property and position.

Not much is known of the life of Pavhari Baba at this period. Neither does there seem to have been any indication of those peculiarities which made him so well known in after years. He is remembered merely as a diligent student of Vyakarana and Nyaya, and the theology of his sect, and as an active lively boy whose jollity at times found vent in hard practical jokes at the expense of his fellow-students.

Thus the future saint passed his young days, going through the routine duties of Indian students of the old school; and except that he showed more than ordinary application to his studies, and a

remarkable aptitude for learning languages, there was scarcely anything in that open, cheerful, playful student life to foreshadow the tremendous seriousness which was to culminate in a most curious and awful sacrifice.

Then something happens which made the young scholar feel, perhaps for the first time, the serious import of life, and made him raise his eyes, so long riveted on books, to scan his mental horizon critically and crave for some thing in religion which was a fact, and not mere book-lore. His uncle passed away. One face on which all the love of that young heart was concentrated had gone, and the ardent boy, struck to the core with grief, determined to supply the gap with a vision that can never change.

In India, for everything, we want a Guru. Books, we Hindus are persuaded, are only outlines. The living secrets must be handed down from Guru to disciple, in every art, in every science, much more so in religion. From time immemorial earnest souls in India have always retired to secluded spots, to carry on uninterrupted their study of the mysteries of the inner life, and even today there is scarcely a forest, a hill, or a sacred spot which rumour does not consecrate as the above of a great sage. The saying is well known :

"The water is pure that flows.
The monk is pure that goes."

As a rule, those who take to the celibate religious life in India spend a good deal of their life in journeying through various countries of the Indian continent, visiting different shrines—thus keeping themselves from rust, as it were, and at the same time bringing religion to the door of everyone. A visit to the four great sacred places, situated in the four corners of India, is considered almost necessary to all who renounce the world.

All these considerations may have had weight with our young Brahmacharin, but we are sure that the chief among them was the thirst for knowledge. Of his travels we know but little, except that, from his knowledge of Dravidian languages, in which a good deal of the literature of his sect is written, and his thorough acquintance with the old Bengali of the Vaishnavas of Shri Chaitanya's order, we infer that his stay in Southern India and Bengal could not have been very short.

But on his visit to one place, the friends of his youth lay great

stress. It was on the top of mount Girnar in Kathiawar, they say, that he was first initiated into the mysteries of practical Yoga.

It was this mountain which was so holy to the Buddhists. At its foot is the huge rock on which is inscribed the first-deciphered edict of the "divinest of monarchs", Asoka. Beneath it, through centuries of oblivion lay the conclave of gigantic Stupas, forest covered, and long taken for hillocks of the Girnar range. No less sacred is it still held by the sect of which Buddhism is now thought to be a revised edition, and which strangely enough did not venture into the field of architectural triumphs till its world-conquering descendant had melted away into modern Hinduism. Girnar is celebrated amongs Hindus as having been sanctified by the stay of the great Avadhuta Guru Dattatreya, and rumour has it that great and perfected Yogis are still to be met with by the fortunate on its top.

The next turning-point in the career of our youthful Brahmacharin we trace to the banks of the Ganga somewhere near Varanasi. as the disciple of a Sannyasin who practised Yoga and lived in a hole dug in the high bank of the river. To this Yogi can be traced the after-practice of our saint, of living inside a deep tunnel, dug out of the ground on the bank of the Ganga near Ghazipur. Yogis have always inculcated the advisability of living in caves or other spots where the temperature is even, and where sounds do not disturb the mind. We also learn that he was about the same time studying the Advaita system under a Sannyasin in Varanasi.

After years of travel, study, and discipline, the young Brahmacharin came back to the place where he had been brought up. Perhaps his uncle, if alive, would have found in the face of the boy the same light which of yore a greater sage saw in that of his disciple and exclaimed, "Child, thy face today shines with the glory of Brahman !" But those that welcomed him to his home were only the companions of his boyhood—most of them gone into, and claimed for ever by, the world of small thought and eternal toil.

Yet there was a change, a mysterious—to them an awe-inspiring—change, in the whole character and demeanour of that school-day friend and playmate whom they had been wont to understand. But it did not arouse in them emulation, or the same research. It was the mystery of a man who had gone beyond this world of trouble and

meterialism, and this was enough. They instinctively respected it and asked no question.

Meanwhile, the peculiarities of the saint began to grow more and more pronounced. He had a cave dug in the ground, like his friend near Varanasi, and began to go into it and remain there for hours. Then began a process of the most awful dietary discipline. The whole day he worked in his little Ashrama, conducted the worship of his beloved Ramachandra, cooked good dinners—in which are he is said to have been extraordinarily proficient—distributed the whole of the offered food amongst his friends and the poor, looked after their comforts till night came, and when they were in their beds, the young man stole out, crossed the Ganga by swimming and reached the other shore. There he would spend the whole night in the midst of his practices and prayers, come back before daybreak and wake up his friends, and then begin once more the routine business of "worshipping others", as we say in India.

His own diet in the meanwhile, was being attenuated every day, till it came down, we are told, to a handful of bitter Nimba leaves or a few pods of red pepper, daily . Then he gave up going nightly to the wood on the other bank of the river and took more and more to his cave . For days and months, we are told, he would be in the hole, absorbed in meditation, and then come out . Nobody knows what he subsisted on during these long intervals, so the people called him Pav-ahari (or air-eater) Baba (or father).

He would never duriug his life leave this place. Once, however, he was so long inside the cave that people gave him up as dead, but after a long time, the Baba e merged and gave a Bhandara feast to a large number of Sadhus.

When not absorled in his meditations, he would be living in a room above the mouth of his cave, and during this time he would receive visitors. His fame began to spred, and to Rai Gagan Chandra Bahadur of the Opium Department, Ghazipur—a gentleman whose innate nobility and spirituality have endeared him to all —we owe our introduction to the saint.

Like many others in India, there was no striking or stirring external activity in this life. It was one more example of that Indian ideal of teaching through life and not through words, and that truth bears fruit in those lives only which have become ready

to receive. Persons of this type are entirely averse to preaching what they know, for they are for ever convinced that it is internal discipline alone that leads to truth, and not words. Religion to them is no motive to social conduct, but an intense search after and realisation of *truth* in this life. They deny the greater potentiality of one moment over another, and every moment in eternity being equal to every other, they insist on seeing the truths of religion face to face now and here, not waiting for death.

The present writer had occasion to ask the saint the reason of his not coming out of his cave to help the world. At first, with his native humility and humour, he gave the following strong reply :

"A certain wicked person was caught in some criminal act and had his nose cut off as a punishment. Ashamed to show his noseless features to the world and disgusted with himself, he fled into a forest ; and there, spreading a tiger-skin on the ground, he would feign deep meditation whenever he thought anybody was about. This conduct, instead of keeping people off, drew them in crowds to pay their respects to this wonderful saint ; and he found that his forest-life had brought him once again an easy living. Thus years went by. At last the people around became very eager to listen to some instruction from the lips of the silent maditative saint ; and one young man was specially anxious to be initiated into the order. It came to such a pass that any more delay in that line would undermine the reputation of the saint. So one day he broke his silence and asked the enthusiastic young man to bring on the morrow a sharp razor with him. The young man glad at the prospect of the great desire of his life being speedily fulfilled, came early the next morning with the razor. The noseless saint led him to a very retired spot in the forest, took the razor in his hand, opened it, and with one stroke cut off his nose, repeating in a solemn voice, 'Young man this has been my initiation into the order. The same I give to you. Do you transmit it diligently to others when the opportunity comes !' The young man could not divulge the secret of this wonderful initiation for shame, and carried out to the best of his ability the injunctions of his master. Thus a whole sect of nose-cut saints spread over the country. Do you want me to be the founder of another such ?"

Later on, in a more serious mood, another query brought the answer : "Do you think that physical help is the only help

possible? Is it not possible that one mind can help other minds even without the activity of the body ?"

When asked on another occasion why he, a great Yogi, should perform Karma, such as pouring oblations into the sacrificial fire, and worshipping the image of Shri Raghunathji, which are practices only meant for beginners, the reply came: "Why do you take for granted that everybody makes Karma for his own good? Cannot one perform Karma for others ?"

Then again, everyone has heard of the thief who had come to steal from his Ashrama, and who at the sight of the saint got frightened and ran away, leaving the goods he had stolen in a bundle behind; how the saint took the bundle up, ran after the thief, and came up to him after miles of hard running; how the saint laid the bundle at the feet of the thief, and with folded hands and tears in his eyes asked his pardon for his own intrusion, and begged hard for his acceptance of the goods, since they belonged to him, and not to himself.

We are also told, on reliable authority, how once he was bitten by a cobra; and though he was given up for hours as dead, he revived; and when his friends asked him about it, he only replied that the cobra "was a messenger from the Beloved".

And well may we believe this, knowing as we do the extreme gentleness, humility, and love of his nature. All sorts of physical illness were to him only "messengers from the Beloved", and he could not even bear to hear them called by any other name, even while he himself suffered tortures from them. This silent love and gentleness had conveyed themselves to the people around, and those who have travelled through the surrounding villages can testify to the unspoken influence of this wonderful man. Of late, he did not show himself to anyone. When out of his underground retiring-place, he would speak to people with a closed door between. His presence above ground was always indicated by the rising smoke of oblations in the sacrificial fire, or the noise of getting things ready for worship.

One of his great peculiarities was his entire absorbtion at the time in the task in hand, however trivial. The same amount of care and attention was bestowed in cleaning a copper pot as in the worship of Shri Raghunathji, he himself being the best example of the secret he once told us of work: "The means should be loved and cared for as if it were the end itself".

Neither was his humility kindred to that which means pain and anguish or self-absement. It sprang naturally from the realisation of that which he once so beautifully explained to us, "O King, the Lord is the wealth of those who have nothing—yes, of those", he continued. who have thrown away all desires of possession, even that of one's own soul." He would never directly teach, as that would be assuming the role of a teacher and placing himself in a higher position than another. But once the spring was touched, the fountain welled up with infinite wisdom ; yet always the replies were indirect.

In appearance he was tall and rather fleshy, had but one eye, and looked much younger than his real age. His voice was the sweetest we have ever heard. For the last ten years or more of his life, he had withdrawn himself entirely from the gaze of mankind. A few potatoes and a little butter were placed behind the door of his room, and sometimes during the night this was taken in when he was not in Samadhi and was living above ground. When inside his cave, he did not require even these. Thus, this silent life went on, witnessing to the science of Yoga, and a living example of purity, humility, and love.

The smoke, which, as we have said already, indicated his coming out of Samadhi, one day smelled of burning flesh. The people around could not guess what was happening ; but when the smell became overpowering, and the smoke was seen to rise up in volumes, they broke open the door, and found that the great Yogi had offered himself as the last oblation to his sacrificial fire, and very soon a heap of ashes was all that remained of his body.

Let us remember the words of Kalidasa : "Fools blame the actions of the great, because they are extraordinary and their reasons past the finding-out of ordinary mortals."

Yet, knowing him as we do, we can only venture to suggest that the saint saw that his last moments had come, and not wishing to cause trouble to any, even after death, performed this last sacrifice of an Arya, in full possession of body and mind.

The present writer owes a deep debt of gratitude to the departed saint and dedicates these lines, however unworthy, to the memory of one of the greatest Masters he has loved and served.